মেদিনীপুর ঃ
সংস্কৃতি ও মানবসমাজ

তারাপদ সাঁতরা

প্র কা শ নী
গ্রাম ঃ নবাসন, ডাকঘর ঃ বাগনান, জেলা ঃ হাওড়া-৭১১৩০৩

MEDINIPUR : SAMASKRITI O MANAB SAMAJ

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮০

গ্রন্থস্বত্ব : শুভদীপ সাঁতরা

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রকাশক :

কৌশিকী প্রকাশনীর পক্ষে

শৈলেন ঘোষ

গ্রাম : নবাসন, ডাকঘর : বাগনান.

জেলা : হাওড়া-৭১১৩০৩

মুদ্রক :

শ্রীজয়ন্ত মণ্ডল

রূপনারায়ণ প্রেস

ডাকঘর : কোলাঘাট

জেলা : মেদিনীপুর

মেদিনীপুর জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চায়

অকীর্তিত ও স্বেচ্ছাব্রতী নীরব গবেষক

শ্রীরাধারমণ সিংহ (আঞ্চলিক ইতিহাসজ্ঞ : চন্দ্রকোণা)

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস (লোকসংস্কৃতিবিদ্ : এগরা)

শ্রীশম্ভুনাথ ঘটক (প্রত্নতাত্ত্বিক : গড়বেতা)

মহোদয়গণের করকমলে

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

হাওড়া জেলার লোকউৎসব (১৯৬২)

শরৎচন্দ্র : সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য (১৯৬৯)

হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি (১৯৭৬)

বাংলার দারু ভাস্কর্য (১৯৮০)

ছড়া-প্রবাদে গ্রামবাংলার সমাজ (১৯৮১)

মন্দিরলিপিতে বাংলার সমাজচিত্র (১৯৮৩)

পশ্চিমবঙ্গের পুরাসম্পদ : উত্তর মেদিনীপুর (১৯৮৭)

পুরাকীর্তি সমীক্ষা : মেদিনীপুর (১৯৮৭)

গ্রন্থকারের নিবেদন

সরকারীভাবে মেদিনীপুর জেলার পুরাকীর্তি বিষয়ক এক গ্রন্থ রচনার তাগিদে এই জেলাটির নানাস্থানে আমাকে পরিভ্রমণ করতে হয়েছে। সে সময় এই জেলার অপস্রিয়মান ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যেসব বিষয়গুলি আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, তা নিয়ে বেশ কিছু নিবন্ধ রচনা করি এবং সেগুলি যথারীতি পরিচয়, দর্শক, বিশ্ববাণী, চতুষ্কোণ, খেজুরী-বার্তা, দক্ষনাবিক, বনেদীঘর, অভিযাত্রী, সন্ধানী, সাহানা, বাগনান বার্তা, রূপনারায়ণ বার্তা, আজকাল, বর্ণমালা, মতান্তর, প্রদীপ, তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র স্মরণিকা, সকালবেলা, যাদুঘর, এখন যেরকম, রূপান্তর, লোক-সংস্কৃতি, মুসাফির, স্মরণিকা প্রভৃতি খ্যাত-অখ্যাত পত্র-পত্রিকায় সময়ে সময়ে প্রকাশিত হয়। সে সব বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধগুলি একত্র করে একটি গ্রন্থ প্রণয়নের ইচ্ছা বহুদিন ধরে থাকলেও সেটি পুস্তক-প্রকাশকদের অনাগ্রহের কারণে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষ থেকে অনুদান পাওয়ায় এ পুস্তকটি প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল এবং এজন্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এ গ্রন্থে প্রকাশিত নিবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিবিধ বিষয় নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে রচনার কারণে গ্রন্থনার ক্ষেত্রে সুসংবদ্ধ ধারাবাহিক ক্রম অনুসরণ করা যে সম্ভব হয়নি, সে ত্রুটির জন্য একান্তই ক্ষমাপ্রার্থী। এছাড়া জেলার চিত্রকলা, লোকশিল্প ও হস্তশিল্প বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধাবলী পরিসরের অভাবে এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা গেল না বলে আন্তরিক দুঃখিত। ভবিষ্যতে পরবর্তী কোন গ্রন্থে সেগুলি যথাযথ প্রকাশ করার ইচ্ছে রইল।

গ্রন্থে আলোচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনায় নানাভাবে সাহায্যের জন্য সর্বশ্রী প্রবোধচন্দ্র বসু, ডঃ ত্রিপুরা বসু, শিবেন্দু মান্না, কমলকুমার কুণ্ডু, তাপসকান্তি রাজপণ্ডিত, আনন্দগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, রসময় বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার সামুই, শম্ভুনাথ ঘটক, শ্যামসুন্দর চন্দ্র, পার্থসারথি দাস, সরোজকুমার জানা, ডঃ প্রবালকান্তি হাজরা, শিশুতোষ ধাওয়া, বাঁশরীমোহন ভৌমিক প্রমুখের কাছে আমি একান্তই ঋণী। সম্প্রতি লোকান্তরিত আর এক উৎসাহী বন্ধু তরুণ মিত্রের সহযোগিতার জন্য বিষন্ন হৃদয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। প্রত্নতত্ত্ব, আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এঁদের অনুরাগ ও উৎসাহ আমাকে বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

এ ছাড়া এ পুস্তকটি রচনায় অযাচিতভাবে বহু মূল্যবান পরামর্শ ছাড়াও বেশ কিছু তথ্যাদি সংগ্রহে সর্বশ্রী সন্তোষকুমার বসু, ডঃ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, ডঃ পূর্ণেন্দুনাথ নাথ, বিশ্বনাথ সামন্ত, ডঃ দেবাশিস বসু, ডঃ হিতেশরঞ্জন সান্যাল, অমিত রায়, ডঃ দীপকরঞ্জন দাস প্রমুখের সহৃদয় সহায়তায় আমি কৃতার্থ। গ্রন্থে আলোচিত ওড়িশা ট্রাঙ্ক রোড্ সম্পর্কিত শিলালিপিটি যে ভুবনেশ্বরের ওড়িশা স্টেট্ মিউজিয়মে সংরক্ষিত, সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শ্রীইন্দ্রজিৎ চৌধুরী এবং ঐ সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে সেটির আলোকচিত্র সংগ্রহে সহায়তা করেন ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের সিউপারিনটেণ্ডিং আর্কিওলজিষ্ট ডঃ গোপালচন্দ্র ছাউলে। আগুইবনির আলোকচিত্রটি শ্রীরণজিৎকুমার সেনের গৃহীত এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের সৌজন্যে প্রাপ্ত। রেনেল কৃত মানচিত্রের ৭নং প্লেটটি দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন বন্ধুবর শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী। এঁদের সকলের কাছেই আমি একান্তভাবে ঋণী। পুস্তকটি যত্ন সহকারে মুদ্রণের জন্য রূপনারায়ণ প্রেসের শ্রীজয়ন্তকুমার মণ্ডলকে এই প্রসঙ্গে ধন্যবাদ জানাই।

অগ্রজপ্রতিম স্বনামখ্যাত শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। তাঁর মূল্যবান আলোকচিত্র সংগ্রহ থেকে 'বিরিঞ্চি'র আলোকচিত্রটি প্রদান ছাড়াও অযাচিতভাবে নানাবিধ সহায়তা করেছেন। তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী স্বর্গতা উমা বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রাম-বাংলার অপস্রিয়মান সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির তথ্য সংগ্রহে যেভাবে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন, তা চিরদিন আমার কাছে প্রেরণাস্বরূপ হয়ে থাকবে।

গ্রন্থটির প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন প্রখ্যাত শিল্পীবন্ধু পূর্ণেন্দু পত্রী। এছাড়া প্রবন্ধের শিরোনামে ব্যবহৃত অলংকরণটির শিল্পী তপন কর। এঁদের সকলকে জানাই আমার হার্দিক অভিনন্দন।

সংসার ভার থেকে মুক্তি দিয়ে আমার স্ত্রী শ্রীমতী নীলা সাঁতরা ও পুত্র শ্রীমান শুভদীপ সাঁতরা পরোক্ষভাবে যে প্রেরণা ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন তা যথাযোগ্য ঋণ স্বীকারের অপেক্ষা রাখে না।

পরিশেষে মেদিনীপুর জেলার আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে জনসাধারণকে আগ্রহী করার উদ্দেশ্যে রচিত এ গ্রন্থটি তাঁদের কাছে আদৃত হলে তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

গ্রাম : নবাসন ; ডাকঘর : বাগনান ;
জেলা : হাওড়া ; পিন : ৭১১৩০৩ ;
বিজয়া দশমী : ১৩৯৪।

তারাপদ সাঁতরা

সূচীপত্র

১. মেদিনীপুর : ইতিকথা, নামকরণ ও সীমানাবদল

মেদিনীপুর জেলার নামের উৎপত্তি নিয়ে নানান মত প্রচলিত। মেদিনীপুর শহরটি বেশ প্রাচীন হলেও, এর নামকরণ নিয়ে পণ্ডিতেরা সঠিকভাবে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শিখরভূমের নৃপতি রাজা রামচন্দ্রের রচিত এক পুঁথির বিবরণ থেকে এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, খ্রীষ্টীয় তের থেকে পনের শতকের মধ্যে এদেশে প্রাণকর নামে কোন এক স্বাধীন হিন্দু রাজার পুত্র মেদিনীকর এই নগরীর পত্তন করায় কালক্রমে সেটির নামকরণ হয় মেদিনীপুর। শাস্ত্রী মশায় এই প্রসঙ্গে আরও অবগত করান যে, এই মেদিনীকরই 'মেদিনীকোষ' নামে একটি সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করেছিলেন।

অপর এক মত অনুসারে মেদনমল্ল রায় নামে ওড়িশার এক প্রতাপান্বিত নৃপতি ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে এখানকার বিস্তীর্ণ ভূভাগ দখল করে কাঁসাইতীরবর্তী এই এলাকায় যে মেদিনীবংশের শাসন কায়েম করেছিলেন তা থেকেই পরবর্তী-কালে মেদিনীপুর নামকরণ হয়। কিন্তু এ মতটি কোন উল্লেখযোগ্য দলিল-দস্তাবেজ দ্বারা সমর্থিত নয়।

ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর রচিত 'ইসলাম প্রসঙ্গ' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'মৌলানা মুস্তফা মদনীকে (রঃ) সম্রাট আওরঙ্গজেব বর্তমান মেদিনীপুর সহরে একটি মসজিদ সম্পর্কিত মহল ও বহু লাখেরাজ সম্পত্তি দান করেন। এই মৌলানা মদনী সাহেবের নাম হইতে মদিনীপুর নাম হয়; পরে তাহার অপভ্রংশ মেদিনীপুর হইয়াছে। বাদশাহী সনের তারিখ ১০৭৭ হিজরী (বাংলা সন ১০৯০-৯১)। ইহা ফুরফুরা শরীফের কেবলাগাহ সাহেবের খান্দানে রক্ষিত

আছে' (পৃঃ ১৮৮)। কিন্তু আওরঙ্গজেবের বহু আগেই ষোল শতকে প্রণীত 'আইন-ই-আকবরী'তে মেদিনীপুর মহলের অন্তর্গত মেদিনীপুর নগরের নাম উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং মৌলনা মুস্তফা মদনীর নামেই যে মেদিনীপুর নামকরণ হয়েছে তা কোনমতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আর এক মতে, তুরস্ক থেকে আগত জনৈক গাজী হিজলী পরগণার নামকরণ করেছিলেন মদিনার অনুকরণে মদিনাপুর, যা থেকে নাকি এই মেদিনীপুর নাম। কিন্তু এ অভিমত তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়।

মেদিনীপুর নামকরণের পিছনে আরও একটি মত বিবেচনার যোগ্য। 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে বঙ্গ, মগধ ও চেরপাদের নাম উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে বঙ্গ ও মগধ আমাদের পরিচিত হলেও চেরপাদ ভূভাগটি কোথায়? এ বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, চেরপাদ হল দক্ষিণাপথের এক প্রাচীন রাজ্য। সম্প্রতিকালে গবেষক-নৃতাত্ত্বিক হরিমোহন তাঁর রচিত 'চেরো' নামক এক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, চেরো এলাকা ছিল মগধেরই লাগোয়া, যা গয়ার দক্ষিণ ভূভাগ থেকে হাজারিবাগ, ডালটনগঞ্জ ও সারগুজা পর্যন্ত ছিল বিস্তৃত। জনশ্রুতি, সেই চেরো ভূভাগে মেদিনীরায় নামে এক পরাক্রান্ত নৃপতি যে বিশাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা ছিল হয়ত মেদিনীপুর অবধি বিস্তৃত। এই অনুমান যে অমূলক নয় তার কারণ চেরো জাতির ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে ঝাড়খণ্ড ও মেদিনীপুরের বহু অঞ্চলের জনজীবনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সুতরাং উল্লিখিত মেদিনীরায়ের নাম থেকে যে মেদিনীপুরের নামকরণ হয়েছে এমন সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

খ্রীষ্টীয় বারো শতকের ওড়িশার গঙ্গবংশের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গদেব তার রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। এ বিষয়ে ১১৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রদত্ত শ্রীকুর্মান লিপি থেকে জানা যায় যে, এই বৎসরই তিনি উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের বহু দেশ অধিকার করে রাজধানীতে ফিরে আসেন এবং গঙ্গা থেকে গোদাবরী পর্যন্ত এই বিস্তৃত ভূভাগ তার অধিকারভুক্ত হয়। এছাড়া অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ, ২য় নরসিংহ ও ৪র্থ নরসিংহের প্রদত্ত বিভিন্ন দলিলের সাক্ষ্য থেকেও জানা যায় যে, অনন্তবর্মনের রাজ্য বিস্তৃত ছিল দক্ষিণে গোদাবরী, উত্তরে মিধুনপুর, পূবে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে পূর্বঘাট পর্বতমালা পর্যন্ত। এখন ঐসব লিপিতে উল্লিখিত এই সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে ওড়িশার চোড়গঙ্গ রাজাদের

আধিপত্য যে মিধুনপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে সেটিই হল বর্তমান মেদিনীপুর। সুতরাং আলোচ্য এই মিধুনপুর অপভ্রংশে যদি মেদিনীপুর নামকরণ হয়ে থাকে তাহলে বারো শতকেই 'মেদিনীপুর' নামের অস্তিত্ব রয়েছে। সেক্ষেত্রে তের শতকে প্রাণকরের পুত্র মেদিনীকরের দ্বারা মেদিনীপুর নগর প্রতিষ্ঠা ও নামকরণের যুক্তি টিকতে পারে না। তবে নামকরণের ইতিহাস যাই হোক না কেন, ইংরেজ রাজত্বে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এই মেদিনীপুর শহরই জেলার সদর দপ্তর হিসেবে ঘোষিত হয়।

কিন্তু সে সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠার পিছনেও এক দীর্ঘ ইতিহাস আত্মগোপন করে আছে। কারণ, আজকের মেদিনীপুর জেলার যে এলাকা আমরা দেখি, এটি সম্পূর্ণ রূপ পেতে বহু বছর সময় লেগেছিল। প্রশাসনিক কারণে এ জেলার সীমানা পরিবর্তনের ইতিহাসও বেশ বিচিত্র। খ্রীষ্টীয় ষোল শতকের শেষ দিকে প্রণীত 'আইন-ই-আকবরী' থেকে জানা যায় যে, সে সময় ওড়িশা পাঁচটি সরকারে বিভক্ত ছিল। হিন্দুযুগে যেমন এলাকাগত বিভাগ ছিল 'ভুক্তি', 'মণ্ডল' বা 'বিষয়' তেমনি মুসলমান রাজত্বে সেই বিভাগগুলি 'সরকার', 'মহল', 'চাকলা' বা 'পরগণা'য় পরিবর্তিত হয়। এক্ষেত্রে আটাশটা মহল নিয়ে গঠিত সরকার জলেশ্বরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল এ জেলার প্রায় সমগ্র অংশ। এরপর শাহজাহানের আমলে ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ঐ পাঁচটি সরকারকে ভেঙ্গে বারটি সরকারে পুনর্গঠিত করা হয় এবং উত্তরাংশের ছ'টি সরকারকে ওড়িশা থেকে পৃথক করে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়। এর মধ্যে দুটি সরকার বালেশ্বরের এবং অবশিষ্ট চারটি সরকার যথা, জলেশ্বর, মালঝিটা, মজকুরী ও গোয়ালপাড়া মূলতঃ মেদিনীপুরের এলাকা-ভুক্ত হয়। এছাড়া এই সঙ্গে ঐ চারটি সরকারের মধ্যে পুনর্গঠিত বিরাশীটি মহলও ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়।

১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে যখন খাজনার তালিকা সংশোধন করা হয়, তখন থেকেই 'মহল'-এর বদলে 'পরগণা'র প্রচলন হয় এবং 'সরকার' নামীয় বিভাগকে ভেঙ্গে তা বিভিন্ন 'চাকলা'য় বিভক্ত করা হয়। এই ভাগাভাগির দরুণ চাকলা হিজলীর সমগ্র অংশ এবং চাকলা বালেশ্বরের কতক অংশ আজকের এই মেদিনীপুর জেলার মধ্যে চলে আসে। পরবর্তী পর্যায়ে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা অধিকারের পর উল্লিখিত চাকলা বালেশ্বরকে মেদিনীপুর ও জলেশ্বর এই দু'ভাগে বিভক্ত করে দেওয়া হয়।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মীরজাফরকে পদচ্যুত করে তাঁর

জামাতা মীরকাসিমকে বাংলার নবাবী প্রদান করেন তখন এই মর্যাদাপ্রাপ্তির মূল্য হিসাবে মীরকাসিম এক চুক্তিবলে ইংরেজ কোম্পানিকে মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম ও বর্ধমান জেলা হস্তান্তরিত করে দেন এবং বলতে গেলে এই সময় থেকেই এ জেলায় ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনকার হস্তান্তরিত এই জেলার মধ্যে যে তিন ভাগে পূর্ববর্ণিত 'চাকলা'গুলি বিভক্ত ছিল তা হল, ১। সরকার মালঝিটার অন্তর্ভুক্ত চাকলা হিজলী, ২। চাকলা মেদিনীপুর, ৩। চাকলা জলেশ্বর। এর মধ্যে চাকলা হিজলী ছিল হুগলীর সংলগ্ন এবং পশ্চিমে জঙ্গল অধ্যুষিত এলাকার সরকার গোয়ালপাড়ার কতকগুলি পরগণার মধ্যেও চাকলা মেদিনীপুর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইংরেজদের কাছে হস্তান্তরের পর এ জেলাটির মধ্যে তখন বাদ থেকে যায় সে সময়ের হুগলীর অন্তর্ভুক্ত হিজলী, মহিষাদল ও তমলুক ; মারাঠাদের অধীনস্থ পটাশপুর, কামারডিচোর ও ভোগরাই এবং বর্ধমানের অধীন তদানীন্তন ঘাটাল মহকুমা, সদর মহকুমার গড়বেতা ও শালবনী থানার কিছু অংশ এবং কেশপুর থানা। কিন্তু স্বর্ণরেখার উত্তরে বালেশ্বরের কিছু অংশ এবং সিংভূমের ধলভূম মহকুমা, মানভূমের জঙ্গলমহল, বরাহভূম ও মানভূম এবং বাঁকুড়ার জঙ্গলমহল ছাতনা ও অম্বিকানগর এ জেলার এলাকাধীন হয়।

এইভাবে মেদিনীপুর ও জলেশ্বর এই দুটি চাকলার শাসনভার মিঃ জনস্টান নামে জনৈক ইংরেজ অফিসারের অধীনে দেওয়া হয়, যিনি একাধারে রাজস্ব, ফৌজদারী ও বিচারবিভাগীয় কর্তা ছাড়াও কমার্শিয়াল এজেন্ট, রাজনৈতিক আধিকারিক ও মিলিটারী গভর্নরও ছিলেন। মেদিনীপুর জেলার দায়িত্ব গ্রহণ করার পরই তিনি এই জেলা শহরে একটি কমার্শিয়াল ফ্যাক্টরীও নির্মাণ করেন। ১৭৭৪ থেকে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সে সময়ের এ জেলা সরাসরি বর্ধমানের প্রাদেশিক কাউন্সিলের অধীন থাকে এবং পরবর্তী ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম এ জেলায় 'কালেক্টর'-এর পদ সৃষ্ট হওয়ায়, মিঃ জন পিয়ার্স সে পদে নিযুক্ত হন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়, হিজলী, মহিষাদল ও তমলুক ছিল সল্ট কালেক্টরের অধস্তন সল্ট এজেন্টের অধীন এবং সদর মহকুমা (উত্তর) ও ঘাটাল এই দুই মহকুমা ছিল বর্ধমানের এলাকাধীন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সে সময়ের জঙ্গলমহল ও গড়বেতার এলাকাধীন বগড়ীর বেশ কিছু অংশ ১৭৯৫-এর ৩৬ রেগুলেশন অনুযায়ী বর্ধমান থেকে মেদিনীপুরে হস্তান্তরিত করা হয় এবং তার ঠিক পাঁচ বছর পরে, বিশেষ এক আদেশবলে, বগড়ীর অবশিষ্ট অংশ ব্রাহ্মণভূম পরগণা ও চেতুয়া পরগণার অংশ তরফ দাসপুর, হুগলী জেলা থেকে পৃথক করে মেদিনীপুরের

অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়। পরবর্তী ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাদের অধিকারভুক্ত পটাশপুর ও সুবর্ণরেখার উত্তরে অন্য দুটি পরগণাও মেদিনীপুরের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। এর ঠিক দু'বছর পরেই জঙ্গলমহলে চুয়াড় বিদ্রোহজনিত অশান্তির কারণে, ১৮০৫-এর ১৮ রেগুলেশন অনুযায়ী সাতটি জঙ্গলমহল এলাকা মেদিনীপুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক একটি জঙ্গলমহল জেলা গঠিত হয়। এর ঠিক পরের বৎসর ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনটি মারাঠা অধিকৃত পরগণা শাসনকাজের সুবিধার জন্য হিজলীর সল্ট এজেন্সির মধ্যে যুক্ত করে দেওয়া হয়।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিজ বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় ১৮৩৩-এর ১৩ রেগুলেশন অনুযায়ী জঙ্গলমহল জেলাটির বেশ কিছুটা অংশ নিয়ে পৃথকভাবে মানভূম জেলার পত্তন করা হয় এবং ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এ জেলার মারাঠা অধিকৃত ভোগরাই, কামারডিচোরা ও সাহাবন্দর পরগণা ওড়িশার বালেশ্বর জেলার অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়।

ব্রিটিশ অধিকার থেকেই আজকের ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা থানা এলাকা ছিল হুগলী জেলার অংশীভূত। কিন্তু ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রকোণার অধিবাসীদের আবেদন অনুযায়ী, কেবলমাত্র রাজস্ব ক্ষেত্রাধিকার বাদে ফৌজদারী ক্ষেত্রাধিকারটি হুগলী জেলা থেকে মেদিনীপুর জেলার অধীনে চলে আসে। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দেও হুগলী জেলার সদর মহকুমা ছিল ক্ষীরপাইতে, কিন্তু ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে চন্দ্রকোণা ও ঘাটাল থানা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। বলতে গেলে, এই তারিখ থেকেই মেদিনীপুর জেলার সীমানা প্রায় পাকাপাকিভাবে নির্ধারিত হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালেও তেমন কিছু পরিবর্তন হয়নি।

২. জেলার সাবেকী 'পরগণা'র হকিকত

১৮৫২ সালের ইংরেজ সরকারের হিসেব অনুযায়ী, একশো-বারটি পরগণা নিয়ে এ জেলার আয়তন ছিল পাঁচ হাজার একত্রিশ বর্গমাইল। তখন লোকসমাজে মানুষের পরিচয় তার আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য 'পরগণা'র সীমানা

দিয়েই ; জেলা বা মহকুমার কোন নামগন্ধ ছিল না। একথা সত্যি যে 'পরগণা' বিভাগটি ছিল সেকালের মুসলমান শাসকদের সৃষ্টি। অন্যদিকে হিন্দু রাজত্বে গ্রাম নিয়ে যে এলাকা বিভাগ ছিল তাকে বলা হত 'মণ্ডল' এবং 'বিষয়' যা আবার অন্তর্ভুক্ত ছিল বড় মাত্রার 'ভুক্তি' বিভাগের সঙ্গে। বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের পাতায় তাই আমরা 'বর্ধমানভুক্তি', 'দণ্ডভুক্তি', 'কঙ্কগ্রামভুক্তি', 'পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি' প্রভৃতি নামের উল্লেখ পাই। পরবর্তী মুসলমান রাজত্বে 'গ্রাম' কথাটির বদলে চালু হয় আরবী শব্দ 'মৌজাআ', যা আজকের এই 'মৌজা'। স্বভাবতই ঐ মৌজা দিয়েই তৈরী করা হয় বিভিন্ন 'পরগণা' বিভাগ এবং শাসন কাজের সুবিধার জন্য ঐসব পরগণা নিয়ে গঠন করা হয় 'মহল' আর 'চাকলা', যা দিয়ে সৃষ্টি হয় বড় মাত্রার 'সরকার' নামীয় বিভাগ।

কালে কালে ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড যখন এদেশে শাসনদণ্ডে কায়েম হয়ে বসলো, তখন ঐসব পরগণাগুলি নিয়ে রাজকার্যের সুবিধার জন্য সীমানা বদলিয়ে 'জিলা'য় ভাগ করে নতুন করে নামকরণ করা হল। মূলতঃ 'ডিষ্ট্রিক্ট' কথাটির প্রতিশব্দ হিসাবে বিদেশী শাসনকর্তরা আরবী 'জিলা' শব্দটিকেই গ্রহণ করলেন। এইভাবে পশ্চিমবাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের এমন ছোট বড একশো-বারোটি পরগণা নিয়ে ব্রিটিশ রাজত্বে যে জেলাটির সৃষ্টি হল, তার নামকরণ করা হল মেদিনীপুর।

কিন্তু জেলা বিভাগ হলেও, জেলার সাধারণ মানুষ এই সেদিন পর্যন্তও 'পরগণার' অধিবাসী হিসাবেই তাঁদের পরিচয় প্রদান করে এসেছেন। জেলার পুব প্রান্তের পরগণাভিত্তিক অধিবাসীদের চালচলন নিয়ে তাই সে সময় একটা ছড়াও প্রচলিত ছিল। বিস্মৃতির হাত থেকে উদ্ধার করে কাগজকলমে নিয়ে এলে তার রূপটি দাঁড়ায় : 'ময়নার কাঁইকুই, চেতুয়ার বন্দোবস্ত, মণ্ডলঘাটের ধারা, কাশীজোড়ার গেরা'। পরে ইংরেজ শাসনের অবসান হয়েছে এবং ভারত স্বাধীন হওয়ার পর আরও চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়েছে। সাহেবী আমলের জেলা-বিভাগের ভৌগোলিক উত্তরাধিকার আমরা এতদিন ধরে বহন করে এসেছি বলেই পরগণার অস্তিত্বকে আজ বিস্মৃতির গর্ভে বিসর্জন দিয়েছি।

তাই আজ এ জেলার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সেই একশো-বারটি পরগণার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া না গেলেও, সে পরগণাগুলির নাম অন্তত নথিবদ্ধ রাখার একান্ত প্রয়োজন। বিদেশী শাসকরা শাসন ও শোষণের তাগিদে প্রয়োজনমত ঐ পরগণাগুলিকে গুণগত অবস্থা অনুযায়ী জঙ্গল, আবাদী ও নিমক এই তিন

শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন। সেই শ্রেণী বিভাগ ধরেই একশো-বারটি পরগণার তালিকা করলে যা দাঁড়ায় তা হোল :

জঙ্গল পরগণা—বগড়ী, ব্রাহ্মণভূম, ভঞ্জভূম, বাহাদুরপুর, বলরামপুর, নারাণগড়, গগণেশ্বর, নারাঙ্গাচোর, ফতেয়াবাদ, জঙ্গলমহল অর্থাৎ ঝাড়গ্রাম, রামগড়, লালগড়, কেশিয়াড়ী, কাঁকড়াজিৎ, নইগাঁ, নয়াবসান, দ্বীপাকিয়ারচাঁদ, জামিরাপোল, তপ্পে ধারেন্দা, মুকসুদপুর, ঝাঁটুভূমি, জামবনি, বেলবেড়্যা, বড়াজিৎ, কেরৌলি, কিসমৎ কেরৌলি, মনোহরগড়, কিসমৎ কিয়ারী ও চিয়াচ।

সাধারণ আবাদী পরগণা—খড়্গপুর, কেদারকুণ্ড, চেতুয়া, কুতুবপুর, সাপুর, কাশীজোড়া, কিসমৎ কাশীজোড়া, ঢেকিয়াবাজার, সবং, খান্দার, ময়নাচোর, অমর্ষি, পটাসপুর, উত্তরবেহার, রাজঘর, তুর্কাচোর, কুটিনাগড়, অগ্রাচোর, শিবপুর, কুরুলচোর, দেরাইসমাইলপুর, জলেশ্বর, দাঁতনচোর, বেলাড়াচোর, নিপোয়াচোর, কিসমৎ সাপুর, কিসমৎ মেদিনীপুর, কিসমৎ নারাণগড়, তপ্পে নাড়াজোল, তপ্পে বালীসীতা, তপ্পে পুরুষোত্তমপুর, গাগনাপুর, বাটিটাকী, দুতমুঠা, পার্তভূম, ভূঁঞামুঠা, জামনা, জলকাপুর, বুজারপুর, বড়িয়াচোর, মৎসুদ্দাবাদ, কিসমৎ খড়্গপুর, থানা জলেশ্বর ও সফি-পাটনা।

নিমক পরগণা—তমলুক, মহিষাদল, তেরপাড়া, গুমাই, কাসিমনগর, আওরঙ্গানগর, গুমগড়, সৎসা, মাজনামুঠা, সেরিফাবাদ, দুতকোড়াই, কিসমৎ পটাশপুর, দোরো, কসবা হিজলী, বালিজোড়া, আমিরাবাদ, নৈবাদ, নাড়ুয়ামুঠা, কিসমৎ শিবপুর, জলামুঠা, এড়িঞ্চি, বায়েন্দাবাজার, পাহানপুর, বিশাই, কালিন্দি বালিসাই, নয়াবাদ, ভোগরাই, খলিশা ভোগরাই, গোমেশ, বাহিরিমুঠা, ভাঁইঠগড়, দুখিনমাল, সুজামুঠা, কাঁকড়া, বীরকুল, ওড়িষ্যা-বালিসাই ও মীরগোদা।

এ হলো মোট একশোবার পরগণার মধ্যে একশো দশটার হিসেব। বাদ বাকী আর দুটি পরগণা হল সে সময়ের হুগলী জেলার এলাকাধীন মণ্ডলঘাট (বর্তমানে হাওড়া জেলা) ও জাহানাবাদ পরগণার বেশ কিছু অংশ, যা ছিল তখন মেদিনীপুরের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টের ক্ষেত্রাধিকারভুক্ত।

গ্রাম বা মৌজা সমষ্টির এই পরগণার যথার্থ এলাকা খুঁজে পেতে অসুবিধে হলেও পরগণা বিভাগের এ তালিকাটি থেকে মেদিনীপুরের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায় এবং তিন শ্রেণীর এই পরগণা বিভাগ থেকে জেলার সেকালের অর্থনৈতিক চিত্রটিও বেশ বোধগম্য হয়।

৩. প্রস্তরযুগের মানব সংস্কৃতি

মানুষের ইতিহাস আজ অনেক যুগ পেরিয়ে এসেছে। সেকালের পাথুরে অস্ত্র নিয়ে মানুষের বেঁচে থাকার জীবনটা কেমন ছিল, সে সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিকরা দীর্ঘদিনের গবেষণায় লব্ধ বহু চমকপ্রদ তথ্য উপস্থাপিত করেছেন। প্লাইস্টোসিন কালের আদিম প্রস্তরযুগ থেকে নতুন প্রস্তরযুগের মানুষদের ব্যবহৃত নানাবিধ পাথরের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে মেদিনীপুরের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে। বাস্তবিকই সেখানকার ভূপ্রকৃতির চেহারাটার মধ্যেও যেন আদিমতার ছাপ লেগে আছে। প্রাচীন এই এলাকার আদিমতম মানুষদের পরিত্যক্ত এই সব পাথুরে অস্ত্রশস্ত্র একদা খুঁজতে বেরিয়েছিলেন রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কয়েকজন উৎসাহী কর্মী। তাদের অনুসন্ধানের সময় অপ্রত্যাশিতভাবে তারা খুঁজে পেলেন প্রস্তরযুগের আদিমতম মানুষের বাসস্থান এক পাহাড়ী গুহা। এই দুঃসাহসিক অভিযান-কারীরা গোড়াতেই এমন ধারণা করেছিলেন, যেখানে এত কাঁড়ি কাঁড়ি পাথুরে হাতিয়ার পাওয়া যায়, সেখানে নিশ্চয়ই তাদের বসতির কোন চিহ্ন থাকবেই। মনে অদম্য উৎসাহ নিয়ে তাঁরা ঝাড়গ্রাম মহকুমার পাহাড়-জঙ্গলে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে অবশেষে বীনপুর থানার লালজলে গিয়ে পৌঁছোলেন। গ্রামটি পাহাড় দিয়ে ঘেরা এক উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত। কাছের উঁচু পাহাড়টির নাম দেবপাহাড়, যার দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পুব গা বেয়ে প্রবাহিত এক ক্ষীণস্রোতা পাহাড়ী জলপ্রবাহ গিয়ে মিশেছে তারাফেণী নদীতে যা কিনা বিখ্যাত কাঁসাই-এর এক উপনদী। এখানের এই দেবপাহাড়েই পাওয়া গেল আদিম মানুষের আবাসস্থান একটি গুহা। সেই কবেকার গুহা—এতদিনে অব্যবহার্য থাকার ফলে পাথর ও মাটিতে তা ভরাট হয়ে গেছে। সেখানকার ধূলোবালি আর পাথর-টুকরোর আস্তরণ সরিয়ে পাওয়া গেল নব্যপ্রস্তরযুগের বেশ কিছু মসৃণ ধরনের হাতিয়ার। ভেতরে আবার গুহাটির দুটি কক্ষ, যার একটি প্রবেশপথে পাওয়া গেল মহাপ্রস্তর যুগের সমাধির নিদর্শন। এ থেকে জানা গেল সেকালের মৃতদেহ সৎকারের আদিম প্রথা। সেখানে চারটি পাথরের চাঙড় বসিয়ে চৌবাচ্চা তৈরী করে রাখা হয়েছিল মৃতদেহটিকে এবং সঙ্গে কিছু মৃৎপাত্র ও একটি

লোহার বর্শা ফলক। চৌবাচ্চার উপরে অবশ্য পাথর বসিয়ে সেটিকে ঢাকা দেওয়া হয়েছিল। সত্যিই চমৎকৃত হতে হয়! কারণ এমন এক গুহার ভেতর মহাপ্রস্তর-যুগের কবরখানা, যার নিদর্শন ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের আর কোথাও পাওয়া যায়নি, তা কিনা পাওয়া গেল এই লালজলে। শুধু তাই নয়, বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে উৎসাহী অভিযানকারীরা ক্রমাগত অনুসন্ধানের ফলে আবিষ্কার করলেন—গুহামানবদের অঙ্কিত দেওয়াল চিত্র, যা প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। দেওয়ালে এটি তবে কিসের চিত্র, তা নিয়ে এখানকার অনুসন্ধানীদল যা বর্ণনা দিয়েছেন তা হল, রেখা দিয়ে আঁকা এই চিত্রটি সম্ভবতঃ কোন হরিণ বা গরু জাতীয় প্রাণীর পার্শ্বচিত্র যাতে লাল, সবুজ ও ক্রীম রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং আদিতে অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই গুহায় যে মানুষ বসবাস করেছিল তাতে যেমন কোন সন্দেহ নেই, তেমনি গুহার ভেতর এই স্তর বিন্যাসের প্রকৃতি এবং সেখানকার বিভিন্ন স্তর থেকে পাওয়া বস্তু থেকে মোটামুটি এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে লৌহযুগের সৃষ্টির পূর্বে নব্যপ্রস্তরযুগের মানুষও এখানে বসবাস করেছিল।

প্রাগৈতিহাসিক কালের মানব-সভ্যতার এসব অমূল্য নিদর্শন যাঁরা আবিষ্কার করলেন প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের সেই অনুসন্ধানী প্রত্নবিজ্ঞানীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

৪. তাম্রযুগসভ্যতার ঐতিহ্য

মেদিনীপুরের আদিম প্রস্তরকালের সভ্যতার যে বিকাশ ঘটেছিল, তার ধারাবাহিকতা চলে এসেছে পরবর্তী ধাতুযুগ পর্যন্ত। এ জেলার নানাস্থান থেকে পাওয়া গেছে তাম্রপ্রস্তর সভ্যতার বেশ কিছু নিদর্শন, যার অধিকাংশই হল তামার তৈরি কুঠার ফলক। তামার এসব আয়ুধ প্রভৃতি প্রাপ্তিস্থানের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় তামজুড়ি গ্রামের। মেদিনীপুর জেলার বীনপুর থানার এলাকাধীন এই গ্রাম থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে তামার কুঠারটি পাওয়া গেছে সেটি একটি স্কন্দযুক্ত কুঠার—যা বর্তমানে কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে

সংরক্ষিত হয়েছে। এখানে তামাজুড়ি নামের সঙ্গে তামার উল্লেখটিও লক্ষণীয়। ঠিক এইভাবেই তাম্র সমৃদ্ধির স্মৃতিবহ প্রাচীন সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্ত নামটির প্রসঙ্গেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। কেননা আধুনিক তমলুক শহরের কাছাকাছি প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়ে তামার একটি ক্ষুদ্রায়তন কুঠারও পাওয়া গেছে। সেদিক থেকে তামাজুড়ি আর তাম্রলিপ্ত নাম দু'টির মধ্যে অর্থগত পার্থক্য তেমন কিছু নেই বলেই মনে হয়।

এই জেলার আরও যে যে স্থানে তামার আয়ুধ পাওয়া গেছে তার মধ্যে একটি হল, গড়বেতা থানার অন্তর্গত আগুইবনি গ্রাম। এখান থেকে একটি তামার কুঠার ছাড়া পাওয়া গেছে আরও এগারোটি তামার বালা ও কয়েকটি তাম্রপাত্র। এ জেলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ছাড়াও জেলার দক্ষিণপ্রান্তে এগরা থানার চাতলা গ্রাম থেকেও পাওয়া গেছে একটি স্কন্দযুক্ত তামার কুঠার ফলক (এই সব তাম্রায়ুধ নিদর্শনগুলি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আলোচ্য এই থানা এলাকা থেকে কর্ণসুবর্ণের অধিপতি রাজা শশাঙ্কের মোট তিনটি তাম্রশাসন প্রাপ্তিতে এখানকার প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বের কথাই বেশী করে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ ছাড়াও এ জেলার বীনপুর থানার আকুলডোবা, সবং থানার পেরুয়া, জামবনী থানার পরিহাটি প্রভৃতি স্থান থেকেও প্রাগৈতিহাসিক কালের তামার কুঠার পাওয়া গেছে, যা ঐ সভ্যতাকালের এক চমকপ্রদ সাক্ষ্য।

সুতরাং মেদিনীপুরের মাটিতে প্রাগৈতিহাসিক কালের এইসব তাম্রায়ুধ ও অন্যান্য তামার দ্রব্য আবিষ্কৃত হওয়ায় সেকালের আদিম অধিবাসীদের তামার ব্যবহার সম্পর্কে মোটামুটি একটি চিত্র পাওয়া যায়। দেখা যাচ্ছে, এই সব তামার আয়ুধের বেশ একটা অংশ পাওয়া গেছে পশ্চিমবাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে, অর্থাৎ যেখানে তামার খনির অস্তিত্ব রয়েছে। অর্থাৎ, সেই এলাকাটি হল, মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমার লাগোয়া ধলভূম, সিংভূম, পুরুলিয়া ও ছোটনাগপুর প্রভৃতি। ব্রিটিশ আমলে এই সব এলাকায় খনিজ তাম্রসম্পদের প্রথম সন্ধান দেন কর্নেল হিউটন এবং তা ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়। স্বভাবতই এর ফলে ইংরেজ বণিকেরা প্রলুব্ধ হয়ে ঐসব এলাকায় তামার খনি খোঁড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও শেষ পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি। পরে ভারতীয় ভূতত্ত্ব সর্বেক্ষণের পক্ষ থেকে এই সব অঞ্চলে সমীক্ষা করে ভি. বল যে বিবরণ দেন, তাতে তিনি ধলভূম ও সিংভূমের বহুস্থানে এবং

মেদিনীপুরের সীমান্ত এলাকায় প্রাচীন সড়কগুলির আশেপাশে খনিজ তাম্রশিল্পীদের পরিত্যক্ত চুল্লি ও তার পাশে স্তূপাকার ধাতুমল দেখতে পান বলে উল্লেখ করেন।

সুতরাং বাংলার এই সীমান্ত অঞ্চলে তামা প্রাপ্তিস্থানের হদিশ জানার পর একথা পরিষ্কার বোঝা যায়, ঐসব অঞ্চলের আদিম জনগোষ্ঠী একদা প্রাচীন পদ্ধতিতে খনি থেকে তামা নিষ্কাশন করে এইসব তামার হাতিয়ার নির্মাণে সমর্থ হয়েছিলেন—যার ফলশ্রুতি হল এক তাম্রভিত্তিক সভ্যতার বিকাশন। এ বিষয়ে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের ভূতপূর্ব মহাধিকর্তা শ্রী বি. বি. লাল এইসব তাম্রায়ুধ সম্ভার আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, গাঙ্গেয় অববাহিকায় বিশেষতঃ দক্ষিণপূর্ব ভারতে প্রাপ্ত তাম্রকুঠারগুলি সম্ভবতঃ এই অঞ্চলে বসবাসকারী 'প্রোটো-অস্ট্রালয়েড' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীদের পূর্বপুরুষদের দ্বারাই নির্মিত হয়েছিল।

সাঁওতাল, মুণ্ডা, লোধা প্রভৃতি আদিবাসী ও অনুন্নতবর্ণের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বসবাসে মেদিনীপুর জেলা বিশিষ্ট। সুতরাং এদের মধ্যে অতীতের সেই 'প্রোটো অস্ট্রালয়েড' জনগোষ্ঠীর বংশধরদের যে অভাব নেই, তা তাদের জীবনধারণের রীতিনীতি থেকেই বেশ বোঝা যায়।

৫. তট ও তটিনী সংবাদ

সভ্যতার উত্থান-পতনে নদীর ভূমিকাই প্রধান। নদীর তীরেই মানুষের বসতি, নদীর জল দিয়েই তার শস্য বৃদ্ধি এবং নদীর উপর দিয়েই তার বাণিজ্যের জয়যাত্রা। অন্যদিকে অনেক নদী তার স্বাভাবিক নিয়মে খাত পরিবর্তন করেছে, বা, কতক নদী গ্রাম-জনপদ ধ্বংস করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের জীবনধারায় কত যে পরিবর্তন এনে দিয়েছে তার সব হিসেব আমাদের হয়ত জানা নেই। বড়ো নদীগুলির ভূমিকা বা তার ইতিহাস নিয়ে এ যাবৎ বহু আলোচনা হয়েছে, কিন্তু ছোট নদীগুলির ভূমিকা আমাদের অগোচরেই থেকে গেছে। শুধু তার প্রচলিত নামটুকুই বিস্মৃতির হাত থেকে কোনরকমে রক্ষা পেয়েছে।

সুতরাং দেশকে জানতে গেলে দেশের ছোট-বড় নদ-নদীগুলিকেও আমাদের চেনা দরকার এবং সেগুলি সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকাও দরকার। আমাদের দেশে পাহাড়-পর্বত ও শৃঙ্গ জয় করার জন্য তরুণরা অভিযান করেন, কিন্তু দেশের ছোট বড এই সব নদ-নদীর উৎপত্তিস্থল আবিষ্কারে তেমন আগ্রহ আজও সৃষ্টি হয় নি। সুতরাং মেদিনীপুর জেলার নদ-নদীগুলির উৎপত্তি ও তার ভূমিকা সম্পর্কে একটা নাতিদীর্ঘ বিবরণ পরিবেশিত হল, যা সাধারণের আগ্রহ সৃষ্টির একান্ত সহায়ক হবে বলে মনে করি।

কাঁসাই—এ প্রবন্ধে প্রথমেই আসছি কাঁসাই ও তার উপনদীগুলি সম্পর্কে। কাঁসাই এর উৎপত্তি পুরুলিয়া জেলার ঝালদা থানার 'কপিলা' পাহাড়ের বুক থেকে প্রবাহিত এক ঝরণা থেকে। তারপর পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার বহু গ্রাম-গ্রামান্তরের পাথর আর মাটি ডিঙ্গিয়ে এঁকে বেঁকে বীনপুর থানার রামগড়ের কাছে মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করেছে। এ জেলায় পুবমুখী অর্ধেকটা আসার পর কাপাসটিকরি গ্রামের কাছে তার বিশালত্ব হারিয়ে ফেলে দুভাগ হয়ে গেছে। একটি শাখা পুবমুখে রূপনারাণে গিয়ে মিশেছে এবং মূল শাখাটি জেলার ময়না থানার টেংরাখালির কাছে কেলেঘাই-এ যেখানে সঙ্গম হয়েছে সেখান থেকে কাঁসাইয়ের নাম বদল হয়ে দাঁড়িয়েছে হলদী। অর্থাৎ কাঁসাই ও কেলেঘাই-এর জলরাশি শেষ অবধি গিয়ে মিশেছে হুগলী-ভাগীরথী নদীতে। বাঁকুড়া জেলায় কুমারী নদী যেখানে কাঁসাইয়ের সঙ্গে মিলিত হয়েছে সেই সঙ্গমস্থলেই নির্মিত হয়েছে কংসাবতী জলাধার এবং ঐ জলাধার থেকে খাল কেটে এনে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের বহু ভূখণ্ডে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মেদিনীপুর শহরের দক্ষিণে মোহনপুরের কাছে কাঁসাই-এর বুকে আড়াআড়ি নীচু বাঁধ দিয়ে সমস্ত জলধারা মেদিনীপুর খালে প্রবাহিত করে দেওয়া হয়েছে। তারপর মেদিনীপুর খালের জল মাদপুরের কাছে এক গভীর সেচ খালের মারফৎ ডেবরা, পিংলা, সবং ও খড়্গপুর থানার বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এক সময় পাঁশকুড়োর কাছে কাঁসাই পুবমুখী হয়ে রঘুনাথবাড়ির পাশ দিয়ে তমলুকে রূপনারায়ণে গিয়ে মিশেছিল। আজ সে পথ মজা, কিন্তু দলিল-দস্তাবেজে তা আজও 'কাঁসাই বেড্' নামে পরিচিত হয়ে রয়েছে। এ বিষয়ে অন্য একটি মত হল, পাঁশকুড়ো থেকে হলদী পর্যন্ত বর্তমানে কাঁসাইয়ের এই অংশটির নাম নয়া কাটানো অর্থাৎ এটি নতুন করে কাটানোর জন্যই এই নাম। জনশ্রুতি

যে, এই অংশটি নাকি মহিষাদলের আদি ভূস্বামী কল্যাণ রায়ের আমলে খনিত—যেজন্য এ অংশটিকে অনেকে 'রায়খালি' বলেও উল্লেখ করে থাকেন।

তারাফেনি—এটি কাঁসাইয়ের এক উপনদী। বীনপুর থানার আঁধারগেড়ে-পাটাগড় গ্রামের কাছ থেকে এর উৎপত্তি। তারপর বাঁকুড়া জেলার রাইপুর থানার কিছু অংশে প্রবাহিত হয়ে পুনরায় বীনপুর থানার সিজুয়ার কাছে কাঁসাই-এ এসে মিশেছে।

কেলেঘাই—কাঁসাইয়ের উপনদী হিসাবে এ-নদ গ্রীষ্মে শীর্ণকায় হলেও বর্ষায় ভীষণরূপ ধারণ করে। এর উৎপত্তি ঝাড়গ্রাম থানার গোলবান্দির কাছে এক জঙ্গলময় টিলার উপরে নির্গত এক ঝর্ণাধারা থেকে। পুবমুখে শাঁকরেল থানার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কেশিয়াড়ী থানার উত্তর সীমানা বরাবর দক্ষিণমুখী হয়ে নারায়ণগড থানা এলাকায় প্রবেশ করেছে। তারপর পুবমুখী হয়ে এঁকে বেঁকে বেশ চওড়া আকার ধারণ করে সবং, পটাশপুর, ভগবানপুর থানার সীমানা বরাবর ময়নার কাছে টেংরাখালিতে এসে কাঁসাই-হলদীতে মিশেছে।

কেলেঘাই-এর নিজস্ব জলধারা ছাড়াও, তার ছোট বড় অসংখ্য উপনদীর জলধারাও এর সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে যুক্ত হয়েছে। এখন সেগুলি শুষ্ক এবং কতকগুলি বর্তমানে খালের আকার ধারণ করেছে। কেলেঘাই-এর এসব উপনদীর মধ্যে একটি হল বাঘুই—যা বর্তমানে খালে পরিণত হয়েছে। দাঁতন থানার কেদার গ্রামে যে পাবকেশ্বর শিবের মন্দির আছে তার লাগোয়া পুষ্করিণীর কোণ থেকে উত্থিত এক প্রস্রবণের জলধারা ঐ বাঘুই-এর সঙ্গে মিশে কেলেঘাইতে সঙ্গম হয়েছে।

কেলেঘাই পটাশপুর থানার বুলাকিপুরের কাছে দু' অংশে ভাগ হয়ে এক বৃত্তের সৃষ্টি করেছে। দক্ষিণমুখী গোলাকার অংশটি বর্তমানে মজে যাওয়া এক খাতে পরিণত হয়েছে বটে, কিন্তু এরই তীরে প্রাচীন জনপদের বেশ কিছু ধ্বংসাবশেষ লক্ষ করা যায়।

খিরাই—ডেবরার কাছ থেকে প্রবাহিত হয়ে এ নদীটি পিংলা থানার লক্ষ্মী-পাড়ির কাছে মিশেছে পাঁচথুপিতে এবং ঐ পাঁচথুপি যোগ হয়েছে কেলেঘাইতে। বর্তমানে এ নদীটি খালে পরিণত হলেও, অতীতে সেটি যে বেশ বৃহৎ ছিল, তার বিস্তৃতি আজও লক্ষ করা যায়।

পাঁচথুপি—এটিও ডেবরা থানার বালিচকের কাছে উৎপত্তি হয়ে এখানকার

কেদার-ভুড়ভুড়ির কুণ্ড থেকে উত্থিত প্রস্রবণের জল এবং গিরাই-এর জলধারা নিয়ে ময়না থানার নারকেলদহের কাছে কেলেঘাইতে এসে মিশেছে।

কপালেশ্বরী—এটিও এক প্রাচীন নদী। এই মজা নদীটির তীরে উল্লেখযোগ্য বহু প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও অন্যান্য প্রত্নবস্তুর নিদর্শন সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। মাদপুরের কাছে একদা কোন এক প্রস্রবণ থেকে নির্গত হয়ে এটি পিংলা ও সবং থানার বিভিন্ন গ্রামের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভগবানপুরের কাছে কেলেঘাইতে সঙ্গম হয়েছে।

পারাং—বীনপুর থানার ভাঙ্গাডালি থেকে বেরিয়ে শালবনী থানা এলাকায় পুবমুখী হয়ে এসে কেশপুর থানার পারুলিয়ার কাছে উত্তর-পুবমুখী হয়েছে। তারপর এই থানার রায়পুরের কাছে দুটি শাখা হয়ে একটি দক্ষিণে কাঁসাইয়ে ও অন্যটি পুবে রূপনারায়ণে মিশেছে।

শিলাই—মেদিনীপুর জেলায় শিলাই বা শীলাবতী নদীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন শাখা ও উপনদীর জলধারায় পুষ্ট হয়ে এ নদী বর্ষায় ভীষণ এক রূপ ধারণ করে। মানভূম থেকে উৎপত্তি হয়ে এ নদী আঁকাবাঁকা পথে এ জেলার গড়বেতা থানার উত্তরে লক্ষ্মীপাল গ্রামের কাছে প্রবেশ করেছে। তারপর পুবমুখী হয়ে দক্ষিণে ঘাটাল মহকুমায় এসে নাড়াজোলের কাছে আবার উত্তরমুখী হয়ে ঘাটাল শহরের পাশ দিয়ে বন্দরের কাছে রূপনারায়ণে মিশেছে। এখান থেকেই উত্তরের অংশ দ্বারকেশ্বর এবং নিচের অংশ রূপনারায়ণ নামে খ্যাত হয়েছে। বাঁকুড়া জেলার পুরন্দর, গোপা ও বেতাল প্রভৃতি নদ-নদীর জলধারা নিয়ে এ নদী পুষ্ট হলেও এ-জেলার আরও অনেক ছোট-খাট উপনদী তাদের জলধারা দিয়ে একে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

বেতাল—এটি শিলাইয়ের এক উপনদী। গড়বেতা থানার পারাকানালি, জামদাহাড়া ও কদমবাঁধি গ্রামের কাছ থেকে তিনটি জলধারা একত্রে মিলিত হয়ে উত্তরপুবে গড়বেতা থানার বাসুদেবপুর গ্রামের কাছে শিলাইয়ে সঙ্গম হয়েছে।

বিড়াই—বাঁকুড়া থেকে উৎপন্ন হয়ে শালবনী থানার বীরভানপুরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ঐ থানার জগুলাড়ার কাছে তমালে মিশেছে।

তমাল—বেতালের উৎপত্তিস্থল পারাকানালির পাশের গ্রাম মেট্যাল (থানা গড়বেতা) থেকে এ নদী উৎপত্তি হয়ে গোয়ালতোড়ের পাশ দিয়ে শালবনীর উত্তর গা ঘেঁষে কেশপুর থানার মুগবসানের কাছে কুবাই নদে মিশেছে। তামাল ছোট নদ হলেও আসলে তাকে পুষ্ট করেছে বিড়াই।

কুবাই—এ নদীটি শিলাইয়ের উপনদী হলেও বিড়াই ও তমালের জলধারায় পুষ্ট। এর উৎপত্তিস্থল গড়বেতা থানার ভুলিয়া এবং সেখান থেকে বেরিয়ে মুগবসানের কাছে তমালের জলস্রোত নিয়ে প্রবলগতিতে এসে মিশেছে দাসপুর থানার নাড়াজোলের কাছে শিলাই নদীতে।

বুড়ীগাং—এ নদীটি তমাল-এরই শাখা, যা অমৃতপুরের কাছে উত্তর দিকে নাম নিয়েছে বুড়িগাং। দাসপুর থানার কাটাদরজা মৌজার কাছে এটি ছান্দুর নদে মিশেছে। যদিও এখন এটি খালে পরিণত হয়েছে, তবু একসময় এটি যে নদী হিসাবে পরিচিত ছিল তার প্রমাণ রয়েছে তার নামকরণের মধ্যেই।

দোনাই—বুড়ীগাং-এর মতই এটিও ছান্দুরে মিশেছে। এর উৎপত্তিস্থল হল চন্দ্রকোণা থানার রঘুনাথপুর। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে কুঁয়াপুর হয়ে ফুলদহের কাছে ছান্দুরে মিশেছে।

ছান্দুর—যদিও এটি এখন খালে পরিণত হয়েছে, তাহলেও বুড়িগাং ও দোনাই-এর জলধারা নিয়ে এটি শিলাইয়ে যুক্ত হয়েছে।

শাঁকরী—এ নদীর নাম শঙ্করী, চলতি কথায় শাঁকরী। হুগলী জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ঘাটাল থানার বালিডাঙ্গার কাছে এ নদীটি মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করেছে। তারপর সেখান থেকে দৌলতচকের কাছে আমোদর নদে মিলিত হয়েছে।

আমোদর—এ নদটি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে উল্লেখ রয়েছে। এটিও বাঁকুড়া থেকে উৎপত্তি হয়ে হুগলী জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ঘাটাল থানার উত্তরে সুলতানপুরের কাছে মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করেছে। তারপর সেখান থেকে দৌলতচকের কাছে শাঁকরী নদীর জলধারা নিয়ে মনস্তখার কাছে শিলাই নদীতে সঙ্গম হয়েছে।

কেটে—যদিও এটি বর্তমানে খালে পরিণত হয়েছে, কিন্তু বারমাস এটিতে জল থাকায় এটির ভূমিকাও কম নয়। বাঁকুড়ায় উৎপত্তি হয়ে এ জেলার গড়বেতা থানার উপর দিয়ে এর একটি শাখা চন্দ্রকোণা থানার শিরসার কাছে এবং অন্য আর একটি শাখা ঘাটাল থানার কালিচকের কাছে শিলাইতে এসে মিশেছে।

ডুলং—ঝাড়গ্রাম থানার মধুপুর থেকে উৎপত্তি হয়ে, ঘাটশীলা থেকে প্রবাহিত কোপান-এর জলধারা নিয়ে শাঁকরাইল থানার রোহিণীর কাছে সুবর্ণরেখায় এসে সঙ্গম হয়েছে।

রসুলপুর—এই জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত বাগদা নামে

চিহ্নিত এক নদী কালীনগরের কাছে বোরোজ নদীর (বর্তমানে সদর খাল নামে পরিচিত) সঙ্গে মিশে একত্র হয়ে রসুলপুর নামে কাউখালীর কাছে হুগলী-ভাগীরথীতে সঙ্গম হয়েছে।

এতক্ষণ মেদিনীপুরের কয়েকটি অখ্যাত নদ-নদীর প্রসঙ্গ আলোচিত হল। দেখা যাচ্ছে, প্রধান নদ-নদীগুলির সঙ্গে অসংখ্য উপনদী ও শাখানদী যুক্ত হওয়ায় বর্ষায় এইসব নদীগুলি একান্তই স্ফীত হয়। এ ছাড়া ক্ষুদ্র নদীগুলির উৎপত্তিস্থলও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। এগুলির সঙ্গে বেশ কিছু প্রস্রবন ও ঝরণা যুক্ত হওয়ায়, সেগুলির ভূগর্ভস্থ জলের স্তর ও সহজে সেচের জন্য জল প্রাপ্তি সম্পর্কে নতুনভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা হওয়ারও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। ইতিমধ্যেই এইসব মজা নদীগুলির তীরে বেশ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়ায়, আশা করা যায় সঠিকভাবে এইসব নদী-খাতের ধারে অনুসন্ধান চালালে এমন বহু প্রাচীন জনপদের হদিশ মিলতে পারে—যা প্রচলিত ইতিহাসের বহু তথ্যকে পুনর্মূল্যায়ন করার নির্দেশ দিতে সক্ষম হবে।

৬. অন্নদার পাঁচালী

আমার এ নিবন্ধের বক্তব্য হল, এ জেলার কৃষিসম্পদ নিয়ে। তবে এ বিষয়ে আজকের কৃষিতাত্ত্বিকরাই জেলার কৃষি-চিত্রটি যথার্থ তুলে ধরতে পারবেন। তাহলেও সাবেকী থেকে হাল আমলের কৃষিতে যে সব পরিবর্তন ঘটে চলেছে সে সম্পর্কে ভালোমন্দ যাই হোক, পাঠকদের কিছুটা ওয়াকিফহাল করাও আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু সবচেয়ে মুশকিল হচ্ছে কৃষি সম্পর্কীয় কোন কিছু বলতে গেলে, যেসব একর আর টনের হিসেব চাই, তা যথাযথ দিতে না পারার অক্ষমতা। অন্তত এক্ষেত্রে পাঠকদের সেই হিসেবনিকেশের গোলকধাঁধায় ফেলতে চাইনে।

এ জেলার চাষবাসের কথা বলতে গেলে প্রথমেই তার ভৌগোলিক চরিত্রের প্রসঙ্গে আসতে হয়। কারণ জেলার ভূপ্রকৃতি বড়ো বিচিত্র। জেলার উত্তর থেকে দক্ষিণে মাঝামাঝি একটা সীমারেখা যদি টানা যায়, তাহলে দেখা যাবে তার পুব অংশটি পলিমাটি দিয়ে ঢাকা যেখানে সবুজ ও সমতল ভূমির এক

মনোরম দৃশ্য। আর পশ্চিম অংশটি উঁচুনিচু বনময় রুক্ষ গৈরিক পাথুরে মাটির প্রান্তর। অর্থাৎ হিসেব কষে দেখলে দেখা যাবে, পশ্চিম প্রান্তের এক-তৃতীয়াংশ ছোটনাগপুরের প্রাকৃতিক গঠনের মত এবং বাকী দুই-তৃতীয়াংশ চাষবাসে উন্নত পশ্চিম বাংলার অন্যান্য জেলার তুল্য। সেজন্য জেলার ভূপ্রকৃতির এই বৈচিত্র্যময় চরিত্র আমাদের কাছে একান্তই অভিনব।

সাহেবী আমলের পুরাতন চিঠিপত্র ও কাগজপত্রে এ জেলার কৃষিজ উৎপাদন সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। ১৭৮৯-১৭৯২ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে এ জেলায় তুলো, রেশমের গুটিপোকার খাদ্য তুঁত পাতা, তামাক, আখ ও নীলগাছের চাষ-আবাদ যে পুরোদমে চলছে তার বিবরণ পাওয়া যায় জেলার কালেক্টরকে লেখা বিভিন্ন চিঠিপত্রের সূত্রে। ঐ সময় কোম্পানির 'বোর্ড অফ্ ট্রেড্' তুলো চাষের জন্য ঢাকা থেকে উন্নত ধরনের বীজ এবং ভাল নীল রঙ পাবার জন্য ক্যাম্বে থেকে আমদানী করা উৎকৃষ্ট জাতের নীলগাছের বীজ বিনামূল্যে চাষীদের বিতরণ করার জন্য জেলার কালেক্টরকে নির্দেশ দিচ্ছেন। জেলার কালেক্টরের তরফ থেকে রিপোর্টও দেওয়া হচ্ছে, ১৭৮৯ সালে এ জেলায় বিভিন্ন জাতের তুলোর উৎপাদন হয়েছে মোট দশ হাজার ছাপান্ন মণ।

১৮৭১ সাল নাগাদ এ জেলায় ধান কেমন হয়েছিল তা জানা না গেলেও, খড় বোধ হয় খুব বেশী পরিমাণেই হয়েছিল। এ বিষয়ে জেলার কালেক্টর সবং ও মোহাড় পরগণার বাড়তি খড় কিনে নেবার জন্য হিজলীর সল্ট এজেন্টকে যে নির্দেশ দিচ্ছেন তা তাঁদের চিঠি চালাচালিতে জানা যাচ্ছে। কারণ দেশী প্রথায় নুন তৈরীতে যে জ্বালানীর প্রয়োজন হয় তা ঐসব পরগণায় ঘাটতি পড়ায়, বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে কাঠের বদলে খড় দিয়ে সমস্যা মেটাবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

কোম্পানির আমলে কৃষি সংক্রান্ত সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্য হল, ১৭৯৮ সালে জেলায় সর্বপ্রথম আলুচাষের সূচনা। চাষীদের উৎসাহিত করার জন্য এই সর্বপ্রথম বিনামূল্যে পনের মণ বীজ-আলু বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সে আলুচাষের কিভাবে অগ্রগতি হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। মোটামুটি কোম্পানির আমলের এই কৃষিচিত্রের পর আমরা উনিশ শতকের গোড়ায় চলে আসি।

১৮০৩ সালে জেলার কালেক্টর সাহেবের এক চিঠিতে জানা যায়, এ জেলার চাষযোগ্য জমির শতকরা পঁচাত্তর ভাগই হচ্ছে ধানী জমি এবং শতকরা তের ভাগ তুলোচাষের, পাঁচ ভাগ আখচাষের ও বাকী সাত ভাগ

কড়াই, সরষে, তিল, তামাক ও অন্যান্য শাকসব্জীর জমি। আজকের দিনে চাষের ফসল মিলিয়ে নিতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, আখ, কড়াই বা শাকসব্জী না হয় যেমন তেমন, তুলোচাষের সে সব জমি কোথায়? একদিন হয়ত জেলার রমরমা বস্ত্রশিল্পের দৌলতে তুলোর চাষ বেড়ে ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে সে চাষের প্রয়োজন যে ফুরিয়েছে তা জেলাবাসীমাত্রই স্বীকার করবেন। অবশ্য ১৯৩৫ সালের সরকারী রিপোর্টে তুলোচাষের অবলুপ্তির কথা স্বীকারও করা হয়েছে। ঠিক এইভাবে আখচাষের ক্ষেত্রেও ঐ একই ঘটনা ঘটেছে। সরকারী তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, ১৮২২ সালে এ জেলা থেকে প্রচুর পরিমাণে আখ বাইরে রপ্তানী হয়েছে। অথচ এর ঠিক একশো তের বছর পরে অর্থাৎ ১৯৩৫ সালে বিভাগীয় কমিশনারকে লেখা জেলার কালেক্টরের এক চিঠিতে দেখা যাচ্ছে, আখচাষের ফলন একেবারেই পড়তির দিকে, শুধুমাত্র স্থানীয় প্রয়োজন মেটাতেই যা ফুরিয়ে যায়।

১৮৬৮-৬৯ সালের রেভেনিউ সার্ভের রিপোর্টে জেলার উৎপন্ন ফসলের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তা হল : ধান ও অন্যান্য খাদ্যশস্য, তৈলবীজ, আখ, তুলো, নীল, পাট, শন, তামাক এবং শাকসব্জী। এবারের তালিকায় নীল প্রসঙ্গের সংযোজন। বেশ বোঝা গেল জেলায় নীলকুঠিগুলি তখন পুরোদমেই তাদের উৎপাদন বাড়িয়ে চলেছে।

এরপর বিগত কুড়ি বছর ধরে জঙ্গল হাসিল করে ধানী জমির শতকরা পঞ্চাশ ভাগ যে বাড়ানো হয়েছে, সে সম্পর্কে ১৮৭২ সালে জেলার কালেক্টর ওপরআলার কাছে সংবাদ পাঠাচ্ছেন। এসব জঙ্গলে কেটে আবাদযোগ্য জমি পাওয়ায় সেখানে ক্রমশঃ বসতিও বিস্তারলাভ করছে। 'বনকাটি' নামের গ্রাম যে এইভাবে জন্মলাভ করছে তা বুঝতে তো কোন অসুবিধে হয় না।

কোম্পানির আমলে নীলচাষের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারী নথিপত্রে দেখা যাচ্ছে, ১৮৭৭ সাল নাগাদ জেলায় ব্যাপকভাবে নীলচাষ বেড়েছে। সরকারী হিসেবে সে সময় প্রায় কুড়ি হাজার একর জমিতে নীলচাষ হচ্ছে এবং সে চাষের এলাকা বিস্তৃত হয়েছে বিশেষ করে বগড়ী, বাহাদুরপুর ও জঙ্গল-মহল পরগণায়। নীলচাষের এ রমরমা বছর পঁচিশ পরে আর দেখা যাচ্ছে না। ১৯০৩ সালে সরকার রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন, উঁচু বা নদীতীরবর্তী জমিতে যে নীলচাষ করা হত, তা একেবারেই উঠে গেছে। ১৮৯৮ সাল থেকে নীলচাষের এইভাবেই ইতি। বুঝতে অসুবিধে নেই যে, নীলচাষের জমিগুলি পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে

ধানী জমিতে পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে ধানচাষের জমির পরিমাণ বেড়েছে।

১৮৮১ সালের 'ইম্পিরিয়াল গেজেট'-এ এ জেলার উৎপন্ন ফসলের এক তালিকা দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ধানই হল এ জেলার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য, যা চাষযোগ্য এলাকার তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে বিস্তৃত। এছাড়া আছে, গম, যব, ছোলা, মটর, মুসনে, সরষে, তিল, পাট, শন, আখ, নীল, তুলো, তুঁত, পান প্রভৃতি। এ তালিকায় দৃষ্টি আকর্ষক দুটি ফসল হল, তুঁত আর পান।

জেলায় একদা রেশম-শিল্পের দৌলতে গুটিপোকার খাদ্য হিসেবে তুঁত পাতার প্রয়োজনে যে এটির ব্যাপকভাবে চাষবাদ হত তা কোম্পানির আমলে আগেই আমরা দেখেছি। কিন্তু 'ইম্পিরিয়াল গেজেট' প্রকাশের কুড়ি-বাইশ বছরের মধ্যেই এ কৃষিজ উৎপাদনটি যে অস্তিমদশায় পৌঁছেছে, তা ১৯০৩-৪ সালের এক সরকারী প্রতিবেদনে দেখা যায়।

তাহলে লক্ষ করার বিষয়, চাষযোগ্য জমি কিন্তু পড়ে থাকছে না। নীলের জমিতে ধান শুরু করা হয়েছে, তুঁতের জমিতে কি? এ বিষয়ে সরকারী প্রতিবেদন বা লিখিত কোন তথ্য নীরব। তবে গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে অনুসন্ধানে জানা যায়, জেলার উত্তর-পূর্বাংশে তুঁতের জমিতে ব্যাপকভাবে পানচাষের ব্যবস্থা হয়েছে, যা অর্থকরী ফসল হিসেবে চাষীদের একমাত্র বাঁচার পথ হয়ে দাঁড়ায়। জেলার দক্ষিণে ভগবানপুর, পটাশপুর. দাঁতন ও মোহনপুর থানা এলাকায় তখন অবশ্য পানচাষ ভালভাবেই শুরু হয়ে গেছে।

এবার ১৯১১-১৭ সালের 'সেটেলমেন্ট রিপোর্ট' পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, জেলা-সীমানায় নদী বাদ দিয়ে জেলার আয়তন হল, ৫,০৫৫ বর্গমাইল; তারমধ্যে খাল, বিল, পুকুর, ডোবার আয়তন ৩৪৪ বর্গমাইল এবং বাকী জমি হল ৪৭১১ বর্গমাইল। এর মধ্যে চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ শতকরা ছেষট্টি ভাগ, চাষযোগ্য পতিত চব্বিশ ভাগ এবং বাকী পতিত জমি দশভাগ। এ সময়ের উৎপন্ন ফসল ধান, গম, যব, ছোলা কড়াই, মুসনে, তিল, সরষে, আখ, তুলো, জোয়ার, পান প্রভৃতি।

কিন্তু এসব রিপোর্টে চাষবাসের উন্নতি সম্পর্কে যেসব ভাল কথাই লেখা হোক্ না কেন, সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের অধীনে দেশের কৃষি-অর্থনীতির হাল যে শোচনীয় হয়ে উঠেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার কারণ, দেশজুড়ে প্রায়শই দুর্ভিক্ষ এবং তদুপরি ম্যালেরিয়ার বিভীষিকা। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির

কথায় সে তাণ্ডবলীলার চিত্র হল : '... বর্ধমান হইতে এক মহামারী গ্রামে গ্রামে ছাউনি করিতে করিতে যেন তালে তালে দক্ষিণ দিকে আসিতেছে। এই মেলেরিয়া-রাক্ষসী অদ্যাপি তিল তিল করিয়া লোকের রক্ত শোষণ করিতেছে। কিন্তু প্রথম আক্রমণের সময় এমন শিষ্ট মূর্তি ছিল না। আমার মনে পড়ে, ছয় মাসের মধ্যে আমাদের গ্রামের দশ আনা প্রাণী লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছিল। কাঁদিবার মানুষ ছিল না, মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইত না, শ্মশান ভূমিতে গৃধ্র শৃগাল কুকুরের মাতামাতি চলিয়াছিল। ... এ বিষয়ে বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুরে প্রভেদ নাই ...।"

১৯৪২ সালে ভয়াবহ সাইক্লোন ও বন্যার বিভীষিকার পর দেশজুড়ে দুর্ভিক্ষ এ জেলাকে শ্মশানে পরিণত করে। জেলার কৃষির হালচাল নিয়ে ১৯৪৪-৪৫ সালে যে 'ইসাক সার্ভে রিপোর্ট' বের হয় তাতে দেখা যায়, এ জেলার অর্থকরী উৎপন্ন ফসলের মধ্যে ধান, গম, যব, ছোলা, মুগ, পাট, আখ এবং আলুর উল্লেখ রয়েছে। কোম্পানির আমলে আলুচাষ প্রবর্তনের কথা আমরা আগেই জেনেছি। অথচ এতদিন আলুচাষের কথা জানা যায় নি, এবার এই ফসলটির উল্লেখ পাওয়া গেল।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর জেলার কৃষিকর্মের মোড় ঘুরেছে। বর্তমানে সরকারী হিসেবমত জেলার শতকরা পঁচাত্তর ভাগ পরিবার কৃষির উপর নির্ভরশীল। এখন এ জেলার উৎপাদিত ফসলের মধ্যে প্রধান হল, আউস, আমন ও বোরোর মরশুমে উন্নতফলনশীল ধান। তারপর হল গম, যব, ছোলা, মটর, বিউলি, মুগ, মুসুর, অড়হর আর খেসারী। জোয়ার হয় বটে, কিন্তু তার উৎপাদন একেবারে নামমাত্র বললেই হয়। তৈলবীজের মধ্যে সরষে, তিল, সারগুজা ও মুসনে। তন্তুজাতীয় উৎপাদনের মধ্যে পাট, শন ও ধঞ্চে। মাদুর কাঠির জন্যে 'খাঞ্জি' নামের ঘাসজাতীয় এক কাঠির উৎপাদন ছিল একসময়ে পাঁশকুড়ো, সবং ও নারায়ণগড় থানা এলাকায়। বর্তমানে সবং থানা এলাকাতে কেন্দ্রীভূত এই কৃষিজ দ্রব্যটি জেলার অর্থনীতিকে কিছু পরিমাণ চাঙ্গা করেছে। এইসঙ্গে আছে পান, তামাক, হলুদ ও অন্যান্য শাকসব্জী। অর্থকরী ফসলের মধ্যে আখের চাষ ঘাটাল, চন্দ্রকোণা আর সবং থানা এলাকায় সীমাবদ্ধ হলেও, এটির চাষ ক্রমশঃ কমতে শুরু করেছে। কারণ সেচের নানাবিধ উন্নতির দরুণ আলুর চাষ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায়, চাষীরা আখচাষের বদলে ঐ অর্থকরী ফসলটির দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। তাই আখের ক্ষেত এখন ঐসব

এলাকায় দেখা যায় কালেভদ্রে। তুঁত চাষ উঠে গিয়ে পানচাষ এসেছিল, কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে পানচাষের বৃদ্ধি ঘটায় এখন বেচাকেনার সমস্যায় এ জেলার পানচাষীরা এক গভীর সংকটের মুখোমুখি হয়ে পড়েছেন। তদুপরি কোলাঘাটের 'থারমল পাওয়ার' ষ্টেশনের তিন চিমনির ধোঁয়ায় ভেসে আসা রাশি রাশি ছাই যে এ ফসলটির ফলনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চলেছে, সেই দুশ্চিন্তা আজ পূর্বাঞ্চলের সমগ্র পানচাষীদের। শুধু পানচাষী কেন, পাঁশকুড়ো এবং তমলুক থানা এলাকার ফুলচাষীরাও এই একই কারণে যে এ বিপদের ঘন্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন, তা কি অস্বীকার করা চলে?

৭. মেদিনীপুরের বিভীষিকা : বুনো মোষ

মেদিনীপুর জেলায় একদা যে নানাবিধ অত্যাচার সংঘটিত হয়েছে তার বহু দৃষ্টান্ত আজও খুঁজে পাওয়া যায়। কখনও দেশী বা কখনও ভিনদেশী মানুষ আর কখনও বা নানান জীবজন্তু মিলে এ জেলার অধিবাসীদের জীবন সময়ে সময়ে এমন অতিষ্ঠ করে তুলেছে যে সেসব বিবরণ আজ ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। অত্যাচারী মানুষের কথা তো ইতিপূর্বে অনেক লেখা হয়েছে বা আজও লেখা চ'লেছে, সে তুলনায় জীবজগতের কথা তেমন সাধারণের কাছে তুলে ধরা হয়নি। আজ থেকে প্রায় একশো-দেড়শো বছর আগে জলে কুমীর আর ডাঙ্গায় বাঘ দেশের মানুষের কাছে এক রীতিমত বিভীষিকায় পরিণত হয়েছিল—যা নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে এমন বহু কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে। সে সব লোকশ্রুতির অধিকাংশের মধ্যেই আছে কিভাবে অত্যাচারী জন্তুর হাত থেকে দেশের ভূস্বামীরা প্রজাদের রক্ষায় সচেষ্ট হয়ে মহানুভব হয়ে উঠেছেন। ফলে গ্রাম-গঞ্জের সাধারণ মানুষদের কাছে আসল অত্যাচারীর স্বরূপ এইভাবেই একদিন ঢাকা পড়ে গেছে।

এ জেলায় এক সময়ে বুনো জন্তুজানোয়ারের আক্রমণে ক্ষেতের ফসল রক্ষা করা বেশ দুরূহ হয়ে পড়েছিল। আজও যেমন জেলার উত্তরপশ্চিম সীমান্তে বুনো হাতীর দল ফসল পাকার সময় এসে তাণ্ডব নৃত্য করে খেয়েখুয়ে সব

লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায়, যা এক চরম সত্য ঘটনা। এছাড়া দেশী হনুমানের উপদ্রব তো আজও শেষ হয়নি। উঁচু উঁচু গাছপালা যে সব গ্রামে ঘন হয়ে আছে, সেখানে তো বহাল তবিয়তে আস্তানা নেয় এইসব রামভক্তের দল। তারপর দল বেঁধে গৃহস্থের ফসলে নিরুপদ্রব হামলা চালিয়ে তা শেষ করে দেওয়াই হল তাদের কাজ। এক সময়ে ইংরেজ আমলে এদের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে চাষী-প্রজারা সে সময়ে বিলেতী রাজার দরবারে আবেদন জানায় যথা-বিহিত প্রতিবিধানের জন্য। রামের অনুচর ব'লে হনুমান বধে ফসলের মালিকদের বেশ কিছু অনীহা। সেজন্য বিধর্মী ব্রিটিশ শাসক কৃষি বিভাগের নিজ নিজ এলাকায় একটি করে বন্দুকধারী হনুমান-মারা কর্মচারী নিযুক্ত করে-ছিলেন। অবশ্য বন্দুকের গুলিতে সে সব দুরাচার হনুমান শায়েস্তা হয়েছিল কিনা জানা যায় না। তবে ঝড়ে-বন্যায় এবং কাঠুরেদের কুঠারে বড় বড় বৃক্ষ সমূলে বিধ্বংস হওয়ার দরুন সেসব প্রাণীকুলের বংশবৃদ্ধিতে বোধ হয় ভাঁটা পড়েছে। তবুও স্থানে স্থানে পবননন্দনের দল যে এখনও সময়ে সময়ে তাদের অত্যাচার চালিয়ে চলেছে তেমন নজির যথেষ্ট আছে।

আঠার-উনিশ শতকে ক্ষেতের ফসল রক্ষা করা বেশ দুষ্কর হয়ে পড়েছে। কারণ কোথা থেকে বুনো মোষের দল এসে হামলা চালাচ্ছে বহু মেহনতে তৈরি ফলন্ত শস্যের উপর। সে সময়ে এ জেলার চেহারাটা বেশ ভয়াল ভয়ঙ্কর। ইংরেজ শাসকের আমলারা প্রতিবিধান চেয়ে রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন সদরে। **'The herds of wild buffaloes'** এসে ফসল নষ্ট করে দিচ্ছে প্রজাদের। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কাঁথি মহকুমার কিসমৎ পটাশপুর, দুধকোভাই ও পাহাড়পুর পরগণার অধিবাসীরা। এদিকে এ তিন পরগণায় বুনো মোষের উৎপীড়ন থামতে না থামতেই মহকুমার অন্য আর এক প্রান্তে পঙ্গপালের মত বুনো মোষ এসে ফসলের উপর যে আক্রমণ চালাচ্ছে, সে বিষয়ে ইংরেজ রাজপুরুষেরা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছেন। সেখানকার দোরো, ইডিঞ্চি ও ভুঁয়ামুঠ্যা পরগণায় সংঘটিত এইসব ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা তাঁরা নথিবদ্ধ রেখেছেন, যা এক অজানা ইতিহাসের কাহিনী।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জেলার কালেক্টর বেইলী সাহেব মহিষাদলে এইসব বুনো মোষের কাণ্ডকারখানা স্বচক্ষে দর্শন করেছিলেন। তাঁর লেখা **'Memoranda of Midnapore'** বইটিতে তিনি সে দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। মহিষাদল রাজার দেওয়ান রামনারায়ণ গিরি মহোদয় এইসব অবাঞ্ছিত মহিষ

নিধনে কিভাবে ব্যাপৃত ছিলেন তাই নিয়ে লিখেছেন, বুক পর্যন্ত কাদাজলে দেহ ডুবিয়ে দেওয়ান বাহাদুর হাতে বন্দুক নিয়ে এইসব বুনো মোষের পিছনে ধাওয়া করেছেন। এ লিখিত বিবরণ থেকে বেশ বোঝাই যায় সে সময়ে দেশে বুনো মোষের অত্যাচারে ফসল রক্ষা করা কেমন কষ্টকর হয়ে উঠেছিল।

যাইহোক, সাহেব শাসকরা এসব বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন বলেই সে সময়ের ইতিহাসের চিত্রটি যেমন সহজবোধ্য হয়, তেমনি মহিষাদল নামকরণের পক্ষেও এক যুক্তি খাড়া করা যায়। অতীতে বনজঙ্গলে অধ্যুষিত নদীতীরবর্তী এই এলাকায় বুনো মোষের সহজ বিচরণ ক্ষেত্রে ছিল, এই নিশানদিহি মতে পরগণার নামই হয়ে পড়েছিল মহিষের দঙ্গলের জন্য মহিষদল থেকে বর্তমানে মহিষাদল। আদতে মহিষাদল পরগণার রাজবাড়ি যেখানে অবস্থিত সে মৌজার নাম কিন্তু গড়কমলপুর; মহিষাদল নামে কোন গ্রাম নেই। অবশ্য গূঢ় তাত্ত্বিকেরা যে এহেন নামকরণের সিদ্ধান্তে নাসিকাকুঞ্চনে বিরত হবেন না, তা আমার জানা আছে।

সত্যি বলতে কি, সে সময়ে বুনো মোষের অত্যাচারের জন্য ব্রিটিশ সাহেবরা বেশ ভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। কখন কিভাবে যে বুনো মোষের অত্যাচার শুরু হয় তা সাহেবরা ঠিক বুঝতে পারছিলেন না বটে, তবে প্রতিকারের জন্য চেষ্টার অন্ত ছিল না। এই যেমন, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, মেদিনীপুরের নিমকমহল এলাকায় সীমানা চিহ্নিত করার যে 'পিলার' বা থাম বসাবার পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার মধ্যেও দেখা যাচ্ছে এইসব বুনো মোষের অত্যাচারে ঐ পিলার যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের ব্যবস্থা। তখন এই জেলায় দেশীপ্রথায় নুন তৈরীর বড়ো কেন্দ্র ছিল কাঁথি, হিজলী, তমলুক ও মহিষাদল। বিদেশী শাসকরা এইসব লবণ শিল্পগুলিকে অবশেষে নিজেদের আয়ত্তে এনে হিজলী ও তমলুকে নিজেদের 'সল্ট এজেন্ট' বসিয়েছিলেন। নুন তৈরীর জন্য জ্বালানী কাঠ যেসব জঙ্গল থেকে সরবরাহ হত তার নাম ছিল জালপাই জঙ্গল। একসময়ে চাষযোগ্য জমির মালিকদের সঙ্গে লবণ এজেন্সীর অধিকৃত এইসব জালপাই জমির সীমানা নিয়ে বিরোধ বেধে গেল। সরকার সেজন্য ইটের বাঁধ দিয়ে আধ মাইল অন্তর একটি করে ইটের পিলার বসানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। পরিকল্পনামত ব্যয় সংকোচের জন্য 'পিলার' হবে তিনকোনা যার অর্ধেকটা উপরে আর অর্ধেকটা থাকবে মাটির ভেতর। কিন্তু জেলার কালেক্টর বাহাদুর বুনো মোষের কেরামতির কথা ভেবে পিলারের

চেহারা বদল করার প্রস্তাব দিয়ে লিখলেন, এই ধরনের তিনকোনা পিলার বসালে বুনো মোষ বা অন্যান্য জন্তু জানোয়াররা তা ঢুঁ মেরে বা গা ঘঁসে ঘঁসে সেগুলোকে কমজোরি করে দিতে পারে, সেজন্য প্রয়োজন তিনকোনার বদলে চৌকো পিলার।

অতএব দেখা যাচ্ছে, এ জেলায় যে অংশটি সাধারণত পলি দিয়ে গঠিত সেখানে এইসব অবাঞ্ছিত বুনো মোষের অত্যাচারে গ্রামবাসীদের ফসল ক্রমাগত বিনষ্ট হয়ে চলেছে। এছাড়া অন্য অংশে, অর্থাৎ জঙ্গলমহল এলাকার কথা না বলাই ভাল। সেখানে যে বুনো মোষের উপযুক্ত বাসস্থান, তা নিয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। সুতরাং সাধারণ গ্রামবাসী ছাড়াও বিদেশী শাসকদেরও যে সেসময় এই বুনো মোষের অত্যাচার বেশ চিন্তায় ফেলেছিল তা উপরের দৃষ্টান্ত থেকে জানা যাচ্ছে। প্রায় দেড়শো বছর আগে, মেদিনীপুর জেলায় বর্গী অত্যাচারের মতই এইসব বুনো মোষ গ্রামবাসীদের জীবন যে কিভাবে উত্যক্ত করে তুলেছিল, তা আজ এই জেলায় ঘুরে বেড়াবার সময় বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না।

৮. পাকুরিয়ার ঝর্ণাধারা

গঙ্গা-ভাগীরথীর জলধারা বয়ে আসছে ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত থেকে বরফগলা জল নিয়ে। কিন্তু পশ্চিমবাংলার আশপাশে মালভূমি থেকে উৎপন্ন এমন ছোটখাট নদনদীগুলির উৎপত্তিস্থলে তো কোন বরফগলা বারমাসের জল নেই। এ-রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমের এসব নদনদীর উৎসমুখে যাও বা দু-একটি প্রস্রবণ আছে তার জলধারা আবার তেমন প্রবল নয়।

তাহলে কীভাবে এসব নদনদীর জল সামান্য হলেও ওপর থেকে বারমাস বয়ে আসছে, এ ঔৎসুক্য আমাদের বহুদিনের। যদিও এসব জলধারার উৎস সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ঢেউ খেলান কাঁকুরে মাটির উপর দিয়ে যেখানে এঁকে বেঁকে বয়ে এসেছে এসব নদনদী, সেসব জায়গায় সরেজমিনে অনুসন্ধান চালালে এমন বহু অন্তঃসলিলের সন্ধান যে পাওয়া যেতে

পারে তা বলাই বাহুল্য। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এইসব অন্তঃসলিলের ধারা চুইয়ে এসে শেষ পর্যন্ত নদনদীর জলধারা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও এই ভূগর্ভস্থ জলধারা বাইরে প্রকাশমান হয়ে শেষ পর্যন্ত ঝর্ণার রূপ নিয়েছে এবং সেই ঝর্ণাধারার জলরাশি পুনরায় মাটিতে মিশে পাতালে প্রবাহিত হয়ে অলক্ষ্যে কাছাকাছি কোন নদনদীর জলপুষ্টি বিধান করেছে। সুতরাং এ-রাজ্যে চোখের সামনে তেমন বেশ কিছু ঝর্ণাধারার উদাহরণও যে নেই এমন নয়। তবে আগ্রহীদের এমন একটি স্বাদুজলের প্রস্রবণের সন্ধান দিতে পারা যায়, যা প্রত্যক্ষ করতে হলে বহুদিন ধরে বহু অর্থব্যয় করে দেখতে যেতে হবে না।

আমাদের আলোচিত এ ঝর্ণাধারটি হল পারুলিয়া গ্রামে, যা মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা থানার এলাকাধীন (জে এল নং ৩৮)। এখানে যেতে হলে, দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের পাঁশকুড়া স্টেশন থেকে রামজীবনপুরের বাসে ঘাটাল হয়ে শ্রীনগরে নামতে হবে। তারপর এখান থেকে উত্তর-পশ্চিমে হাঁটাপথে প্রায় ৮ কিলোমিটার রাস্তা। পদযুগলেক সম্বল করা ছাড়া গরুর গাড়িও নেওয়া যেতে পারে। তবে একটি কথা। গ্রাম থেকে যেসব গোযান শ্রীনগরে মালপত্র নিয়ে আসে, সেগুলি যখন ফিরতিমুখো হয় ঠিক সে সময়েই যদি ধরতে পারা যায় তাহলেই পরিশ্রম অনেক লাঘব হতে পারে। অবশ্য এ সুযোগ লাভ করতে না পারলেও কোন ক্ষতি নেই। শহরে দমবন্ধ পরিবেশের খাঁচা ছেড়ে মুক্ত আকাশের নিচে পা চালিয়ে পরম তৃপ্তিভরে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে কখন যে সেখানে পৌঁছে যাবেন তা টের পাবেন না। চলার পথে দু-পাশে গ্রামগ্রামান্তরের গাছগাছালি ও পুকুরডোবার মধ্যে পল্লীর স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের উপলব্ধিটুকুও এক উপরি লাভ বলে গণ্য হতে পারে।

সুতরাং শ্রীনগরের মোড়ে বাস থেকে নেমে খালের বাঁধ ধরে মিনিট পাঁচেক হাঁটার প্রথম খালের পুলটি পার হয়ে বাঁহাতি পিচের রাস্তা ধরে এগুতে হবে। অতঃপর গ্রামও যখন শেষ হবে, তখন পিচের রাস্তাও ফুরিয়ে শুরু হবে ধুলোর রাস্তা—যা উঁচুনিচু হয়ে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের মধ্যে মিশে গেছে।

এ রাস্তা ধরে হাঁটতে কিন্তু মন্দ লাগে না। এতক্ষণ যেন উপর থেকে ঢালু রাস্তায় নিচে চলে আসা হয়েছিল, এবার সেখানে উৎরাইয়ের পালা। ডানদিকের গ্রামটির নাম লক্ষ্মীপুর। সে গ্রামের গাছপালার ভেতর দিয়ে কাদের যেন একটা মন্দিরের চূড়া উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। খানিকটা চলার পর আবার রাস্তা যেন ঢালুতে

নেমে গেছে। এবার আঁকাবাঁকা রাস্তায় যে গ্রামটি পাওয়া গেল সেটির নাম ইন্দ্রা। মুসলমানপ্রধান গ্রাম হলেও এ গ্রামে মৈত্রী ও সংহতির একটি নিদর্শন দেখে চমৎকৃত হতে হয়। গ্রামটির শুরুতেই একটি বেশ বড় আকারের ইদ্‌গা আর তার লাগোয়া একটি পরিত্যক্ত মন্দির।

ইন্দ্রা গ্রাম ছাড়িয়ে আবার সামান্য চড়াই-উৎরাই রাস্তা পেরিয়ে যখন সমতল-ভূমির উপর দিয়ে হেঁটে চলবেন, তখনই বাঁ-দিকে রাস্তার গায়ে নজরে পড়বে ইঁটের এক উঁচু চিমনি। একদা বিলেতী মেসার্স ওয়াটসন কোম্পানির পরি-চালনাধীন নীলকুঠির সেই স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে এই স্তম্ভটি তারই পরিচয় বহন করে চলেছে। যদিও গ্রামবাসীদের ইঁটের প্রয়োজনে সে নীলকুঠির চৌবাচ্চার ইঁট আজ প্রায় অন্তর্হিত, তবে চিমনিটির ইঁট খুলে নিয়ে যাওয়ার পালা কবে যে পড়বে তারই প্রতীক্ষায় হয়ত দিন গুনছে এই নির্বাক স্তম্ভটি।

এবার সামনে ঢালুতে নেমে পড়লে একটি 'কজ্ ওয়ে'। সেটি পেরিয়েই কৃষ্ণপুর গ্রাম। বেশ বড় একটি গ্রাম। এটি ছাড়িয়ে আরও এক কিলোমিটার দূরত্বে আবার এক বিরাট আকারের জলনালী। এখন সেটি শুকনো বটে, কিন্তু বর্ষায় উঁচু জায়গার ঢলনামা জল এখান দিয়েই যখন প্রবাহিত হয়, তখন সেটি যে এক ভীষণ রূপ নেয়, তা সহজেই বোঝা যায়।

এ নালাটি পেরিয়ে আবার দু-পাশে সমতল ধানক্ষেত। ডানদিকে বেশ অনেকটা অংশ জুড়ে এক সুউচ্চ টিলা। লালরঙের মাটি ঢাকা সে টিপিটি এখন ধূ-ধূ করছে। শোনা গেল, এক সময়ে এখানে নাকি এক বিরাট জঙ্গল ছিল। জ্বালানির প্রয়োজনে সে জঙ্গল ক্রমে ক্রমে লোপাট।

ক্রমশঃ এ টিলা ছাড়িয়ে যখন আবার ঢালুতে নামতে শুরু করলেন, তখনই পৌঁছে গেলেন আমাদের ঝর্ণাধারার গ্রাম পাঞ্চলিয়ায়। এ গ্রামের ভেতর এক গাছতলায় বেশ বড় আকারের হাতিঘোড়া যেখানে রাখা আছে সেটাই হল এ গ্রামের শীতলার থান। পাশেই ঝামাপাথর দিয়ে তৈরি এক ভগ্ন শিবমন্দির। এখান থেকে পূবে কয়েক পা এগিয়ে গেলেই বাঁশবনের ভেতর পাওয়া যাবে গ্রামের প্রস্রবণটি, যা একান্তই মুগ্ধ হয়ে দেখার মত।

প্রায় চার মিটার বর্গাকার এবং আন্দাজ এক মিটার গভীর এক ঝামা-পাথরের চৌবাচ্চার উত্তর গা বেয়ে ঝলকে ঝলকে স্বচ্ছ জল বেরিয়ে আসছে। আর সে জল এতই নির্মল যে, বাঁশবনের ছায়া ঢাকা সত্ত্বেও সে জলে মানুষের প্রতিবিম্ব স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। চৌবাচ্চায় অবশ্য জল জমে থাকছে না,

একটা সরু নালা দিয়ে সে জলধারা এঁকেবেঁকে দূরে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। গ্রামের বধূরা জল আনতে এখানেই আসে। জলের কলসী চৌবাচ্চার জলে ডুবতে না চাইলেও আঁচলা দিয়ে জল ভরতে হয়। অন্যদিকে এই সামান্য গভীর জলে অনেকে স্নান করতেও আসেন। নাই হক অবগাহন স্নান, গামছা করে জল তুলে মাথায় দিয়ে এই স্নানের মধ্যেও যেন পরম পরিতৃপ্তি লাভ করা যায়। তাছাড়া গরমের সময় এই জল শীতল এবং শীতে উষ্ণ, তাই এ জলে স্নানের আনন্দ ত' রয়েছেই। এরই মধ্যে দেখা গেল এঁটোকাটা বাসন নিয়ে এক বউড়ীও এসেছেন সেগুলি ধুয়ে মাজবার জন্যে। এ চৌবাচ্চাটির জল যেখান দিয়ে সরু নালায় চলে যাচ্ছে, সেখানে বসেই বধূটি থালাবাসন মেজে নিয়ে চলে গেলেন।

এদিকে কতক্ষণ আর ঝর্ণার দৃশ্য এইভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। আমরাও নেমে পড়লাম। ঝর্ণার আধ হাঁটু চৌবাচ্চার জলে হাত পা ভালভাবে ধুয়ে নিয়ে আঁচলাভরে জল খেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তবে এ জল যে বেশ হজমি জল, সেটি তখন বুঝতে না পারলেও সামান্য পরে টের পেয়েছি, যখন খিদে সঙ্গে সঙ্গে তাড়না দিতে শুরু করেছে।

পারুলিয়া গ্রামের ঝর্ণা দেখতে এসেছি দেখে দু-একজন আগ্রহী গ্রামবাসীরও আবির্ভাব ঘটল। স্থানীয় বয়স্ক গ্রামবাসী শ্রীঅনুকূল ঘোষ জানালেন যে, তিনি তাঁর বাল্যকাল থেকেই এই ঝর্ণাটি দেখে আসছেন এবং সরকারি কর্তাব্যক্তিরা যে এই ঝর্ণাটি দেখেন নি এমন নয়। এক সময়ে স্থানীয় বি. ডি. ও. মহোদয় এ প্রস্রবণটির দু-পাশ ইঁট দিয়ে বাঁধিয়ে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু ইঁট বাঁধানর সময় ঝর্ণার জল অবরুদ্ধ হয়ে যেতে পারে এই ধারণায় তাঁরা তাঁদের প্রস্তাবে সায় দেন নি। এখন এ গ্রামে এ ঝর্ণাটিই তাঁদের প্রাণপুরুষ।

এখানের বাড়তি জল কোথায় গিয়ে মজুত হচ্ছে, সেটা জানতে আমরা বেশ অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠলাম। দেশের খরা মোকাবিলার জন্যে সরকারের চোখে ঘুম নেই, কিন্তু জলের এমন অপচয়ের দৃষ্টান্ত দেখে অবাক হতে হয়। ঝর্ণার জল জমা হচ্ছে সামনের এক ডোবায়। তারপর তা মাটির তলায় চুইয়ে চলেছে সামনের কেঠে নামের এক নদীতে, যার জলধারা মিশেছে শিলাবতীতে। সুতরাং এসব শুকনো নদীতে জল সামান্য হলেও, সে জলের যোগান কীভাবে ছোটবড় ঝর্ণা দিয়ে চলেছে, তা চাক্ষুষ অবহিত হওয়া গেল।

যাই হোক পারুলিয়ার ঝর্ণাধারার এ জল নষ্ট না করে চাষের কাজে লাগালে

তো বহু উদ্বৃত্ত ফসল পাওয়া যেতে পারে? আমার এ প্রশ্নে, এখানকার স্থানীয় জনসাধারণের বক্তব্য : 'আজ্ঞে, পারুলিয়ার মাটির তলায় অনেক জল জমা রয়েছে। দেখুন না, এখানে তো 'আর্টো-ফ্লো'র জল সমানে ঝরণার মত ঝরে পড়ছে। সুতরাং যে যেমন চাষ করবে, জলও ইচ্ছে করলে সেইভাবে অনায়াসেই সংগ্রহ করে নিতে পারবে।' সত্যিই তাই, পারুলিয়ার কিছুদূরে দক্ষিণপাড়ায় মাটির ভেতর বসানো ইংরেজি 'এল' আকারে এমনি এক লোহার পাইপ থেকে জল সমানেই পড়ে চলেছে! এ দৃশ্য দেখে মহাভারতে ভীষ্মের জলপানের কথা মনে পড়লো। অর্জুন তাঁর গাণ্ডীব দিয়ে ঐ মাটির বুকে তীরের ফলা বিঁধে দিতেই জল ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এসে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের মুখে পড়ে তার পিপাসা নিবারণ করেছিল। পারুলিয়ায় এসে মহাভারত কাহিনীর সেই ঘটনাটির সম্ভাব্যতা সেদিন স্বচক্ষে দর্শন করে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

৯. যেসব ঝর্ণাধারার মাহাত্ম্য নিয়ে মন্দির

পারুলিয়ার ঝর্ণাধারার মত এ জেলায় ছোটবড় আরও কত যে প্রস্রবণ আছে তার ইয়ত্তা নেই। তবে সেগুলির খোঁজও আমরা তেমন রাখিনা বলে তার কোন নির্দিষ্ট তালিকাও নেই। অন্যদিকে মাটির তলায় জলের সন্ধান নিয়ে এ জেলায় অদ্যাবধি তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য অনুসন্ধান হয়নি বললেই হয় এবং হ'লেও তা আমাদের গোচরে আসেনি। অথচ 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড ওয়াটার রিসোর্স' নিয়ে এদেশে সরকারী ভূতাত্ত্বিকদের 'সেমিনার' অনুষ্ঠানের ও 'পেপার' পাঠেরও কমতি নেই। কিন্তু ঘরের আনাচে-কানাচে ভূপ্রকৃতির এই সৃষ্টিরহস্য যে কিভাবে তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় তা বোঝা মুশকিল। এ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতার কথাই বলা যাক। অতীতে দেখা যাচ্ছে, এমন সব ভূগর্ভস্থ জলধারার সন্ধান পেয়ে স্থানীয় ধর্মিষ্ঠ ব্যক্তিগণ একদা সেটিকে দেবমাহাত্ম্য আরোপ করে সেখানে মন্দির-দেবালয় নির্মাণ করে দিয়েছেন। বাংলার বাইরে এই ধরনের এক বিখ্যাত শৈবতীর্থ হল মধ্যপ্রদেশের বিখ্যাত অমরকন্টকের পাতালেশ্বর মহাদেব মন্দির। এখানের এই মন্দিরটির অভ্যন্তরে বিগ্রহ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন বেশ গভীর

চারকোণা এক কুণ্ডের মধ্যে যা বৎসরের অন্যান্য সময় শুষ্ক থাকলেও, শ্রাবণ মাসের কোন কোন দিনে তা জলপূর্ণ হয়ে বিগ্রহটিকে নিমজ্জিত করে দেয়। কাছাকাছি নর্মদার সঙ্গে মাটির তলায় জলপ্রবাহের সংযোগের দরুণ যে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা বৈজ্ঞানিক সত্য হলেও, এখানকার অন্তঃসলিলের পিছনে ধর্মীয় মাহাত্ম্য আরোপিতহয়ে গোটা অমরকন্টককেই এক মরমিয়া পরিবেশে পরিণত করে তুলেছে।

পশ্চিমবাংলায় এই ধরনের প্রস্রবণকে কেন্দ্র করে স্থাপিত বেশ কিছু মঠ-মন্দির নিয়ে যে তীর্থস্থানটি বিখ্যাত হয়ে উঠেছে, তা হল বক্রেশ্বর। অবশ্য বক্রেশ্বরের খ্যাতি ও আকর্ষণ তার উষ্ণ প্রস্রবণের জন্য, যার উদাহরণ একান্তই বিরল।

অমরকটক বা বক্রেশ্বরের মত খ্যাতিসম্পন্ন না হলেও, মেদিনীপুর জেলাতেও এমন সব প্রস্রবণের মাহাত্ম্য সম্বল করে একসময়ে যে সব মন্দির-দেবালয় নির্মিত হয়েছিল, তেমন নিদর্শনেরও অভাব নেই। এ বিষয়ে ভ্রমণরসিকদের কাছে এ জেলার এমন দুই ঝর্ণামাহাত্ম্যযুক্ত মন্দিরের সন্ধান দিতে পারা যায়।

প্রথমটি হল কেদার-পাবকেশ্বর। দীঘা যাবার পথে খড়্গপুর পেরিয়ে বেলদা; তারপরেই হ'ল 'খাকুড়দা' স্টপেজ। এখানে নেমে দক্ষিণ-পশ্চিমে হাঁটাপথে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরত্বে মেদিনীপুর জেলার দাঁতন থানার এলাকাধীন কেদার গ্রাম। হাঁটার অসুবিধে থাকলে, রিক্শাও পেতে পারেন। সুতরাং গ্রাম্য মেঠো পথ পেরিয়ে অবশেষে এসে পৌঁছোবেন এ গ্রামের কেদার-পাবকেশ্বর শিবের মন্দির প্রাঙ্গণে। আগেই বলে নেওয়া ভাল যে, মন্দিরটি পশ্চিমমুখী; আলোকচিত্রীরা সকালের দিকে গেলে নিরাশ হতে পারেন বলেই আগেভাগে বিষয়টি জানিয়ে রাখা ভাল। অন্যদিকে, এ শিবালয়টি বেশ কৌতুকাবহ। খাঁটি ওড়িশাশৈলীর রেখ-দেউলের অনুকরণে নির্মিত মূল মন্দিরটি, ওড়িশা মন্দিরের আদর্শ অনুযায়ী এক ক্ষুদ্র জগমোহন এ মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত এবং সেইসঙ্গে প্রবেশপথের উপরে রয়েছে কালো পাথরে খোদাই প্রায় সাড়ে চার ফুট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট এক সুন্দর নবগ্রহ ফলক। ওড়িশা মন্দিরের মতই মূল মন্দিরের তিনদিকের দেওয়ালে রয়েছে পাথরের লম্ফমান সিংহের মূর্তিভাস্কর্য। মন্দিরটি ঝামাপাথরের এবং মন্দিরের ছাদ নির্মাণ করা হয়েছে ভারতের প্রাচীন স্থাপত্য অনুসারী ধাপযুক্ত লহরা পদ্ধতিতে। কোন প্রতিষ্ঠাফলক অবশ্য এ মন্দিরে নেই, তবে স্থাপত্যবিচারে এটি খ্রীষ্টীয় সতের শতকে নির্মিত বলেই মনে হয়। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে সাড়ে তের ফুট, জগমোহনটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে সাড়ে ন' ফুট এবং উচ্চতায় মূল মন্দিরটি আনুমানিক চল্লিশ ফুট।

মন্দিরের বহিরঙ্গসজ্জার পর মন্দিরের গর্ভগৃহে যাওয়া যাক। গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ হল শুধুমাত্র গৌরীপট, যাতে কোন লিঙ্গ নেই। গৌরীপট্টের মধ্যস্থলে যে গর্তটি আছে সেখান দিয়ে আমাবস্যা ও পূর্ণিমায় জল বেরিয়ে আসতে থাকে। স্থানীয় গ্রামবাসীদের ধারণা, গৌরীপট্টের জল যখন শুকিয়ে যায় তখন শিব কৈলাসে চলে যান, তাই শক্তির পঞ্চামৃত থাকে না।

বিগ্রহ দর্শন করে বাইরে আসার পর মন্দিরের উত্তরে লাগোয়া এক পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে দেখা যাবে ঝামাপাথরে তৈরি চারদিক খোলা একটি চাঁদনী মন্দির, অর্থাৎ জলকুণ্ডের উপরিস্থিত পাথরের এক ছাউনী। সাধারণ লোকে এটিকে বলে থাকে 'জলঘরি'। এই 'জলঘরি'টিই হল এখানকার এক প্রস্রবণ। সেখান দিয়ে জল বুদবুদ হয়ে বেরিয়ে পুকুরের জলে মিশে যাচ্ছে এবং পুকুরের বাড়তি জল অবশেষে বেরিয়ে চলেছে পাশ দিয়ে প্রবাহিত বাঘুই খালে, যা নাকি কেলেঘাই নদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

চড়ক ও শিবচতুর্দ্দশীতে জাঁকজমক করে এখানে পূজোআচ্চা হয় এবং সেই উপলক্ষে মেলাও বসে থাকে। তবে উল্লেখযোগ্য হল, পৌষ সংক্রান্তিতে মৃতবৎসা ও অপুত্রক নারীরা সন্তানলাভের আশায় এই কুণ্ডে স্নান করতে আসেন।

এ মন্দির নিয়ে স্থানীয় আর এক কিংবদন্তী হল, খড়ুইগড়ের রাজা কালীপ্রসন্ন এক সময়ে গভীর জঙ্গলাবৃত এই স্থানে আলোচ্য প্রস্রবণটির সন্ধান পান এবং স্থানীয়ভাবে দেবতার মাহাত্ম্যের জন্য তিনি শুধু মন্দিরটিই নির্মাণ করে দেননি, সেই সঙ্গে দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত অমৃতলাল গিরি মোহান্তকে উপযুক্ত জমিজিরেৎসহ এর সেবাইতও নিযুক্ত করেন। সুতরাং এই প্রস্রবণকে কেন্দ্র করে কিভাবে এখানে মন্দির-দেবালয়ের পত্তন হল, তার জীবন্ত এক ইতিহাস হল এই কেদার গ্রাম।

শুধুমাত্র এই কেদার গ্রামই নয়, আরও এক কেদার গ্রাম আছে এ জেলায়, যেখানে এমনি এক ভূগর্ভস্থ জলধারাকে কেন্দ্র করে অনুরূপ আরও এক মন্দির-দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ গ্রামটি অবশ্য ডেবরা থানার এলাকাধীন। দক্ষিণপূর্ব রেলপথের বালীচক স্টেশন থেকে ময়না, দেহাটি বা সবংয়ের বাসে চেপে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত এ গ্রামে আসা যায়। এখানের ঝর্ণাধারা ও তার সংলগ্ন মন্দির প্রতিষ্ঠা নিয়ে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাও বেশ চিত্তাকর্ষক। জনশ্রুতি যে, মুসলমান অত্যাচারে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে

বীরসিংহ নামে এক রাজপুতপ্রধান যখন এখান দিয়ে পথ অতিক্রম করে চলে-ছিলেন তখন তিনি এখানকার এই প্রস্রবণটির সন্ধান পেয়ে সেখানে কেদারেশ্বর মতান্তরে, চপলেশ্বর শিবের মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন এবং সেই সঙ্গে প্রস্রবণটির উপরে পীঢ়া দেউলের ধরনে পাথর দিয়ে এক আচ্ছাদনও করে দেন।

কিংবদন্তী যাই হোক, কেদারেশ্বরের বর্তমান মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছাবার আগে পশ্চিমমুখী এক বিরাট তোরণদ্বার ও নওবতখানা অতিক্রম করতে হয়। যদিও সংস্কারের অভাবে সে তোরণদ্বারটি বর্তমানে ভগ্নাবস্থায় পতিত, তাহলেও পরবর্তী সময়ে যে এ তোরণদ্বারের দুপাশে দ্বারপাল হিসাবে দুটি পোড়ামাটির সাহেবমূর্তি নিবদ্ধ হয়েছিল, তার অবশেষ এখনও লক্ষ করা যায়। মন্দিরের তোরণদ্বারে সাহেব দ্বারীমূর্তি অভিনব মনে হলেও, এ জেলার বহুস্থানে এই ভাস্কর্যরীতিটি যে অনুসৃত হয়েছে, তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল ঘাটালের সিংহবাহিনী মন্দির চত্বরের প্রবেশ-ফটক।

এখানকার এই তোরণ পেরিয়েই মন্দির। এ মন্দিরটিও পশ্চিমমুখী, ঝামা-পাথর দিয়ে নির্মিত এবং ওড়িশা মন্দির শৈলীর মতই এখানে মূল মন্দির শিখর, তার সংলগ্ন পীঢ়ারীতির জগমোহন ও নাটমন্দির। এখানের এই মন্দিরগুলির ছাদ প্রচীন স্থাপত্যরীতির লহরাযুক্ত ধাপ পদ্ধতি করে নির্মিত। এ মন্দিরেও কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই তবে আকারপ্রকারে এটি যে খ্রীষ্টীয় ষোল শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রাচীন এই মন্দিরটির পুবগা সংলগ্ন এক জলাশয়ের পশ্চিমপাড় থেকে প্রস্রবণের জল 'ভুড়ভুড়' শব্দে বের হয় বলে, লোকে এটাকে বলে থাকে 'ভুড়ভুড়ি কেদার' বা 'কেদার ভুড়ভুড়ি'। পৌষ সংক্রান্তিতে এই প্রস্রবণের বাঁধানো কুণ্ডে মৃতবৎসা ও বন্ধ্যানারীরা স্নান করলে পুত্রবতী হন। পুরানো দিনের চিন্তাভাবনা ও ধর্মবিশ্বাস আজও টিকে রয়েছে বলেই, পৌষসংক্রান্তিতে এখানে এখনও বহু নরনারীর সমাগম হয় এবং মাসাধিক কাল ধরে বিরাট এক মেলাও এই সময়ে বসে থাকে।

সুতরাং আলোচ্য 'কেদার পাবকেশ্বর' ও 'কেদার ভুড়ভুড়ি' —এই দুই মন্দিরই যে এমন এক ভূগর্ভস্থ প্রস্রবণকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গতঃ এ দুটি উদাহরণ ছাড়া, সমগোত্রীয় আরও একটি ঝর্ণাধারাযুক্ত মন্দিরের কথা উল্লেখ করতে পারা যায়। মন্দিরটি পিঙ্গলা থানার গোবর্ধনপুর গ্রামে অবস্থিত। রত্নেশ্বর শিবের পঞ্চরত্ন রীতির এ দেবালয়ের

গর্ভগৃহে শিবের কুণ্ডের সঙ্গে কোন অন্তঃসলিলের যোগ ছিল, যার ফলে কোন কোন উল্লেখযোগ্য তিথিতে শিবের গভীর কুণ্ডটি জলপূর্ণ হয়ে উঠতো। কিন্তু দুঃখের কথা, বেশ কয়েক বৎসর আগে ভূগর্ভে পেট্রোলের খোঁজে, সরকারীভাবে যেদিন কাছাকাছি এলাকায় মাটীর তলায় 'ডিনামাইট' ফাটানো হয়, সেদিন থেকেই ভূগর্ভের জলধারা হয় শুষ্ক হয়েছে, না হয় তার পথ হারিয়ে বসেছে। ফলে স্থানীয় নলকূপও যেমন শুকিয়ে গেছে, তেমনি এখানের কুণ্ডও আর জলসিক্ত হয় না। তাই আজ এখানের মন্দিরটির সঙ্গে ভূগর্ভে গোপন প্রস্রবণের যোগাযোগের কাহিনী এক স্মৃতি মাত্র।

এখন ঝর্ণাধার মাহাত্ম্য নিয়ে যেসব মন্দির দেবালয় একদা গড়ে উঠেছিল তার উদাহরণ দেওয়া হল। ধর্মীয় ব্যাপার জড়িত বলে এখানের জলের গুণাগুণ কেউ কিন্তু অদ্যাবধি বিচার করে দেখেননি। মাটির তলায় জলের হদিশ পেতে যাঁরা আগ্রহী, তাঁরা যদি এসব স্থানগুলিতে যথাযথ অনুসন্ধান চালিয়ে একটী বিজ্ঞানসম্মত প্রতিবেদন প্রকাশ করেন, তাহলে দেশবাসী যে একান্তই কৃতজ্ঞ থাকবেন, তা বলাই বাহুল্য। আর তুচ্ছ ব্যাপার বলে যারা নাসিকাকুঞ্চন করে বিষয়টিতে আমল দিতে চাইবেন না তাঁদের ছাড়া, অন্যান্য পাঁচজন সাধারণ মানুষ যে এই প্রস্রবণের মাহাত্ম্যজড়িত জেলার প্রাচীন স্থাপত্য দেখে একান্তই মুগ্ধ হবেন, একথাও জোরের সঙ্গে বলা যায়।

১০. পথের সন্ধানে

একদা মানুষ তার জীবনধারণের প্রয়োজনে, বন কেটে, পাহাড় ভেঙ্গে, নদীনালা ডিঙ্গিয়ে যেসব পথের সৃষ্টি করেছিল, সেসব পথ বেয়েই এসেছে কত পাত্রমিত্র, শ্রেষ্ঠী আর শত্রুর দল। এসব পথ ধরেই কেউ করেছে নগরযাত্রা, কেউ তীর্থযাত্রা, কেউ বাণিজ্যযাত্রা আর কেউ বা এসেছে ক্ষমতা দখলের জন্য। কিন্তু সব পথই শেষ অবধি তার অস্তিত্ব ঠিক বজায় রাখতে পারেনি। কিন্তু তা হলেও সেসব বিলুপ্ত ও পরিবর্তিত প্রাচীন পথ মানুষের স্মৃতির ও সংস্কারের মধ্যে আজও যে বেঁচে থাকে তার দৃষ্টান্ত এ জেলায় কিন্তু দুর্লভ নয়।

এ জেলার প্রাচীন পথঘাটের কোন প্রসঙ্গ উঠলেই সেকালের তাম্রলিপ্ত বন্দরের প্রসঙ্গ এসে যায়। অতীতের তাম্রলিপ্ত যে একদা সামুদ্রিক বন্দর হিসাবে গুরুত্ব-পূর্ণ হয়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও ভ্রমণকারীর বিবরণে উল্লিখিত হয়েছে। এ বিষয়ে অধিকাংশ প্রত্নতাত্ত্বিকদের দৃঢ় অনুমান যে, সেকালের তাম্র-লিপ্তের অবস্থান ছিল এই হাল আমলের তমলুকের আশপাশে। প্রখ্যাত প্রত্ন-তাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বেশ জোরের সঙ্গেই লিখেছেন যে, প্রত্নতত্ত্বীয় ও অপরাপর তথ্যাদির উপর নির্ভর করে স্বভাবতই নিঃসন্দেহ হওয়া যায় তাম্রলিপ্ত বা তাম্রলিপ্তি নগরীর শেষ চিহ্ন সমাধিস্থ আছে মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত তমলুকে যার পার্শ্বে প্রবাহিত রূপনারায়ণের নয়নাভিরাম স্রোতধারা।

সুতরাং এ অনুমান যদি যথার্থ হয়, তাহলে বুঝতে হবে বেশ প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার বাইরের অন্যান্য জনপদের সঙ্গে জলপথ ছাড়াও স্থলপথে তমলুকের যোগাযোগ ছিল। এ বিষয়ে আলোকপাত করেছে সিংহলের সুপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ 'মহাবংস', যা থেকে আমরা জানতে পারি খ্রীষ্টপূর্ব তিন শতকে মৌর্যসম্রাট অশোক স্বয়ং তাম্রলিপ্ত বন্দরে উপস্থিত থেকে মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রাকে বোধিবৃক্ষের চারা নিয়ে সিংহল যাত্রায় বিদায় সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সেকালের পাটলিপুত্রের সঙ্গে তাম্রলিপ্ত বন্দরের স্থলপথে যোগাযোগের এক সূত্র পাওয়া যাচ্ছে। উত্তর ভারতের সঙ্গে তাম্রলিপ্তের যোগাযোগ-পথের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন বৌদ্ধ সাহিত্যে যেসব প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে তা থেকে জানা যায়, তাম্রলিপ্ত থেকে বারাণসী এবং কজঙ্গলের (রাজমহল) মধ্য দিয়ে চম্পা পর্যন্ত সড়ক যোগাযোগ ছিল। পরবর্তী চতুর্থ শতকে গুপ্ত রাজাদের আমলে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে হাঁটাপথে পাটলিপুত্র থেকে তাম্রলিপ্ত পৌঁছেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। পরে সপ্তম শতকে আর এক চীনা ভ্রমণকারী হিউয়েন সাঙ্‌ পদব্রজে সমতট (চট্টগ্রাম অঞ্চল) থেকে তাম্রলিপ্ত এবং সেখান থেকে কর্ণসুবর্ণে (মুর্শিদাবাদ জেলা) গিয়েছিলেন। সমকালীন এক চীনা পর্যটক ইৎসিঙ্‌ তাম্রলিপ্ত থেকে বুদ্ধগয়া অবধি এক রাস্তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এইসব বিবরণ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে সেকালের তাম্রলিপ্ত থেকে বুদ্ধগয়া বা পাটলিপুত্রে যাবার এই পথটি বেশ বহুল ব্যবহৃত ছিল। কিন্তু বহির্বঙ্গের সঙ্গে তাম্রলিপ্তের যোগসূত্রকারী সে পথটির হদিস কোথায় ?

অনুমাননির্ভর সন্ধান অবশ্য দিয়েছেন তৎকালীন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের জে. ডি. বেগলার মহোদয়। তাঁর মতে, পুরাতত্ত্বের দিক থেকে

উল্লেখযোগ্য কোন পথের খোঁজখবর করতে হলে এলাকার প্রত্নতত্ত্বসমৃদ্ধ স্থানের মধ্যেই খুঁজে পেতে হবে। তাই তিনি তাম্রলিপ্ত-পাটলিপুত্রগামী পথের নির্দেশ দিতে গিয়ে তামলিপ্ত থেকে সোজা চলে গিয়েছেন প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বিষ্ণুপুরে, তারপর বহুলাড়া, একতেশ্বর, ছাতনা, রঘুনাথপুর ও তেলকুপি প্রভৃতি স্থানে। আফশোসের কথা তাম্রলিপ্ত থেকে বিষ্ণুপুরের মধ্যবর্তী বর্তমান মেদিনীপুর জেলার কোন স্থানের কথা তিনি উল্লেখ করেননি। যদি করতেন, তাহলে এ জেলার মধ্যস্থিত সে প্রাচীন সড়কটির অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারতাম।

অতএব এ জেলার প্রাচীনকালের পথঘাট সম্পর্কে পুঁথিপত্রের বিবরণ থেকে তথ্যই কেবলমাত্র পাওয়া যায়, বাস্তবে কিন্তু সেসব পথের কোন অস্তিত্ব আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং এখন না পাওয়া গেলে ক্ষতি নেই, ভবিষ্যতের গবেষকরা হয়ত খুঁজে বের করবেন এই আশা করা যায়। তবে চোখের দেখা পরিত্যক্ত পথঘাটের নিদর্শন এ জেলায় যেসব ছড়িয়ে আছে, বরং সেদিকেই দৃষ্টি ফেরানো যাক্। এ জেলায় পুরাতন যেসব বৃহৎ সড়কের অস্তিত্ব স্থানে স্থানে দেখা যায়, তেমন একটি পথ হল 'নন্দকাপাসিয়ার জাঙ্গাল।' বুঝতে অসুবিধে নেই যে এই 'জাঙ্গাল' কথাটি সে সময়ে উচ্চ পথ হিসেবেই ব্যবহৃত হত।

এ জেলার মধ্যভাগে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এই সড়কটি সম্পর্কে আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' প্রণেতা ত্রৈলক্যনাথ পাল আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছিলেন যে, "মেদিনীপুর নিবাসী নন্দ নামক কার্পাস ব্যবসায়ী এক ব্যক্তি গয়া হইতে শ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত গমনের এক উচ্চ ও প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করেন। এই পথ নন্দকাপাসিয়ার বাঁধ নামে বিখ্যাত। পূর্বতন যশস্বী লোকেরা আপনাদের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য কেহ বৃহৎ দেউল নির্মাণ করিয়াছেন, কেহ বা প্রশস্ত জাঙ্গাল প্রস্তুত করিয়াছেন। নন্দ কাপাসিয়ার এই কীর্তির দ্বারা তাঁহার নাম পর্যন্ত লোকের স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। নন্দকাপা-সিয়ার বাঁধ এক্ষণে স্থানে স্থানে ক্ষয়প্রাপ্ত ও বিলুপ্ত হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইল পথকরের টাকার দ্বারা এই জাঙ্গালের উপর আরও কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা দিয়া ডেবরা থানা হইতে সবঙ্গ থানা পর্যন্ত এক প্রশস্ত পথ প্রস্তুত হইয়াছে। ক্রমশঃ আরও দক্ষিণের পথ এরূপে সংস্কারপ্রাপ্ত হইতে পারে। পূর্বে একজন তুলা ব্যবসায়ী ব্যক্তির ক্ষমতায় গয়া হইতে শ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত এই পথ প্রস্তুত হইয়াছিল— ইহা সহজ কথা নহে।"

নন্দকাপাসিয়ার জাঙ্গালের অস্তিত্ব সম্পর্কে ত্রৈলক্যবাবু কিছু বাড়িয়ে বলেন

নি। একশো বছর কি তারও আগে তিনি ঐ বাঁধের যে অবস্থা ও সংস্কার দেখেছিলেন বর্তমানে তার বহু অংশেই বিনষ্ট, যা ভবিষ্যতে সংস্কার হবারও কোন আশা নেই। কয়েক বৎসর পূর্বে পুরাকীর্তির সন্ধানে এ জেলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াবার সময় স্থানে স্থানে এমন চওড়া ও উঁচু এক বাঁধ আমাদের নজরে পড়ে বেশ কৌতূহলী করে তোলে। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় এটিই হল সেই নন্দকাপাসিয়ার বাঁধ। 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' প্রণেতা যোগেশচন্দ্র বসু নন্দকাপাসিয়ার পরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'নন্দকাপাসিয়া কোন্ স্থানের অধিবাসী ছিলেন, তাহা সঠিক জানা যায় নাই। কেহ কেহ বলেন তিনি জাতিতে তন্তুবায় ছিলেন এবং তাঁহার নিবাস চন্দ্রকোণায় ছিল।' নন্দকাপাসিয়া আজ কিংবদন্তী হলেও তাঁর নামে চিহ্নিত এই বাঁধটির অবশেষ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি ডেবরা থানার এলাকাধীন দক্ষিণপশ্চিম প্রান্তবর্তী জালিমান্দা, মামুদচক, অশ্বাদিঘি গ্রামে, পিংলা থানার বেলাড়, ছুজিপুর এবং নারায়ণগড় থানার মণিনাথপুর প্রভৃতি গ্রামে। জমির ক্ষুধাবৃদ্ধির ফলে বিরাট আয়তনের ঐ উঁচু বাঁধটি ক্রমশঃ মানুষের জবরদখলে চলে যেয়ে তার বিলুপ্তিকে ত্বরান্বিত করে তোলা হচ্ছে।

নন্দকাপাসিয়ার জাঙ্গালের অবশেষ দেখে আমরা জেলার উত্তর অংশে খোঁজ সন্ধান স্থরু করি। চন্দ্রকোণার ইতিহাস রচয়িতা যশস্বী মৃগাঙ্কনাথ রায় মহাশয়ও এ রাস্তাটির অস্তিত্ব সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছিলেন, 'নন্দকাপাসিয়ার বাঁধ গড়মান্দারণ হইতে দারুকেশ্বর নদের কূলে কূলে চিতুয়া হইয়া দক্ষিণ পশ্চিম-ভিমুখে পাঁশকুড়া অবধি গিয়াছিল।' তাছাড়া তিনি নিজেও লক্ষ করেছিলেন ঘাটাল থানার তপ্পে বরদার মধ্যেও এই বাঁধটির অস্তিত্ব রয়েছে। তাই তিনি অনুমান করেছিলেন, সম্ভবতঃ ঐ পথটি উত্তরে স্থলতানপুর গ্রামে ধর্মমঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত জালন্দার গড়ের উপর দিয়েই প্রসারিত ছিল।

মৃগাঙ্কবাবুর সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করে ঘাটাল থানার এলাকাধীন বরদা এলাকায় আমরা খোঁজ সন্ধান করে কাছাকাছি পুরাতত্ত্বসমৃদ্ধ প্রাচীন গ্রাম পান্না থেকে বরদার চৌকান পর্যন্ত যে পুরাতন এক পথের সন্ধান পাই তার নাম 'দ্বারির জাঙ্গাল' হলেও কেউ কেউ সেটিকে নন্দকাপাসিয়ার রাস্তা বলেও মত পোষণ করে থাকেন। হতে পারে এ রাস্তাটি বরদা থেকে খড়ার হয়ে স্থলতানপুরের উপর দিয়ে গড়-মান্দারণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

অতীতের স্মৃতিবাহী এ পথটি সম্পর্কে আর একটি লিখিত বিবরণের সন্ধান পাওয়া গেছে। দাঁতন থানার এলাকাধীন সাউরি-দামোদরপুর গ্রামের চৌধুরী

দাস মহাপাত্র পরিবারে রক্ষিত তাঁদের পরিবারিক ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায় যে, চৈতন্য মহাপ্রভু ছত্রভোগ থেকে হাঁটাপ্রথে প্রসিদ্ধ রাজপথ নন্দকাপাসিয়ার বাঁধ ধরে সাউরি গ্রামের মধ্য দিয়ে দাঁতনে উপস্থিত হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে পারিবারিক বিবরণটি অবশ্য কতটা যুক্তিগ্রাহ্য হবে সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও, নন্দকাপাসিয়ার এই জাঙ্গালটি যে দাঁতন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এ বক্তব্য মোটেই অমূলক নয়। কারণ দাঁতন থানার মধ্যবর্তী নন্দকাপাসিয়া নামে যে জনবসতিহীন মৌজাটি দেখা যায়, সেটি অতীতে একটি বিরাটাকার বাঁধরাস্তা ছিল, যা পরে মৌজার নামকরণে ভূষিত হয়।

নন্দকাপাসিয়ার সেই পুরাতন পথটির অস্তিত্ব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণভাবে কোন গবেষণা আজও হয়নি। এইভাবেই যে কত ঐতিহাসিক সম্পদ চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছে তারই এক দৃষ্টান্ত এই প্রাচীন পথটি। সেজন্য জেলার বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তারই ভিত্তিতে এ রাস্তাটি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা গড়ে তুলতে পারা যায়। অনুমান যে, গড়মান্দারণ থেকে পথটি সুলতানপুর, খড়ার, বরদা ও পান্না হয়ে শিলাবতী পেরিয়ে দাসপুর থানার ঝুমঝুমি ; তারপর সেখান থেকে কাঁসাই পেরিয়ে ডেবরা, পিঙ্গলা ও সবং থানার পাথরঘাটা ; সেখান থেকে নৈপুর, হাজিপুর, সাউরি, একারুকি ও সাবড়া গ্রামের মধ্য দিয়ে নন্দকাপাসিয়া হয়ে দাঁতন পর্যন্তই ছিল এ পথটির প্রসার। সম্ভবতঃ তমলুক থেকেও কোন পথ এটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, যা একান্তই অনুসন্ধানযোগ্য।

নন্দকাপাসিয়ার জাঙ্গাল ছাড়া এ জেলায় নারায়ণগড় থানায় আরও একটি পরিত্যক্ত উঁচু জাঙ্গাল লক্ষ করা যায়, যার অস্তিত্ব আজও অনেকাংশে সগর্বে বিদ্যমান। সেটি ছিল সম্ভবতঃ ওড়িশার ময়ূরভঞ্জের সঙ্গে সংযোগকারী কোন পথ, যা কেশিয়াড়ী হয়ে পুবদিকে বিস্তৃত নারায়ণগড়ের উকুনমারীর উপর দিয়ে সবং থানায় নন্দকাপাসিয়ার জাঙ্গালের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই বাঁধের আশপাশে অনেক পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ থেকে এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এটিও একদা প্রসারিত ছিল সমৃদ্ধ সব জনপদের মধ্য দিয়ে।

মোগল আমলের বাদশাহী সড়কও এ জেলার মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়েছে। বলতে গেলে সামান্য পরিবর্তন ছাড়া এ সড়কটি তার পূর্ববস্থা মোটামুটি বজায় রাখতে পেরেছে। সে পথটি বর্ধমান থেকে হুগলী জেলার গোঘাট থানার উপর দিয়ে গড়মান্দারণ হয়ে এই জেলার চন্দ্রকোণা থানার পাইকমাজিটা গ্রামে প্রবেশ করেছে। তারপর লক্ষ করা যায় রামজীবনপুর হয়ে ক্ষাঁকরা পর্যন্ত

সাবেক সে সড়কটি বহু স্থানে পরিত্যক্ত হয়েছে। ঝাঁকরার প্রায় পাঁচ কি.মি. দক্ষিণপশ্চিমে এই পথে দনাই নদীর উপর পাথরের যে সেতুটি ছিল তা আজ বিনষ্ট হলেও এখনও সাধারণ লোকের কাছে তা পিঙলাসের সাঁকো নামে আখ্যাত হয়ে আছে। এখান থেকে পথটি কেশপুর থানার তলকুঁয়াই বা নেড়া-দেউলের কাছ থেকে দক্ষিণপশ্চিমে কেশপুরের উপর দিয়ে মেদিনীপুর শহরে প্রবেশ করেছে। যোল শতকে চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে দেশত্যাগ করে দামুন্যা থেকে এই পথ দিয়ে নেড়াদেউল হয়ে ব্রাহ্মণভূম পরগণার আড়ঢার গড়ে পৌঁছেছিলেন।

এ জেলার আর একটি পুরাতন রাস্তা হল রাণীগঞ্জ রোড , যা উত্তরে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের উপর দিয়ে গড়বেতা শালবনী হয়ে মেদিনীপুর শহরে পৌঁছেছে। এ রাস্তায় একদা পুরীর তীর্থযাত্রীরা গমনাগমন করতেন বলে সরকারী নথিতে এর নাম হয়েছে 'পিলগ্রিম রোড' বা তীর্থযাত্রীর সড়ক। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 'মাধবীকঙ্কণ' উপন্যাসটিতে এই সড়কটির এক মনোজ্ঞ চিত্র তুলে ধরেছেন। সম্ভবতঃ এই পথ দিয়েই নারায়ণগড়ের ব্রহ্মাণী দেবীর 'যমদুয়ার' বা "ব্রহ্মাণী দরজা' পার হবার সময় জগন্নাথযাত্রীকে প্রণামীর টাকা দিয়ে ব্রহ্মাণী-দেবীর ছাপ বা ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হত। পরবর্তীকালে উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড নির্মিত হলে এ রাস্তাটির বহুলাংশ পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু ব্রহ্মাণী দেবীর মন্দিরের সন্নিকটে সে যমদুয়ারের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে দুপাশে ঝামাপাথরের দেওয়ালযুক্ত এক প্রবেশপথ আজও দেখা যায়।

মেদিনীপুর থেকে পশ্চিমে নাগপুর পর্যন্ত প্রসারিত আর একটি প্রাচীন সড়কের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রাচীন রাস্তাটি সম্পর্কে 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' প্রণেতা যোগেশচন্দ্র বসু লিখেছেন, "...এই জেলার পশ্চিমাঞ্চলে জঙ্গলমহালের মধ্য দিয়া ভারতের মধ্যপ্রদেশে যাইবার একটি প্রাচীন পথ বহুদিন হইতে প্রতিষ্ঠিত আছে। মহারাষ্ট্রীয় বাহিনী এই পথেই এতদ্দেশে গমনাগমন করিত। ...উত্তরকালে সেই রাস্তাটির আবশ্যকমত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া উহাকে 'বোম্বাই রাস্তা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। উহা মেদিনীপুর শহর হইতে আরম্ভ হইয়া পশ্চিমে ঝাড়গ্রাম মহকুমার মধ্য দিয়া ধারাশোল গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ; তৎপরে সিংভূম জেলা।" অন্যদিকে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে প্রকাশিত সংবাদপত্রের এক বিবরণে উল্লিখিত হয়েছে, "নূতন রাস্তা। —মেদিনীপুর হইতে নাগপুর ও তথা হইতে কানপুর পর্যন্ত এক রাস্তা হইতেছে। ... এই সকল রাস্তা

হইলে লোকেরদিগের অনেক উপকার হইবে।" প্রকাশিত এ সংবাদটি থেকে মনে হয় যেন উনিশ শতকে বিদেশী শাসকরা এই প্রথম নাগপুর পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন। আসলে ব্রিটিশ শাসনকর্তারা সে সময়ে তাদের শাসনের জাল বিস্তারে সহায়ক বিবেচনা করে এই পথটির সংস্কারসাধনে কেবলমাত্র উদ্যোগী হয়েছিলেন, নতুনভাবে এই পথটি নির্মাণ করেননি।

ইংরেজ রাজত্বে পোস্তার রাজা সুখময় রায় বাহাদুরের সাহায্যে নির্মিত এ জেলার আর একটি পথ হল 'ওড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড', যা কটক রোড নামেও পরিচিত। এটি ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু হয়ে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়। এছাড়া ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ শাসকরা আরও একটি সড়ক যে নির্মাণ করছেন তা ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায়। সে সংবাদটিতে বলা হয়েছে, "মেদিনীপুর।—এই মহারাজ্যের নানা প্রদেশ দিয়া নূতন রাস্তা প্রস্তুতকরণে সংপ্রতি শ্রীযুত গবর্নর জেনরল অধিক মনোযোগ করিতেছেন। এক্ষণে মেদিনীপুরের জেলার মধ্যে এক নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে তাহা সম্বল রাজার অধিকারের মধ্য দিয়া যাইবেক। কিন্তু তিনি আপনার ঐ নূতন রাস্তা যাওনে যথাসাধ্য প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন এ প্রযুক্ত তাঁহাকে বুঝাইবার নিমিত্তে পাঁচদল পদাতিক সৈন্য তাঁহার নিকটে প্রেরণ করা গিয়াছে।" এ সড়কটি যে আসলে কোন্ সড়ক বা সম্বল রাজা কে, তা জানা যায় না।

পরবর্তী ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মেসার্স ওয়াটসন কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ টার্নবুল ঘাটাল থেকে চন্দ্রকোণা হয়ে রামগড় পর্যন্ত রাস্তাটি যে নির্মাণ করে দেন তা নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে।

এইভাবে এ জেলায় পথের সন্ধানে এসে দেখা গেল, কত প্রাচীনপথ নানা-কারণে ধ্বংস হয়েছে, কতবা নতুন পথ সেগুলিকে গ্রাস করে স্ফীত হয়েছে—যার ইতিহাস কালে কালে হারিয়ে গেছে।

১১ জগন্নাথ রাস্তার পরিক্রমা

মহারাজা সুখময় অবশেষে শ্রীক্ষেত্র দর্শনে অভিলাষী হলেন; তাই সাজ সাজ রব পড়ে গেল। শাস্ত্রীয় বচনে আছে তীর্থদর্শনের আগে দানধ্যান না করলে যথাযথ

পূণ্যার্জন ঘটে না। তাই সে সময়ে পঁচিশ হাজার টাকা শুধু এই তীর্থযাত্রা উপলক্ষেই দান করলেন মহারাজা। সেকালে জগন্নাথ দর্শনে যেতে হলে হাঁটাপথ ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। বিত্তবানদেয় কথা অবশ্য আলাদা। তাঁরা পাল্কী বা গরুর গাড়িতে যাতায়াত করতে পারতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের পদসম্বল ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না, যার ফলে তাদের কপালে জুটতো দৈহিক পরিশ্রমের অবর্ণনীয় দুঃখ, যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা।

কিন্তু সুবর্ণবণিক পরিবারের মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুরের কথা আলাদা। তিনি কলকাতার পোস্তা রাজবাড়ির বিখ্যাত ধনী। অপুত্রক মাতামহ লক্ষ্মীকান্ত ধর ওরফে নকু ধরের একমাত্র দৌহিত্র হিসাবে বিপুল ধনসম্পত্তির তিনি উত্তরাধিকারী হয়েছেন। অতীতে পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভকে প্রভূত অর্থসাহায্য ছাড়াও মারাঠা যুদ্ধের খরচখরচা বহনের জন্য ওয়ারেন হেস্টিংসকে ন' লক্ষ টাকা দিয়ে সাহায্য দান করে ধনকুবের মাতামহ লক্ষ্মীকান্ত যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি চলেছেন। সুতরাং বদান্যতা ও রাজভক্তির জন্য ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর তদানীন্তন সম্রাট খুররম বক্ত মুয়াজ্জম-শা-বাহাদুর তাঁকে 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত করেছেন এবং ইংরেজ প্রীতির জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও ঐ একই খেতাব বহাল রেখেছেন। এহেন মহারাজা বাহাদুর তাই এ তীর্থযাত্রায় ইংরেজ সরকারের সাহায্যপ্রার্থী হলেন। কারণ পথে চোর-ডাকাতের উপদ্রব যে ছিল না এমন নয়। সে সময়ে দাঁতনের কাছাকাছি বেশ কিছু এলাকা ছিল চোর-ডাকাতদের স্বর্গরাজ্য। পথিকের সর্বস্ব অপহরণ করে তারা পালিয়ে যেত পাশাপাশি ময়ুরভঞ্জ বা নীলগিরি রাজাদের এলাকায়। এছাড়া যেখানে সেখানে জোরজুলুম করে তীর্থকর আদায় করার নামে তীর্থযাত্রীদের যথেষ্ট হায়রাণও করা হ'ত। তাই এসব অসুবিধের কথা বিবেচনা করে সরকারের কাছে তিনি আবেদন জানালেন যেন তাঁর লোকজন ও সাজসরঞ্জাম নিয়ে জগন্নাথ দর্শনে যেতে কোন বাধা না হয়।

সে সময়ে বড়লাট ওয়েলেসলি ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮০৫ তারিখে মহারাজাকে এক ছাড়পত্র মঞ্জুর করলেন। তাতে কর্মনিরত কালেক্টার, প্রহরী, চৌকিদার ও রাস্তার রক্ষকদের জানিয়ে দেওয়া হল যে, মহারাজার যাত্রাপথে যেন কোন শুল্ক বা তীর্থকর আদায় বা কোনভাবে বাধা প্রদান না করা হয়। রাজা এই তীর্থযাত্রায় যেসব দ্রব্য, লোকজন ও পরিবহনের জন্তুজানোয়ার নিয়ে যাবেন তার এক তালিকাও ছাড়পত্রে উল্লেখ করে দেওয়া হল। সে তালিকাটি

হল : রূপোর বাসন ১ প্রস্থ, কাপড়চোপড় ও পিতল কাঁসার বাসন ৪০ বাক্স, খড়খড়িযুক্ত ঝালর দেওয়া পাল্কী ১৫টি, উট ১টি, ঘোড়া (সংখ্যাটি অস্পষ্টতার জন্য জানা যায়নি), অলঙ্কার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ৪ বাক্স, খাট ২ খানা, মশলা ইত্যাদির বাক্স ৪টি, জমাদারসহ বরকন্দাজ ১৫ জন, বর্শাধারী ৪ জন, ভৃত্য ৭ জন, মশালচী ৭ জন, মুন্সী ১ জন, কেরাণী ২ জন, ক্ষৌরকার ৪ জন, হরকরা ৪ জন, ঝাড়ুদার ১ জন, সিপাহী ২ জন এবং জমাদার (সংখ্যাটি অস্পষ্ট) প্রভৃতি। সেকালে রাজা-মহারাজার পথ-পর্যটনে জাঁকজমকের ও নিরাপত্তা বিধানের এক নিখুঁত চিত্র।

মেদিনীপুর হয়ে পুরীর জগন্নাথতীর্থে যাবার রাস্তা সম্পর্কে আগের নিবন্ধ 'পথের সন্ধানে' কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তবে সে রাস্তাটির অবস্থা এমনই শোচনীয় ছিল যে, সে পথের চেহারা দেখে পথিকদের একান্তই নিরুৎসাহ হতে হত এবং ছোটখাটো খালনালা পারাপারের কোন উপযুক্ত সেতুও ছিল না। তাছাড়া বিদেশী শাসকদের প্রধান দপ্তর কলকাতার সঙ্গে সরাসরি সোজাপথে সে রাস্তার কোন যোগসূত্রও ছিল না। সেসময় কলকাতা থেকে হাওড়ার উপর দিয়ে গড়মান্দারণ হয়ে ঘুর পথে মেদিনীপুর পৌঁছতে হত এবং সেখান থেকে একটি রাস্তা দাঁতন হয়ে পুরী পর্যন্ত ছিল বিস্তৃত। মহারাজা সুখময় সম্ভবতঃ এই পথ দিয়ে মেদিনীপুর হয়ে দাঁতনের উপর দিয়ে শ্রীক্ষেত্র পৌঁছেছিলেন। তীর্থ শেষে ২০শে মার্চ, ১৮০৫ তারিখে তিনি কলকাতা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছেন বলে নথিপত্রে জানা যাচ্ছে। প্রত্যাগমনের পর দুর্গম পথ পরিক্রমার অসুবিধেগুলি তিনি যথাসময়ে হয়ত ইংরেজ সরকারবাহাদুরে নিবেদনও করেছিলেন। জগন্নাথ দর্শনের সে পথে যাত্রীনিবাস নেই, নদীনালা পার হবার কোন সেতুও নেই, পথের মাঝে তেষ্টার জল পাবার কোন উপায়ই নেই, তদুপরি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা তীর্থকরের বোঝা। পদব্রজে যাত্রীদের অবর্ণনীয় কষ্ট-দুর্দশা তাই বোধ হয় মহারাজাকে ব্যথিত করে তুলেছিল।

বিলেতী শাসকরাও এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। কারণ উনিশ শতকের প্রথম দিকে ওড়িশার বিভিন্ন করদ রাজারা ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। ভাল সড়ক যোগাযোগ না থাকায় সেসব বিদ্রোহ দমনে ফৌজ পাঠাতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। তাই ওড়িশার সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগের জন্য একটি সুগম পথ নির্মাণের কথা ব্রিটিশ সরকার চিন্তাও করেছিলেন, কিন্তু সে রাস্তা নির্মাণে প্রয়োজনীয় অর্থ রাজকোষে ছিল না বলেই সে চিন্তা

আপাততঃ ধামাচাপা পড়ে যায়। মহারাজার তীর্থযাত্রার অভিজ্ঞতায় নতুন করে কোলকাতা থেকে সোজাপথে মেদিনীপুর হয়ে পুরীর সঙ্গে যোগাযোগের একটি ভাল সড়ক নির্মাণের কথা উঠলো। সুযোগ বুঝে শাসকরা পরামর্শ দিল, শ্রীক্ষেত্রগামী যাত্রীদের ক্লেশমোচনে মহারাজা যদি একটি নতুন সড়ক নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করেন, তাহলে তা পুণ্যাত্মার কাজ হিসাবে অক্ষয়-অমর হয়ে থাকতে পারে। ধর্মপ্রাণ মহারাজা তীর্থযাত্রীদের হাঁটাপথে এবম্বিধ অসুবিধের কথা ভেবে ইংরেজদের প্রস্তাবে রাজী হলেন এবং ঐ পথ নির্মাণ বাবত দেড় লক্ষ টাকা দান করতেও প্রতিশ্রুত হলেন। তবে শর্ত রইল যে, তাঁর এই বদান্যতার পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকবে সেতুর গায়ে পাথরের ফলকে বাংলা, সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায়। এছাড়া পথের দুপাশে গাছ রোপণ এবং যাত্রীদের জন্য বিশেষ করে বেগোনিয়া ও অন্য আর এক স্থানে দুটি জলাশয় অবশ্যই খনন করে দিতে হবে। সম্ভবতঃ মহারাজা শ্রীক্ষেত্রের পথে পরিভ্রমণকালে স্বচক্ষে বেগোনিয়ায় যে জলকষ্ট দেখে ছিলেন তা মোচনের জন্য এই প্রস্তাব রেখেছিলেন। তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল লর্ড মিন্টো ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮১০ তারিখে সুখময়ের প্রস্তাবিত সব শর্ত মেনে নিয়ে সন্তোষপ্রকাশ করে পত্র দিলেন। পরবর্তী ইংরেজ সরকারের পক্ষে তদানীন্তন সচিব ডাউডেসওয়েল ৩রা ডিসেম্বর, ১৮১০ তারিখে একপত্রে মহারাজার উপস্থাপিত সব শর্ত অনুযায়ী প্রস্তাবিত সড়কের কাজ শুরু করা হবে বলে অবগত করায়, মহারাজা প্রতিশ্রুতিমত সমুদয় অর্থ জমা দিলেন। কিন্তু তাঁর কীর্তি অবশেষে দেখে যেতে পারলেন না; ৯ই জানুয়ারী, ১৮১১ তারিখে তিনি দেহরক্ষা করলেন।

যতই হোক তীর্থযাত্রীদের যাতায়াতের প্রয়োজনে যে এ রাস্তা নির্মাণ নয়, তা বেশ বোঝা গেল বিলেতে কোর্ট অফ ডাইরেক্টরকে ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৮১১ তারিখে লেখা এক চিঠি থেকে। তদানীন্তন ইংরেজ সরকার ঐ চিঠিতে তীর্থযাত্রীদের গমনাগমনের এ পথ নির্মাণের কথা লিখতে গিয়ে স্পষ্টই জানালো, **'it is however still more requisite in a military point of view.'** ধুরন্ধর ইংরেজ শাসকদের অভিপ্রেত কার্য অবশেষে এইভাবেই হাসিল হল।

পরিকল্পনামত নতুনভাবে এ সড়কটি নির্মাণের কাজ শুরু হল ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে। সরকার থেকে এ রাস্তা নির্মাণে তাদারকির ভার দেওয়া হয়েছিল জনৈক ব্রিটিশ ইন্‌জিনিয়ার ক্যাপটেন স্যাকভিলিকে। তিনি এমনই করিতকর্মা ছিলেন যে,

রাস্তার কাছাকাছি যত পাথরের ভাঙ্গা মন্দির ছিল সেগুলির সবই ভেঙ্গে এনে রাস্তায় বিছিয়ে দিয়েছিলেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে স্যাকভিলি সাহেবের স্থলাভিষিক্ত হলেন কাপ্টেন বাউটন। তিনিও রাজঘাটের কাছাকাছি এমন অনেক পুরাতন ভগ্ন দুর্গ ও মন্দিরের পাথর এনে যে এ রাস্তায় বিছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন সে বিষয়ে ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে উল্লেখ করা হয়েছে। এইভাবে তের বছর ধরে মেদিনীপুর থেকে ওড়িশা অংশের রাস্তার কাজ শেষ হল ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে। এবার ১৮২৫ সালে শুরু হল মেদিনীপুর থেকে উলুবেড়িয়া পর্যন্ত রাস্তা তৈরীর কাজ, যা শেষ হল ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে। সেসময় রাস্তার মাঝে মধ্যে ক্যালভার্ট নির্মাণের ঠিকেদারী দেওয়া হল তখনকার বিখ্যাত সেতুনির্মাণকারী এক বিলেতী ফার্মকে। আজও ভগবানবসান গ্রামে পুরাতন সেই পরিত্যক্ত কটক রোডের এক ক্যালভার্টের গায়ে যে পাথরের ফলকটি দেখা যায় তার বয়ান হল : '**C. J. Middletone. S. Q. I./J. & M./ 1824.**'। মেদিনীপুর পর্যন্ত নতুন করে রাস্তাটি নির্মাণ হবার পর উলুবেড়ে থেকে কোলাঘাটের দুরত্ব দাঁড়ালো ১৬ মাইল, কোলাঘাট থেকে পাঁশকুড়োঘাট ১০ মাইল, সেখান থেকে ডেবরা ১০ মাইল, ডেবরা থেকে মনিবগড় ৮ মাইল, মনিবগড় থেকে রামনগর ৩ মাইল এবং সেখান থেকে মেদিনীপুর ৫ মাইল, একুনে উলুবেড়ে থেকে মেদিনীপুর মোট ৩৬ মাইল। এইভাবে মোট সতের বছর ধরে এই রাস্তা নির্মাণের কাজ ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হ'ল এবং সরকারীভাবে এর পরিচয় হল উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড, যা সাধারণ লোকের কাছে কটক রোড্ নামেই সমধিক পরিচিত হল।

দাতার সঙ্গে শর্ত ছিল, সেতুর গায়ে মহারাজার দানশীলতার কথা পাথরের ফলকে খোদাই থাকবে। হাওড়া বা মেদিনীপুর জেলায় নদীর উপর কোন সেতু নির্মিত না হওয়ার কারণে আমরা কোন উৎসর্গ-ফলক দেখতে পাইনি, তবে ১৯৫৮ সালে এই পথে একবার আমাদের পদব্রজে পুরী যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেসময় ওড়িশার বালেশ্বর জেলায় তেঁতুলিয়া ও ফুলাহে এমন ভগ্ন দুটি সেতুর গায়ে ফার্সী, বাংলা ও সংস্কৃতে লেখা লিপিফলক দেখা গেছে এবং ঐ দুই ফলকে খোদাই বিবরণও এক। তিন ফুট দৈর্ঘ্য ও দু' ফুট প্রস্থ পরিমিত কালো পাথরের ফলকে উৎকীর্ণ বাংলা লিপিভাষ্যটির মধ্যে এই পথনির্মাণের ইতিহাস বেশ ভালভাবেই অনুধাবন করা যায়। সেটির পাঠ : 'কলিকাতা নিবাসী বৈকুণ্ঠবাসি মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুর এই রাস্তা এবং তন্মধ্যে সমস্ত সাঁকো নির্ম্মাণ করেন পূর্ব্বে দেড়লক্ষ টাকা প্রদানপূর্ব্বক তৎকর্ম্মে আপন সাহায্য

প্রকাশ করিয়াছিলেন তৎপ্রযুক্ত শ্রীল শ্রীযুত নবাব গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর হুজুর কৌনসলের আজ্ঞাপ্রমাণ মহারাজার দানশীলতার এবং কীর্ত্তির প্রকাশার্থে দ্যুতানি দর্শনস্বরূপ এই প্রস্তরে তদ্বিবরণের কল্প বিল্লাম হইল—ইতি। তারিখ মহামারশ্চ সন ১৮২৬ সাল। খোদাইকারী মিস্ত্রী শ্রীদামোদর চৌধুরী কর্ম্মকার, সাং কটক।"

রাস্তা তৈরীর পর দাতা-মহারাজার শর্ত অনুযায়ী পথিকদের বিশ্রামের জন্য রাস্তার দুধারে বহু গাছপালা রোপণ করা হল। যেসব জমিদারদের এলাকা দিয়ে এই রাস্তা বিস্তৃত হয়েছিল, তাদের আদেশ দিয়ে বলা হল পথের ধারে উপযুক্ত বৃক্ষ রোপণের জন্যে। সেসময় কটকরোডের দুপাশে যে বেশ কিছু গাছপালা লাগানো হয়েছিল, তার স্মৃতিচিহ্ন কয়েক বৎসর পূর্বেও অবশিষ্ট ছিল। ১৯৫৮ সালেও লক্ষ করা গেছে, মেচগ্রাম থেকে পাঁশকুড়া পর্যন্ত সারিবন্দি কয়েতবেল গাছের সারি, তারপর পাঁশকুড়াঘাট থেকে আযাড়িয়া বাঁধ পর্যন্ত দক্ষিণ পাশে ক্ষীরিশ এবং উত্তর পাশে আম ও সেগুন গাছের সারি। দুঃখের কথা, এ রাস্তাটিকে জাতীয় সড়কে রূপান্তরের সময় সে সব গাছপালার অধিকাংশই বিনষ্ট করে দেওয়া হয়।

রাস্তা নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে পথিমধ্যে বেশ কয়েকটি যাত্রী নিবাসও নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছিল। এ সম্পর্কে পুরাতন কাগজপত্রের দৃষ্টান্তে জানা যায়, এই ধরনের যাত্রীশালা নির্মিত হয়েছিল, হাওড়ার চণ্ডীপুরে, মেদিনীপুরের কোলাঘাট, ডেবরা, শ্রীরামপুর ও দাঁতনে। স্থানীয়ভাবে জানা গেছে দাঁতন সে সময় ছিল পদযাত্রীদের এক বড়ো আশ্রয়স্থল। এখানে জগন্নাথ রাস্তার ধারে প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ মন্দিরের নাটমণ্ডপটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন কলকাতার সে সময়ের ধনী স্বর্ণবণিক পরিবারের নীলমনি মল্লিক। তিন থেকে পাঁচ একর জায়গা জুড়ে প্রায় পাঁচশো যাত্রী থাকার উপযুক্ত করে এই সব যাত্রীনিবাস পাকাপোক্তভাবেই নির্মাণ করা হয়েছিল। এই সব যাত্রীনিবাসে একটি প্রশস্ত উঠানের সঙ্গে লাগোয়া বড় একটি হলঘর ছাড়া আরও থাকতো কতকগুলি ছোট ছোট ঘর, যাতে একই পরিবারের লোকজনের থাকতে কোন অসুবিধা না হয়। তাছাড়া জলের প্রয়োজন মেটাতে এর সঙ্গে পুকুর অথবা ইঁদারাও খনন করে দেওয়া হয়েছিল। দুঃখের কথা, পরবর্তীকালে হাওড়া বা মেদিনীপুর জেলায় পথচারীদের জন্য নির্মিত এসব যাত্রীশালার কোন নিদর্শন আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সেকালের উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোডের উলুবেড়ে থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত রাস্তাটির বেশ কিছুটা অংশের পরিবর্তন ঘটিয়ে ৬ নং জাতীয় সড়ক নির্মাণ করা হলেও, স্থানে স্থানে এখনও সে পুরাতন পথটির অবশেষ লক্ষ করা যায়। মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর থানার এলাকাধীন বসন্তপুর থেকে ওকড়া হয়ে সাবেকী সেই তীর্থপথটি চলে গেছে চৌরীবেড়ে, মালজুড়ী, মনিবগড়, বেড়জনার্দনপুর ও চঞ্চল-পুরের উপর দিয়ে। চঞ্চলপুরের কাছে কাঁসাই পেরিয়ে হাতিহোলকা, রামনগর, পাইকারাপুর, গোবিন্দপুর, জোয়ারহাটি, হরিশপুর ও কেশবপুর হয়ে এ পথটি এসে মিশেছে রাণীগঞ্জ-মেদিনীপুর 'পিলগ্রিম' সড়কে, তারপর পুনরায় কাঁসাই পেরিয়ে দক্ষিণে প্রসারিত হয়েছে।

মোটামুটি এই হল শ্রীক্ষেত্রগামী তীর্থযাত্রীদের গমনপথের ইতিবৃত্ত। জলপথ বা রেলপথ প্রবর্তনের আগে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী গিয়েছেন ধর্মের টানে এই পথ ধরে। সাম্রাজ্যজাল বিস্তারের জন্যে ইংরেজ রাজার ফৌজও সময়ে অসময়ে করেছে রুট মার্চ। শাসকদের হুকুমে ঐসব সেনানীদের খাদ্য ও আশ্রয় জোগানের দায়িত্ব ছিল স্থানীয় জমিদারদের ওপর। এইভাবে ধর্মের জিগির তুলে বিদেশী শাসকদের রাজ্যশাসনের কার্যসিদ্ধির এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ এ পথের সৃষ্টি।

অন্যদিকে গরীব তীর্থযাত্রীদের সেবার জন্য ধর্মপ্রাণ বিত্তবানরাও এগিয়ে এসে পথিমধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সদাব্রতের আখড়া, যেখানে নিত্যনিয়মে পথিকদের অন্নজলদানের ব্যবস্থা থাকতো। তবে এ সময়ে তীর্থযাত্রীদের পদব্রজে ভ্রমণের এক নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায় ৮ই মে, ১৮৬৮ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায়। সে সময় তীর্থযাত্রীশিকারী পাণ্ডাদের প্রতিনিধিরা গ্রামে আসতেন, ন্যাড়া মাথায়, কান ঢাকা টুপি পরা, তালপাতার ছাতা মাথায় চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে। উপযুক্ত যাত্রীসংগ্রহ হলেই এইসব পাণ্ডারা পথে নেমে পড়তেন। যাত্রীদের অধিকাংশই ছিল বিধবা মহিলা। খুব ভোরে যাত্রীনিবাস থেকে যাত্রীদের রওনা করিয়ে দেওয়া হত এবং দৈনিক মাইল পনের-ষোল যে ক্ষীণজীবীদের হাঁটার ক্ষমতা তাদের জোর করে জলা-জঙ্গলের রাস্তায় চল্লিশ মাইল পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। পথে জন্তুজানোয়ারের ভয় থাকলেও সেদিকে তোয়াক্কা না করে এইভাবে হাঁটিয়ে আনার পর দুপুর গড়িয়ে গেলে তবে পান্থশালায় বিশ্রামের জন্য ছেড়ে দেওয়া হত।

ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কেননা এই অমানুষিক পরিশ্রমে

অনেকেই মাঝপথে দেহরক্ষা করতেন যা হান্টার সাহেবের ভাষায়, **'being lulled to their last sleep by the roar of the eternal ocean'**। কেউ বা পথিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত এমন কোন জগন্নাথ মন্দিরে শ্রীক্ষেত্র ধ্যানজ্ঞানে পূজো দিয়ে শেষ পর্যন্ত ফিরে আসতেন। আর যাঁরা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতেন, তারা ধূলো আর রক্তে বোঝাই পটি বাঁধা ক্ষতবিক্ষত পা নিয়ে পৌঁছোতেন জগন্নাথ-শ্রীচরণে। সেকালের তীর্থযাত্রার এ পথ তাই আজ নানা কারণে, নানা স্মৃতিতে ও নানা ঘটনায় স্মরণীয় হয়ে আছে।

১২. শতবর্ষের এক অবহেলিত জলপথ

অবশেষে রাজা সুখময়ের আর্থিক আনুকূল্যে ওড়িশা ট্রাঙ্ক রোড নির্মিত হয়েছে, কিন্তু সে রাস্তায় গাড়িঘোড়া চলাচল নিয়ে বিগত শতকের মাঝামাঝি সময়ে জেলার কালেক্টর বাহাদুর এইচ. ভি. বেইলী সাহেব তেমন সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর মতে, ব্যবসাবাণিজ্যের মাল চলাচলে সহজে পথ বেয়ে গাড়িঘোড়া যদি না চলতেই পারলো তাহলে চাষীদের ফসলের দাম উঠবে কিভাবে? রাস্তা যদিও বা আছে, এত নদীনালা পেরিয়ে গাড়িঘোড়া চলাচল করেই বা কি করে? এক তো এ জেলার উৎপন্ন ফসলের তেমন দাম পাওয়া যায় না, যদিও বা দূরের কোন বাজারে নিয়ে গেলে ভাল দাম মেলে, কিন্তু তাতে মালপত্র নিয়ে যাবার খরচ-খরচা এত বেশি লেগে যায় যে আসল দামই উঠতে চায় না। এদিকে তো ১৮৪৯ সালে তদানীন্তন জেলার কালেক্টরবাহাদুর টোরেন সাহেবও জানিয়েছিলেন, জেলার উৎপন্ন ফসলের দাম সে সময় এমন কমতির দিকে ছিল যে, কেদার ও তার পাশাপাশি পরগণার প্রজারা উৎপন্ন ফসল বেচে খাজনা দেওয়াতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল। ঐ সালে হিজলীতে তখন ধানের দামই ছিল টাকায় ৪ মণ ২৪ সের। সুতরাং মালপত্র একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়ার উপায় যদি সহজ হয়, তাহলে এই সমস্যার অনেক সমাধান হতে পারে। ১৮৫২ সাল নাগাদ সেজন্য বেইলীসাহেব এই সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব দিলেন বোর্ড অফ রেভেনিউ-এর কাছে উলুবেড়ে থেকে পাঁশকুড়ো পর্যন্ত খাল কেটে একটি জলপথ নির্মাণ করা

হোক এবং পাঁশকুড়ো থেকে তমলুক ও মেদিনীপুর পর্যন্ত চলাচলের ভালভাবে রাস্তা করে দিলেই এ জেলার উৎপন্ন ফসল বড় বড় আড়তে পৌঁছোবার সঙ্গে ভাল দামও মিলতে পারে। বোর্ড অফ রেভেনিউ-এর যেখানে আপত্তি ছিল নদীর জলের পলি পড়ে খাল সহজেই মজে যাবার সম্ভাবনা, সেখানে বেইলী সাহেবের যুক্তি ছিল, নদীর ধারে খালের মুখে স্লুইশ গেট বসালেই তো ল্যাটা চুকে যেতে পারে।

বেইলী সাহেব উলুবেড়ে থেকে পাঁশকুড়ো পর্যন্ত খাল খননের প্রস্তাব দিয়েছেন, কিন্তু তার আগেই উলুবেড়ে থেকে কোলাঘাট পর্যন্ত ওড়িশা ট্রাঙ্ক রোডের পাশাপাশি একটি খাল বর্তমান ছিল। ঐ রাস্তাটি তৈরীর সময় পাশাপাশি মাটি কাটার ফলে সেটাই সে সময় এক খালে পরিণত হয়েছিল। ৪ঠা জুলাই, ১৮২৯ তারিখের বাংলা সমাচারপত্রে যে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে যে জল-পথটির প্রসঙ্গ আছে, মনে হয় সেটি ট্রাঙ্করোডের ধারেই সৃস্ট খাল। তাতে লেখা হয়েছিল," ...শ্রীল শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর উলুবেড়ে হইতে মহেশডাঙ্গা পর্যন্ত এক খাল খনন করিয়াছেন প্রায় বৎসরাবধি নৌকাদি তাহাতে গমনাগমন করিতেছে সংপ্রতি রাজকর্ম্ম সম্পাদক কর্ত্তৃক এই নিয়ম স্থাপন হইয়াছে যে সেই খাল হইয়া নৌকাদি গমনাগমন করিলে নৌকাতে দাঁড় থাকিবেক প্রত্যেক দণ্ডে দুই আনা পরিমাণে কর লইবেন এই কর্ম্মনির্বাহ জন্য তথায় কএকজন আমলা নিযুক্ত হইয়াছে এবং পূর্বোক্ত নিয়মে করগ্রহণ করিতেছে।"

যাই হোক্, বেইলী সাহেব সম্ভবতঃ এই খালের উদাহরণ থেকেই জলপথ নির্মাণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু তিনি ১৮৫২ সালে জেলা থেকে অন্যত্র বদলী হয়ে যাওয়ায় এ জলপথ পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্পর্কে তেমন উচ্চবাচ্য হয়নি। কিন্তু ঐ শতকের ষাট সাল নাগাদ দেখা যাচ্ছে, সরকার উলুবেড়ে থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত একটি জলপথ নির্মাণের ও সেই সঙ্গে পরিচালনার ইজারা দিয়ে বসেছেন 'ইস্ট ইণ্ডিয়া ইরিগেশন অ্যাণ্ড ক্যানাল কোম্পানি' নামে এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে। সরকারে যথোপযুক্ত রাজস্ব আদায় মোতাবেক জলপথে নৌকো চলাচল বাবত টোল আর জলসেচের জন্য জলকর আদায় মারফৎ ব্যবসা চালানোই এই কোম্পানির উদ্দেশ্য। এ জলপথের নাম দেওয়া হল, মেদিনীপুর টাইড্যাল ক্যানেল, যা চলতি কথায় রূপান্তরিত হল মেদিনীপুর ক্যানেল বা খাল নামে। ১৮৬০-৬২ সালে পরিকল্পনামাফিক উলুবেড়িয়ার হুগলী-ভাগীরথীর সঙ্গে যোগ করে খাল কাটার কাজ সুরু হল, যা এসে শেষ হল দামোদরের তীরে

প্রসাদপুরে। তারপর আবার কুলতেপাড়ার কাছে দামোদর পেরিয়ে প্রসারিত হল রূপনারায়ণের তীরে কাঁটাপুকুরে। রূপনারায়ণ নদের ওপারে মেদিনীপুরের দেনান থেকে স্বরু হয়ে খালের যোগ হল পাঁশকুড়ায় কাঁসাই নদীতে। সেখান থেকে সোজা পশ্চিমে মেদিনীপুর শহরের কাছে মোহনপুরে কাঁসাইয়ে পড়ে শেষ হল। ১৬৩/৪ মাইল বিস্তৃত ছোটখাটো শাখা প্রশাখা নিয়ে এ খালের অবশেষে দৈর্ঘ্য দাঁড়ালো মোট ৬২৩/৪ মাইল। তার মধ্যে দেনান থেকে পাঁশকুড়োর দৈর্ঘ্য ১২ মাইল এবং পাঁশকুড়ো থেকে মেদিনীপুরের দৈর্ঘ্য দাঁড়ালো ২৫ মাইল। প্রতিটি নদীর সংযোগস্থলে বসানো হল উপযুক্ত স্লুইস গেট। পাঁশকুড়ো ও মোহনপুরের কাছে কাঁসাইয়ের সংযোগস্থলে বসানো হল আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে এ্যানিকেট যার উদাহরণ আজও দেখা যায়। খাল খননের কাজে শুধু বিলেত থেকে আমদানী লোহার জিনিষপত্র বা সাজসরঞ্জামই নয়, সেখান থেকে এ বিষয়ের দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারদেরও আনা হল। লোককবিদের গানে এমন দুজন ইঞ্জিনিয়ারের নাম যে অক্ষয় হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ এই গানে : 'কাঁসাই নদী বাঁধলো ইংরেজ বাহাদুরে। পামার কিমার দুজন এসে রাখল খ্যাতি সংসারে ॥'

এমন সব বড় কাজে অনেক বাধা বিপত্তি দাঁড়ায়। তবে সে সময় এ খাল কাটানোর কাজে কোন অস্থবিধে বা বিঘ্ন ঘটেছিল কিনা তা জানা না গেলেও, এই ক্যান্যাল কোম্পানির কার্যরত এক তরুণ ইঞ্জিনিয়ার যে শেষপর্যন্ত তার দেশে ফিরতে পারেননি, এদেশেই তার দেহ রেখেছিলেন, তেমন সাক্ষ্য রয়ে গেছে এক সমাধি ফলকে। আজও হাওড়া জেলার কাঁটাপুকুরের স্লুইস গেটের কাছে কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করা এক সমাধির উপর পাথরের ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে এই কটি কথা :

"1864

SAC IS CD

To

The memory of

WILLIAM AUGUSTUS KERR

Mechanical Engineer

E. I. IRRIGATION & CANAL CO.

Who died at this place

on 14th. October, 1864

Aged 33 years.

—o—

To the Lord our God belong
mercies and forgiveness though
rebelle against him.
Erected by his surviving
Sister and brothers."

কিন্তু পরিকল্পনা শেষ করতে কোম্পানির আর্থিক সাধ্যে কুলোলো না। শেষ পর্যন্ত কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে পড়ল। বাধ্য হয়ে সরকার এই জলপথ নির্মিতি-কোম্পানির কাছ থেকে কিনেই নিলেন এবং আরও প্রায় এককোটি টাকা বিনিয়োগ করলেন এটির পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণে।

যাই হোক্, জলপথ নির্মাণের কাজ অবশেষে শেষ হল ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে এবং নানা পরীক্ষার পর তা চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হল ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। অতঃপর কোম্পানি-তথা-সরকারের ব্যবসা শুরু হল নৌকো পিছু টোল আদায়ের মাধ্যমে। আপ-ডাউন টিকিট করা হল যথাক্রমে সাদা আর লাল রঙের টিকিট দিয়ে। বোঝাই নৌকো আর খালি নৌকোর ভাড়া আলাদা করা হল। নৌকোর মাঝি মল্লারা কিন্তু টোল দিয়েই নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তাদের কাছ থেকে টোল-কালেক্টর বাবুরা জোর করে 'তহুরী' আদায় করতে কসুর করলো না। তাছাড়া 'তহুরী' নামের 'ঘুস' আদায় না দিয়ে কোন উপায়ও ছিল না। জলপথে কোলকাতা থেকে গেঁওখালি ঘুরে বহুসময় ও অর্থব্যয় করে এখন আর কোলাঘাট আসতে হয় না, অতি সহজেই এখানে পৌঁছে ঘাঁটাল বা মেদিনীপুর যাওয়া যায়। তাছাড়া মালপত্রও সহজে আনা বা পাঠানোরও খুব সহজ উপায়। তাই 'টোল' করের উপর তহুরির বিষফোঁড়া প্রায় সকলেরই গা সওয়া হয়ে গেল। কোম্পানির নতুন খনিত এই দীর্ঘ জলপথে চলতে লাগলো নানান নৌকো আর তার সঙ্গে বহুরকমের লটবহর ও লোকলস্কর; ফলে টোল আদায়ের ব্যবসা জমজমাট। অন্যদিকে চলাচলের সুবিধে হওয়ায়, বিশেষ করে কলকাতার সঙ্গে জলপথে যোগাযোগের জন্যে বহু বর্ধিষ্ণু পরিবার উঠে এসে বসতি করলেন খালের ধারের কাছাকাছি বাস্তুতে। জায়গায় জায়গায় খাল পারাপারের জন্যে কোম্পানি দুদিকে দড়ি

বাঁধা এক ধরনের সমতল চৌকো মাপের 'বোট'ও বসিয়ে দিল।

তবে মেদিনীপুর ক্যানেলটিকে চলাচলের যোগ্য রাখার জন্যে সরকারের চেষ্টার কমতি ছিল না। মাঝে মাঝে নৌকো চলাচল বন্ধ রাখতে হয়েছে পলি সরানোর জন্যে। ফোর্ট উইলিয়াম থেকে জারী করা ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৯ তারিখের এক নোটিশে বেঙ্গল ইরিগেশন বোর্ডের অ্যাসিস্টান্ট চীফ ইঞ্জিনিয়ার, ডি. বি. হর্ন জানাচ্ছেন, খালের পলি সরানোর জন্য ১৫ই মার্চ থেকে ৩১শে এপ্রিল পর্যন্ত এই দেড় মাস দেনান থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত খালে নৌকো চলাচল বন্ধ থাকবে।

কিন্তু এত করেও বাধ সাধলো প্রকৃতি। হাওড়ার দিকে কাঁটাপুকুরের কাছে রূপনারায়ণে ক্রমশঃ চড়া পড়তে শুরু করেছে। কোলকাতা বা উলুবেড়ে থেকে আগত জলযানের পক্ষে এই খাল দিয়ে রূপনারায়ণে আসা ক্রমশঃ কষ্টকর হয়ে পড়ছে। কোলকাতার দিক থেকে নৌকো আসা সেই কারণে কমতে শুরু করেছে, ফলে টোল আদায়ে ঘাটতি হয়ে লোকসানের দিকে চলেছে। সরকার তবু শেষ চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে জলপথটিকে সব রকমের নাব্য রাখার জন্যে ; কিন্তু অন্যদিকে ১৯০০ সাল নাগাদ আবার বাদ সেধেছে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানি তাদের রেলপথ বসিয়ে। সহজেই যখন এবার রেলগাড়িতে যাওয়া যেতে পারে, তখন আর জলপথে যাওয়ার আগ্রহ কেন ? ফলে রেলপথে গাড়ি চলাচলের দরুণ জলপথ ব্যবসায়ে ধীরে ধীরে এইভাবে ইতি হয়ে গেল। শুধু পড়ে রইলো দীর্ঘ খালটির এক কঙ্কাল, যা বর্ষায় স্ফীত হয়, অন্যসময় প্রায় শুকিয়ে থাকে।

কিন্তু সরকার তাতেও দমে গেলেন না। উনিশশো সালের প্রথম দিকে রেলগাড়ি চলতে শুরু হয়েছে, তাই জলসেচের কাজে লাগালেন খালটিকে। মাদপুরের কাছ থেকে অসংখ্য খাল-নালা যোগ করে সেচের জল দেবার বন্দোবস্ত করলেন। ১৯০৩ সাল নাগাদ খড়্গপুর ও ডেবরা থানায় এইভাবে জলকর আদায়ের পাকাপোক্ত অফিসও বসেছিলো। শেষ পর্যন্ত মেদিনীপুর ক্যানেল থেকে সেচের জল সরবরাহ হয়ে ক্যানেলের নামটি মুছে যেতে যেতেও রয়ে গেল। এরপর বহু অংশ বেহাত হয়ে গেল, যেমন দেনান থেকে মেছেদা পর্যন্ত অংশটি চলে গেছে কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ার ষ্টেশনের জলাধারের প্রয়োজনে। এই হোল খালটির শতবর্ষের বিষন্ন ইতিহাস।

১৩. বি. এন. আর থেকে এস. ই. আর

১৮৫৪ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর, পশ্চিমবঙ্গের সভ্যতার ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। কারণ এই তারিখেই ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি তাদের বাষ্পীয় শকট চালু করলো হুগলী-ভাগীরথীর ধারে একটা অখ্যাত গ্রাম হাড়িয়াড়া থেকে। কে জানতো এই হাড়িয়াড়া গ্রাম একদিন ভবিষ্যতের খাতায় 'হাওড়া' নামে বিখ্যাত হবে? হাড়িয়াড়া গ্রামে রেল কোম্পানি যদি ষ্টেশন না বসাতো তাহলে আজকের 'হাওড়া' নাম বাংলার অজানা-অখ্যাত আর পাঁচটা গ্রামের সঙ্গেই একাত্ম হয়ে বেঁচে থাকতো সেই অবহেলিতের খাতায়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ব্যবসা যখন অর্ধশতাব্দী পার হয়ে গেছে, তখন দৃশ্যপটে এলেন আর এক সমগোত্রীয় রেল কোম্পানি। ইংরেজ বণিকের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির এবং সেইসঙ্গে তীর্থযাত্রীদের স্থবিধের জন্য রেল পরিবহন ব্যবসায়ে লাভের ভবিষ্যৎ ভাল ভেবেই বিলেতের ১৩২নং ওল্ড ব্রড্ ষ্ট্রীটের গ্রেশাম হাউসে জন্ম হোল বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানির। কোম্পানি-রেজিষ্ট্রেশন মতে এই বি. এন. আর. কোম্পানির জন্ম তারিখ ১৮৮৭ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী। প্রথম চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর হলেন কে. সি. এস. আই এবং কে. সি. আই. ই. খেতাবধারী স্যার টি. আর. ওয়াইনি। ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ছত্রিসগড় ষ্টেট রেলওয়ের দেশীয় রাজারাজড়ার মালিকানার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন করে পত্তন হোল এই খাস বিলেতী কোম্পানির। নাগপুর থেকে বাংলার সঙ্গে একদিন দুঃসহ যন্ত্রণার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল মারাঠা বর্গীদের দৌলতে; আজ আবার সাহেবদের দৌলতে সেই সম্পর্ককে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের লাইন পাতার কাজ যেমন শুরু হয়েছিল হাড়িয়াড়া ওরফে হাওড়া গ্রাম থেকে, বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের কাজ তাই শুরু হোল নাগপুরের দিক থেকে।

নিস্তরঙ্গ গ্রামজীবনের বুকে একদিন চাঞ্চল্য উঠলো। ততদিনে রেলের লাইন নাগপুর থেকে পাতা হতে হতে এসে বাংলার সীমানায় ছুঁই ছুঁই করছে।

১৮৯৬ সাল নাগাদ নোটিশ পড়লো হাওড়া-মেদিনীপুরের রায়ত, চাষী আর জোতদারদের উপরে। জমি দখলের নোটিশ; ঘর-দোর থাকলে তা ছেড়ে পথে বসবার হুকুম। বেঙ্গল নাগপুর রেল বিস্তারের জন্যে ইংরেজ সরকারের জমি দখলের নোটিশ কি না? কারুর কোন আপত্তি থাকলে এলাকার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে হাজির হয়ে 'তোমাদের' বক্তব্য জানাতে হবে.। খাস সাহেবের রাজত্বে তখন নোটিশ-পরোয়ানায় 'আপনি' বলার রেওয়াজ নেই—পদানত নেটিভদের কাছে তাহলে যে জাত যাবে। তাই তুমি যদি বাগনান থানা এলাকার বাসিন্দা হও, তাহলে চঁদপুর সাকিনের কোন এক বাগানবাড়ীতে বসবে সাহেবের কাছারী—সেখানে এসে বলতে হবে তোমার দাবী দাওয়া। এইসব নোটিশের কপি এখনও আছে জমি হারানো মানুষদের কাছে, তাদের দরকারী কাগজের ছেঁড়া পুট্‌লীতে।

তারপর একদিন শুরু হোল হাজার হাজার কুলি-কামিন্ আর লালমুখো ওভারশীয়ার সাহেবদের আনাগোনা। যেন পঙ্গপাল পড়ার মত। কেউ কেউ বলতে লাগলো—পশ্চিমের নাগপুর অঞ্চল থেকে বর্গীরা এসেছিলো—এরাও কি সেই বর্গী নাকি? ইংরেজী ১৯০০ সাল নাগাদ মাটি পড়তে শুরু হোল পশ্চিম থেকে পুব বরাবর। ব্রিটিশ সাহেবদের রাজত্ব বলেই ন্যায় অন্যায়ের কোন বাদ বিচার রইলো না। বিঘে ভুঁই জমির মাত্র পাঁচ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় দেওয়ার আগেই আরম্ভ হোল কোম্পানির রেলের বাঁধ তৈরীর কাজ। যে জমি কোম্পানি দখল নেয়নি এমন জমির উপরও রেলের মাটি-কাটা শ্রমিকরা জোর জবরদস্তি করে মাটি কাটতে শুরু করলো। ক্ষতিপূরণ দেবার অজুহাতে চাষীদের সদ্য বোনা ধান নষ্ট করে দিতে কুণ্ঠিত হ'ল না। একটা অসহায় চাপা হাহাকার ঘুরে ফিরতে লাগলো, জমিহারা, গৃহহারা এবং সম্বলহারাদের মধ্যে। গরীব প্রজাদের কেউ কেউ আপত্তি করতে যেয়ে সাহেব ওভারশীয়ারদের কাছ থেকে চপেটাঘাত আর গলাধাক্কার পুরস্কার পেলো। মহারাণীর রাজত্বের আইন পরখ করার জন্যে প্রজারা তখন অসহায় হয়ে দরবার করলো কোর্ট-কাছারীতে আর জজ-ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতে। আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালায় (নবাসন, বাগনান, হাওড়া) রক্ষিত এমন ধরনের আবেদন-নিবেদনের বহু কাগজপত্র আজকের সাক্ষী হয়ে রয়েছে সেই রেললাইন পত্তনের জোর জুলুম কাহিনীর—সেই চোখের জল ফেলার ইতিহাসের।

শুধু একটিমাত্র রেললাইন পাতা শেষ হোল ; ব্যবসায়িক প্রয়োজন বুঝে এবং স্থানীয় জমিদারবাবুদের পরামর্শমত জায়গায় জায়গায় ষ্টেশনও তৈরী হোল। তারপর একদিন সত্যি সত্যি রেলগাড়ীও এসে হাজির হলো। সভ্যতা বিস্তারের বিজয়পর্বে কত লোকের মাথার ঘাম ও বুকের রক্ত ঝরে পড়লো তার হিসেব কে আর রেখেছে। ১৯০১ সালের গোড়ার দিকে হুঁইশেল বাজিয়ে যেদিন প্রথম রেলগাড়ী চললো, গ্রাম-গ্রামান্তরের লোকেরা এসে জড়ো হোল সভ্যতা আমদানীর রথ রেলগাড়ী নামক যন্ত্রদানবকে দেখতে। এমন অত্যাশ্চর্য জিনিষ দেখানোর সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলো না রেল কোম্পানির দিশী কর্মচারীরা। খুব কাছে থেকে রেলগাড়ী দেখতে চাইলে দু'পয়সা দিতে হবে, আর যদি ইঞ্জিনের গায়ে হাত দিয়ে দেখতে চাও তাহলে দিতে হবে এক আনা ; আর তার উপরে চাও যদি কি রেলে চাপতে—তাও পাবে দু' আনা নগদ ফেললে। আজও বৃদ্ধেরা সেই পুরানো পর্বের ইতিহাস সরল মনে স্মরণ করে নিঃশ্বাস ফেলেন।

তারপর পুরোপুরি রেলগাড়ী চালু হোল। সকলেই এবার চাপতে পারবে। রেলগাড়ীতে পাগড়ী মাথায় টিকিট-মাষ্টারবাবু গাড়ীতে বসেই টিকিট দেবে—ঠিক আজকের বাসের কণ্ডাক্টরের মতো। এই ভাবেই ১৯০৭ সাল থেকে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানির রেলগাড়ী চালু হোল নাগপুর থেকে হাওড়া পর্যন্ত।

কিন্তু এক ব্যবসাদার আর এক ব্যবসাদারকে সহ্য করবে কেন ? হাওড়ায় বি. এ. আর-এর নিজস্ব কোন প্লাটফরম নেই। সেজন্য হাওড়ার ষ্টেশনে বি. এন. আর কোম্পানিকে ভাড়া দেওয়া হোল মাত্র দুটো প্লাটফর্ম। ভাড়া নেওয়ার আগে উপযুক্ত সেলামীও কিন্তু দিতে হোল বি. এন. আর কোম্পানিকে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের নৈহাটি-ব্যাণ্ডেলের জুবিলী ব্রীজ তৈরীর খরচ-খরচা যোগাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বি. এন, আর কোম্পানি হাওড়া ষ্টেশনে কোনমতে ঠাঁই পেলো ; কিন্তু অধিকার পেলো না। তাই সেসময় রামরাজাতলায় বি. এন, আর-এর টিকিট-চেকিং ষ্টেশন হোল ; যা চেক করার বা আদায়-উশুল করার সব এখানেই শেষ করতে হবে। অবশেষে রামরাজাতলা হয়ে উঠলো টিকিট চেকার আর টিকিট কালেক্টরদের রাজ্য। আর রামরাজাতলায় বি. এন, আরের রামরাজ্য এইভাবেই একদিন গড়ে উঠলো।

তারপর একদিন দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। যে রেল লাইনের অষ্টোপাশের

বন্ধনে সারা ভারতকে বেঁধে রাখার চেষ্টা করেছিল ইংরেজ কোম্পানি—তা শিথিল হয়ে চলে এল গণতান্ত্রিক দেশীয় সরকারের হাতে। বড় বুর্জোয়া, ছোট বুর্জোয়া, পেতি বুর্জোয়া আর গরীবী জনসাধারণের তফাৎ বোঝাবার জন্যে যে ১ম শ্রেণী, ২য় শ্রেণী, মধ্যম শ্রেণী আর ৩য় শ্রেণীর বিধান করেছিল ইংরেজ—তার অদলবদল হয়ে গেল স্বাধীন রাজত্বে। আর সেইসঙ্গে বদল হোল তার আসল নামের। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের নাম তুলে দিয়ে হোল সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে। প্রশাসনিক কারণে, পরে দিনকতকের জন্য হল ইষ্টার্ণ রেলওয়ে এবং পরিশেষে সেই পুরাতন নামই বহাল রয়ে গেল, যা আজও চলেছে। এই হোল ভাঙ্গাগড়ায় বি. এন. আর থেকে এস. ই. আর।

কিন্তু নাম পরিবর্তন হলে কি হবে? লোককবির দুঃখের গান যে থামে না তার সেই পুরাতন বি. এন. আর-কে নিয়ে। কৌশল্যা গ্রামের লক্ষ্মণচন্দ্র নাটুয়া একদা রেললাইন আর সেইসঙ্গে খড়্গপুর শহর নিয়ে যে গান বেঁধেছিলেন, তা আজও অমর হয়ে রয়েছে শহর পত্তনের স্মৃতি চিত্রণে:

"প্রভু খড়্গেশ্বর, খড়্গপুর সহর,
করলেন মনোহর, থেকে খড়্গপুরে।
বাবার মহিমা অপার, করতে খড়্গপুর প্রচার,
দিলেন কার্য্যের ভার বি. এন. আরে ধরে॥
যেই স্থানে পূর্ব্বে ছিল শালবন,
সেখানে করলেন পুষ্পের কানন,
জাতি যুথী, আদি পুষ্প অগণন,
গন্ধে প্রাণ মন আনন্দিত করে॥
পর্ণের কুটির ছিলনা যেথানে,
দোতলা তেতলা করালেন সেখানে,
তথা দিবা রাতি জলছে বিজলি বাতি,
ইলেকট্রিক ফ্যান ঘুরছে প্রতি ঘরে॥
বাঘ ভালুক যথা ডাকিত সুস্পষ্ট,
তথায় করালেন তার অফিস পোষ্ট,
শুভাশুভ কষ্ট, অথবা অনিষ্ট,
হয় সর্ব্ব নষ্ট, খবর করে তারে॥

হিংস্রক জন্তু যথা নাশিত জীব নানা,
তথায় পুলিশ থানা, আর নানান্ কারখানা,
সদাই দিবা রাতি খাটছে বহু জনা,
করছে বাবুয়ানা খাচ্ছে অন্ন করে ।।

দয়াময় প্রভুর অসীম করুণা,
করিলেন সেখানে তিনটি ডাক্তারখানা
ব্যাধি গ্রস্ত লোক এসে বহু জনা,
জীবন পায় তারা দুর্ব্যাধির করে ।।

পালসাঁড় আদি আটটি পুকুরে,
তুলে নিয়ে জল মাটি দিল ভরে,
জলের জন্য কূপ করলেন গোকুলপুরে,
নল বেয়ে জল ঘুরিছে শহরে ।।

সদা যথা ছিল দস্যুগণের মেলা,
ষ্টেশন করে সেথা করলেন নরের মেলা,
ম্যাজিক, বায়স্কোপ, সার্কাস, আদি খেলা,
হচ্ছে নিত্য নিত্য নানান্ প্রকারে ।।

এমন দয়াল প্রভু কে হবে জগতে,
পাপী তাপী জনে উদ্ধার করিতে,
এনে দিলেন ট্রেণ তীর্থস্থানে যেতে,
সেঁই নরনারী তীর্থে যেতে পারে ।।

কালকাটি গ্রামে বাস ছিল মজার,
তুলে নিয়ে তথা করলেন গোলবাজার,
এণ্ট্রান্স স্কুল তাহে করে দেন মজার,
হাজার হাজার ছেলে বিদ্যালাভ করে ।।

লক্ষ্মণ চন্দ্র ভনে, ষ্টেশন আদি যথা,
পঁয়ত্রিশ শত বিঘা মালিক ছিলেন পিতা,
বি. এন. আর গ্রহীতা, পিতা হয়ে দাতা,
বিশ হাজার টাকায় দিলেন বিক্রি করে ।।"

তবে কি লোককবি বি. এন. আরের প্রশস্তির বদলে তার জমি হারাবার দুঃখের গান গেয়েছেন ? বিঘেভূঁই আন্দাজ তিন টাকা হিসেবে প্রায় নব্বই বছর আগে রেল কোম্পানি তাঁর পিতার কাছ থেকে জমি কিনেছিলেন খড়্গপুরে ; আজ আর আপনারা কেউ কি তা বিশ্বাস করবেন— ?

১৪. পাঁশকুড়া-গেঁওখালি রেললাইন ও বন্দর

আজকের হলদিয়া বন্দর স্থাপিত হয়েছে হুগলী-ভাগীরথী ও হলদী নদীর সংযোগস্থলে। এই শতকের গোড়ার দিকে একসময়ে এমন ধরনের একটি ছোটখাটো বন্দরের পরিকল্পনা করা হয়েছিল রূপনারায়ণ ও হুগলী-ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল গেঁওখালিতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসকরা সে পরিকল্পনাটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেননি। যদি সে পরিকল্পনা কার্যকরী হত তাহলে আজকে হলদিয়ার বদলে গেঁওখালিই হয়ে উঠতো সেই বন্দর নগরী।

উনিশশো সালের প্রথমদিকে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানির লাইন পাতা শুরু হয়।খড়্গপুরের দিক থেকে লাইন পাতা শুরু হয়ে কোলকাতার দিকে এগোতে থাকে। ঠিক এই সময় কোলকাতার একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ব্যয় সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে জাহাজে করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কয়লা চালান দেওয়ার জন্যে গেঁও-খালিতে একটি বন্দর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আনে। রাণীগঞ্জ-ঝরিয়া অঞ্চল থেকে রেলযোগে কয়লা কোলকাতার বন্দরে না পৌঁছিয়ে গেঁওখালির প্রস্তাবিত বন্দর দিয়ে পাঠানোতে পরিবহন ব্যয় অনেক কমে যায়। তাই পাঁশকুড়ো থেকে একটি রেলের লাইন তমলুক হয়ে হুগলী-ভাগীরথীর লাফ পয়েন্ট অর্থাৎ গেঁওখালি পর্যন্ত বসাবার জন্যে রেল কোম্পানির কাছে আবেদন করা হয়।

সমস্ত পরিকল্পনা হাতে পেয়ে তদানীন্তন বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের এজেন্ট এ সঙ্কলিত বিষয়টিতে বেশ গুরুত্ব আরোপ করেন। রেল কোম্পানির উদ্দেশ্য যখন রেলপথ ব্যবসা থেকে লাভ করা এবং পরিকল্পনাটিও যখন লাভজনক হবার সম্ভাবনা তখন পাঁশকুড়ো থেকে 'লাফ' পয়েন্ট—এই পঁচিশ মাইলব্যাপী রেল-

পথ বসানোয় তাঁদের অসম্মতির কোন কারণ থাকতে পারে না। এরপর সমস্ত পরিকল্পনাটি বিশেষ করে তদানীন্তন ভারত গভর্ণমেন্টের নিযুক্ত এক কমিশনের কাছে সমীক্ষার জন্য গেল। কমিশনের সভ্যরা এই পরিকল্পনায় গুরুত্ব তো দিলেনই না, উপরন্তু তাদের রিপোর্টে এই পরিকল্পনাকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিয়ে শেষে মন্তব্য করা হল, এই পরিকল্পনা যদি হাতে নিতেও হয় তবে ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত সে বন্দরটির যাবতীয় কর্তৃত্ব কিন্তু ছেড়ে দিতে হবে পোর্ট কমিশনারের হাতে।

কয়লা চালানি কোম্পানি অবশেষে 'সর্বস্ব তোমার চাবিকাঠিটি আমার'—এ প্রস্তাবে সায় দিতে পারলো না। তাই বিষয়টির এইখানেই ইতি হয়ে গেল। বন্দর তৈরীর যুক্তি নিয়ে ঐ কয়লাচালানী কোম্পানি বা বি. এন. আর কোম্পানি ভবিষ্যতে আর তদ্বির করেননি বা সংবাদপত্রের স্তম্ভে সরকারী নীতির কোন সমালোচনাও করা হয়নি। অবশ্য তখন যদি এই পরিকল্পনা সফল হত তাহলে আজকের এই হলদিয়ার বদলে গেঁওখালিই হয়ে উঠতো সেই বন্দরনগরী। অবশ্য হলদিয়া পরিকল্পনার আগে গেঁওখালিতেও সেই সম্ভাব্যতা আছে কিনা, তা নিয়ে যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে হয়নি—এমন নয়।

১. দীঘা-বেলদা রেললাইন

কয়েক বৎসর পূর্বে আনন্দবাজার পত্রিকায় (১০,৩,১৯৭৫) যে সংবাদটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা হল, দীঘা পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের এক প্রস্তাব। ঐ পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধি সেজন্য যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তার সারাংশ হল, কন্টাই রোড ষ্টেশন থেকে দীঘা পর্যন্ত রেললাইন বসানো হ'লে, শুধু সমুদ্রসেবীরাই নন্, কাঁথীগামী বহু বাসযাত্রীদেরও উপকার হবে।

কিন্তু এ প্রস্তাবটি আকর্ষণীয় হলেও নতুন কোন প্রস্তাব নয়। আজ থেকে প্রায় আশী বছর আগে কাঁথির জনসাধারণের পক্ষ থেকে এমন ধরনের এক প্রস্তাব উঠেছিলো যার মর্মার্থ, দীঘা পর্যন্ত রেললাইন চাই। ইতিহাসের ছিন্ন-পত্র থেকে আহরিত সেই অবিশ্বাস্য কাহিনীর বিবরণ নিম্নরূপ :

এ ইতিহাস শুরুর আগে আমাদের ফিরে যেতে হবে এই দশকের গোড়ার দিকে সেই বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের পুরী-মাদ্রাজ শাখার রেললাইন পাতার সময়ে। তখনই রেল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, কন্টাই রোড ষ্টেশন (বেলদা) থেকে আর একটি শাখা লাইন কাঁথি শহর পর্যন্ত বসানো হবে। সেইমত ১৯১০ সাল নাগাদ কোম্পানীর পক্ষ থেকে কাঁথি পর্যন্ত রেললাইন বসাবার জরীপ কাজ শুরু হয়ে যায়। অধীর আগ্রহে জনসাধারণ পরবর্তী অধ্যায়ের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু তারপরেই প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় এই পরিকল্পনা একেবারে বাতিল না হলেও সাময়িকভাবে ধামা-চাপা পড়ে যায়। তারপর বিশ সাল নাগাদ এই পরিকল্পনার কাজ আবার নতুন করে স্বরু করা হয়। ১৯২২-২৩ সালে আবার যখন নতুন করে এই সম্পর্কে জরীপের কাজ শুরু হয় তখন কাঁথিবাসীরা দাবী তোলেন যে, এই রেলপথ দীঘা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হোক। ১৯২৩ সালের ২০শে নভেম্বর তারিখে কাঁথির স্থানীয় সাপ্তাহিক 'নীহার' পত্রিকায় এই সম্পর্কে যুক্তি দিয়ে লেখা হয় যে, বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের গ্রীষ্মাবাস দীঘা এবং কলিকাতা প্রবাসী শ্বেতাঙ্গগণ একসময় হিজলী-খেজুরীতে তাদের স্বাস্থ্যনিবাস গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তী সময়ে পুরীতে সমুদ্রবায়ু সেবনের জন্য অসুবিধে হওয়াতে তারা কাঁথির পাঁচ মাইল দূরে জুন-পুটে সমুদ্রবিহারের জন্য জল্পনা করে। স্বতরাং কাঁথি পর্যন্ত যখন বি, এন, আর কোম্পানি রেললাইন বসানোর জন্যে জরীপ স্বরু করেছেন তখন এইটি বর্ধিত করে দীঘা পর্যন্ত রেললাইন বাড়িয়ে দেওয়া হোক এবং তাহলে শ্বেতাঙ্গ সমুদ্রসেবীদের এবং বিশেষ করে স্থানীয় জনসাধারণের খুবই উপকার হয়।

হয়ত সে সময় দীঘা পর্যন্ত রেললাইন বসে যেত এবং জরীপ মতো কোলকাতা থেকে দীঘা ১২৬ মাইল দূরত্বের স্ববিধের জন্যে দীঘায় শ্বেতাঙ্গদের স্বাস্থ্যনিবাসও গড়ে উঠতো যথারীতি। কিন্তু কি কারণে যে এই প্রস্তাবিত রেলপথটির পরি-কল্পনা বাতিল হয়ে যায় তা জানা যায়নি। তবে মনে হয় সে সময় বিখ্যাত জননেতা বীরেন শাসমলের নেতৃত্বে একুশ-বাইশ সালে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যে তীব্র সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্বরু হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ শাসকরা নেটিভ-দের জব্দ করার জন্যে রেল কোম্পানিকে শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনায় রূপ দেবার অনুমতি দেননি। আর তা হলে, পরবর্তীকালে বিধানবাবুর মানসপুত্র দীঘা সৃষ্টির কৃতিত্ব কি আমরা আজ উপলব্ধি করতে পারতাম, না পরবর্তী স্বাধীন রাজত্বে 'মেছেদা-দীঘা' রেললাইন সম্প্রসারণের জন্য এত টালবাহানার নাটক দেখতে পেতাম?
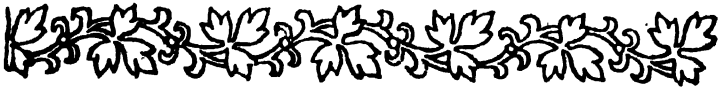
১৬. দীঘা পরিকল্পনার সাধক কে?

পশ্চিমবাংলার ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের একটি ছবি দেখে-ছিলাম সরকারী প্রচার দপ্তরের এক পুস্তিকায়। সে ছবিতে আছে দীঘার সমুদ্র-তটে দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশির দিকে তাকিয়ে আছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, চোখে মুখে তাঁর সৃষ্টির আনন্দের ছাপ; পরিতৃপ্তির আবহাওয়ায় দাঁড়িয়ে তাঁর মানস পুত্রকে তিনি অবলোকন করছেন। দেশের লোকের কাছে আজ তিনি 'দীঘা' সৃষ্টির অবতার। সমুদ্রের ধারের নোনা হাওয়ায় 'দীঘা টুরিষ্ট পার্টি' এই সৃষ্টিবৈচিত্র্যে মুগ্ধ হয়ে যে প্রতিষ্ঠাতার প্রতি 'যুগ যুগ জিও' ধ্বনি মনে মনে দিয়ে থাকেন একথা স্বীকার করতে কোন বাধা নেই।

কিন্তু একটা পুরোনো সংবাদের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। আজ থেকে চুয়াল্লিশ বছর আগের সে সংবাদটি যেমন ছিল তেমনটি তুলে দেওয়া হল। 'বাংলাদেশে এক হাজার মাইলের অধিক সমুদ্রতট আছে, কিন্তু তথাপি বাংলাদেশের লোকদের জন্য সমুদ্রতীরে কোন স্বাস্থ্যনিবাস নাই। পুরীতে লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশী হইয়াছে। দার্জিলিং থাকা ব্যয়সাপেক্ষ ও উচ্চস্থান যাহাদের স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগী নয়, তাহাদের পক্ষে ঐ স্থানের আবহাওয়া সহ্য হয় না। এই বিষয় বিবেচনা করিয়া বাংলাদেশে সমুদ্রতীরবর্তী একটি স্বাস্থ্যনিবাসের নিতান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে।

মেদিনীপুর ভূতপূর্ব কালেক্টর ও বাংলা সরকারের বর্তমান রাজস্ব সেক্রেটারী মিঃ বি. আর. সেন. আই-সি-এস মহোদয়ের উদ্যোগে বাংলা গভর্ণমেন্ট বাংলার লোকের জন্য সমুদ্রতীরে একটি স্বাস্থ্যনিবাস তৈয়ারী করিবার উদ্দেশ্যে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায় সমুদ্র তীরবর্তী দীঘা নামক গ্রামের উন্নয়ন বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। ঐ স্থানে বিস্তীর্ণ সমুদ্রতট থাকায় স্থানটির দৃশ্য অতি মনোরম এবং সমুদ্র তীরবর্তী স্বাস্থ্যনিবাসের উপযোগী নানা প্রকারের সুবিধা আছে। বর্ত-মানে মাত্র কাঁথি-দীঘা নামক একটি রাস্তা দিয়া ঐ স্থানে যাতায়াত করা যায়। কাঁথি রোড্ ষ্টেশন হইতে দীঘার দূরত্ব ৫৭ মাইল। মেদিনীপুর জেলা বোর্ড

এই রাস্তাটি পাকা করিয়াছেন। কিন্তু দীঘা পর্যন্ত যাইতে আরো ১০ মাইল রাস্তা পাকা করিতে হইবে। এই অবশিষ্ট ১০ মাইল রাস্তার ৪ মাইল জেলা বোর্ড নিজ ব্যয়ে পাকা করিতে প্রস্তুত আছেন। যদি গভর্ণমেন্ট অবশিষ্ট ৬ মাইল রাস্তা পাকা করিবার ব্যয় বহন করেন।

যে পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে গভর্ণমেন্ট দীঘা গ্রামে ৫২৬,২৬ একর জমি খাস করিবেন এবং তৎপর প্রয়োজনীয় রাস্তাদি প্রস্তুত করিয়া সুবিধামত প্লট করিয়া ৩২০,৮৩ একর বন্দোবস্ত দিবেন।

এই উন্নয়ন-পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে হইলে সর্বপ্রথমে কাঁথি-দীঘা রাস্তার কাঁচা অংশ পাকা করিতে হইবে, জলসরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী ও স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাও করিতে হইবে। ইহার সহিত ম্যালেরিয়া নিবারণী পরিকল্পনাও থাকিবে। সেজন্য তদন্ত কার্য চলিতেছে।'

এখন মানসপুত্র দীঘার জনক আসলে কে, এবার পাঠক তার বিচার করবেন; উদ্ধৃতিটি ১৯৪২ সালের ২৬শে মার্চ তারিখের 'হিজলী হিতৈষী' থেকে সংগৃহীত।

১৭. বাংলার প্রাচীন সেতু কি মেদিনীপুরে ?

সম্প্রতি ক'লকাতায় অনুষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান রোড্ কংগ্রেস'-এর ৩৮তম অধিবেশন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত ও পূর্ত (সড়ক) বিভাগ যুগ্মভাবে একখানি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থটির নাম 'হাইওয়ে ব্রিজস্ ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল', অর্থাৎ বাংলায় 'পশ্চিম বাংলায় রাজপথ-সেতুসমূহ'। ভূমিকায় পূর্ত বিভাগের মুখ্য বাস্তুকার ও সচিব শ্রীএস. কে. সমাদ্দার লিখেছেন যে, বাংলায় কবে প্রথম সেতু নির্মিত হয়েছিল সে সম্পর্কে যদিও কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই, তবু বলা যেতে পারে খ্রীঃ সপ্তদশ শতক থেকেই সেতু নির্মাণের গোড়াপত্তন হয়। কারণ হিসেবে তিনি লিখেছেন, ইমারতী বাস্তুবিদ্যায় সীমিত জ্ঞানের দরুণ, ইট বা পাথর—দক্ষিণ বাংলায় যেটি সহজপ্রাপ্য তার উপর নির্ভরশীল হয়েই খিলান দিয়ে সেতু নির্মাণ কাজের অগ্রগতি হয় এবং খ্রীঃ উনিশ থেকে বিশ শতকে নির্মিত এমন ভাল খিলেন-সেতুর নিদর্শন এখনও দেখা যেতে পারে ২ নং (গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্) ও ৬ নং (ওড়িশা ট্রাঙ্ক রোড্) রাজপথে।

শ্রীসমাদ্দারের সঙ্গে আমরা একমত যে, প্রাচীন সেতু সম্পর্কে কাগজপত্র অদ্যাবধি থাকার বা পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু এ বিষয়ে প্রাচীন সেতুর নিদর্শন ও ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে যদি পূর্ত (সড়ক) বিভাগ যথার্থ অনুসন্ধান চালাতেন, তাহলে এত সহজেই বাংলায় সেতু নির্মাণ সতের শতক থেকে সুরু হয়েছে—এই অভিমত প্রকাশ করতেন না।

আর সেজন্যই পূর্ত (সড়ক) বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানাতে চাই, পশ্চিম-বঙ্গে যদি কোন প্রাচীন সেতু থেকে থাকে তবে তা হল, মেদিনীপুর জেলার ওড়িশা ট্রাঙ্ক রোডে (যা ৬নং রাজপথ নয়), নারায়ণগড় থানার পোক্তাপোলে কেলেঘাই নদের উপর অধিষ্ঠিত এবং যে সেতুটির গায়ে খোদাই একটি মূর্তিকে 'মল্লিকা' নামে অভিহিত করে :লা বোশেখ বিরাট মেলা বসে থাকে। প্রাচীন বলতে চাই এই জন্যে যে, খড়্গপুর থেকে বেলদা যাবার মুখে কেলেঘাই-এর উপর পাশাপাশি বিভিন্ন রীতিতে নির্মিত দুটি সেতুর মধ্যে প্রথমেই যে সেতুটি পড়ে সেটি সাবেকী হিন্দু স্থাপত্যরীতি অনুযায়ী ঝামাপাথর দিয়ে লহড়া করে ধাপ পদ্ধতিতে গঠিত। এই ধরনের সেতুর বড়ো উদাহরণ রয়েছে বর্তমানের ওড়িশা ট্রাঙ্ক রোড্ বরাবর ওড়িশার যাজপুরে ঝামাপাথরে তৈরী এগার নালা সেতু ও সেইসঙ্গে ঐ একই রাস্তায় পুরীর কাছাকাছি মধুপুর নদীর উপর আঠার নালা সেতু। বলা বাহুল্য, এ'দুটি সেতু ওড়িশা ট্রাঙ্ক রোড্ তৈরীর বহু পূর্বেই ওড়িশার কেশরী বংশের রাজাদের দ্বারা যে খ্রীষ্টীয় এগারো শতকে নির্মিত হয়েছিল এমন ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং কথিত কেলেঘাই-এর উপর পাশাপাশি ঐ দুটি সেতুর মধ্যে পরবর্তী সেতুটি হল গাঁথনিযুক্ত খিলেন সেতু—যার উদাহরণ আলোচ্য পুস্তকের ভূমিকায় শ্রীসমাদ্দার উপস্থাপিত করেছেন।

পশ্চিমবাংলায় আলোচ্য এ সেতুটি কতদিনের পুরাতন তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমতঃ হিন্দু স্থাপত্যের লহড়া পদ্ধতিতে নির্মিত এ সেতুটি ওড়িশা ট্রাঙ্ক রোডের উপর নির্মিত হওয়ায় এর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু এ' ট্রাঙ্ক-রোডটি তৈরী হয়েছে ইংরেজ আমলে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে, ক'লকাতা-পোস্তার অধিবাসী মহারাজা সুখময় রায় মহাশয়ের বদান্যতায়, যার ইতিহাস পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এ রাস্তা তৈরীর বহু পূর্ব থেকেই ওড়িশার সঙ্গে যোগসাধনকারী হিসেবে এটি ছিল এক প্রাচীন পথ। ইতিহাসের গভীরে প্রবেশ করলে জানা যায়, বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে ওড়িশার গঙ্গবংশীয় রাজারা বারো-তের শতকে দক্ষিণ মেদিনীপুরের বেশ কিছুটা অংশ

নিয়ে, মায় হুগলীর গড়মান্দারন পর্যন্ত প্রবল পরাক্রমে রাজ্য চালিয়ে গেছেন। ইতিহাসের উত্থান-পতনে এই সব রাজাদের প্রভুত্বের অনেক নিদর্শন তাই ছড়িয়ে আছে—এই সব অঞ্চলে। সুতরাং অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না যে, নারায়ণগড়ের পোক্তাপোলের ধাপ পদ্ধতিতে নির্মিত এই সেতু সে সময়ে ওড়িশার কোন নৃপতি কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল এবং ওড়িশার রাজাদের নির্মিত এই ধরনের স্থাপত্যরীতির উদাহরণযুক্ত সেতুও ওড়িশার আরও যে দু'জায়গায় বর্তমান—তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া এ অঞ্চলে ওড়িশা নৃপতিদের শাসনকালের পাথুরে প্রমাণও পাওয়া যেতে পারে, আলোচ্য নারায়ণগড়ের পোক্তাপোলের প্রায় দশ-বার কিলোমিটার দূরবর্তী কুরুমবেড়ায়। গগনেশ্বর গ্রামের 'কুরুমবেড়া' নামে কথিত প্রাচীন এক দুর্গের গায়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি উদ্ধার করে 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' প্রণেতা যোগেশচন্দ্র বসু লিখেছেন যে, পঞ্চদশ শতকে ওড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্রদেব এখানে 'গগনেশ্বর' শিবের এক পাথরের মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। সুতরাং ওড়িশা নৃপতিদের কৃত এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে আমরা এতদঞ্চলে তাঁদের আধিপত্য বিস্তারের কথা জানতে পারি। তাই এই সেতু বার শতক থেকে পনের শতকের মধ্যে ওড়িশা রাজাদের আমলে কোন এক সময়ে হয়ত নির্মিত হয়েছিল বলেই অনুমান করা যেতে পারে।

অন্যদিকে কাছাকাছি এই নারায়ণগড়ের রাজাদের গৌরব ছিল রাস্তা নির্মাণে কৃতিত্বের জন্য। ত্রৈলোক্যনাথ পাল রচিত 'মেদিনীপুরের ইতিহাস'-এ তাই লেখা হয়েছে যে, খ্রীষ্টীয় তের শতকে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা গন্ধর্ব শ্রীচন্দন পাল ছিলেন 'মাড়িসুলতান' উপাধিতে ভূষিত, অর্থাৎ তিনি ছিলেন পথের বাদশাহ—যিনি প্রাচীন রাজপথ তথা জনপথের রক্ষক। এই বংশের প্রতিষ্ঠিত কুলদেবী ব্রহ্মাণী দেবীর মন্দিরের পাশ দিয়েই ছিল ওড়িশা যাতায়াতের পুরানো রাস্তা এবং যাত্রাপথে পথিকদের এই ব্রহ্মাণী দেবীর ছাড়পত্র নিয়ে যেতে হত। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে, ব্রহ্মাণী দেবীর মন্দিরের পাশ দিয়ে আনুমানিক তের-চোদ্দ শতকে ওড়িশা যাবার যে পথ ছিল সেই পথে কেলেঘাই-এর উপর সেতুটি নারাণগড় রাজাদের দ্বারাই নির্মিত হয়ে থাকতে পারে।

কিন্তু লিখিতভাবে এই সেতুটির নির্মাণকর্তাদের কোন পরিচয় পাওয়া না গেলেও স্থাপত্য বিচারে এটি যে, খ্রীষ্টীয় তের থেকে পনের শতকের মধ্যে নির্মিত

হয়েছিল—একথা বেশ জোরের সঙ্গেই বলা যায়। অবশ্য পূর্ত (সড়ক) বিভাগ যদি তাঁদের পুরাতন কাগজপত্র ঘেঁটে বা সরেজমিন তদন্ত করে এই সেতুটি সম্পর্কে নতুনভাবে আলোকপাত করেন, তাহলে তাঁরা যে দেশবাসীর একান্ত ধন্যবাদার্হ হবেন—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

১৮. নরহাট থেকে নরঘাট

প্রায়ই খবরের কাগজে দেখা যায়, মেয়ে চালানী ব্যবসার নানাবিধ চাঞ্চল্যকর খবরাখবর। এক্ষেত্রে লুকিয়ে-চুরিয়ে আর ভুলিয়ে-ভালিয়ে মেয়ে চালান করার জন্য ওস্তাদদের বহু কাঠখড় পুড়োতে হয়। কেননা জানাজানি হলে বা ধরা পড়ে গেলে নির্ঘাৎ 'পোব্লিক'-এর হাতে জান নিকলোনা হবার ভয় আছে। কিন্তু এমন যদি হ'ত, মেয়েরা নদীর ঘাটে স্নান করছে বা গ্রামের পুরুষরা মাঠে গেছে, সেই তালে নৌকায় চেপে দস্যুরা এসে গ্রামের ছেলেবুড়ো বা বউঝিদের জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে চালান দেবার জন্যে, অথচ তাদের বন্দুক বা ছোরার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কেউ নেই, তাহলে এমন অবস্থাকে আমরা কি বলতাম? নিশ্চয়ই বলতাম, মগের মুল্লুক। অথচ এদেশে সত্যিই ছিল এমন ধরনের জঙ্গলের রাজত্ব, যা আজও লোকমুখে 'মগের মুল্লুক' নামে সে বিভীষিকার স্মৃতি থেকে গেছে।

আজ থেকে প্রায় তিন-চারশো বছর আগে আরাকানের মগ দস্যুরা পর্তুগীজ জলদস্যুদের সঙ্গে অংশীদার হয়ে গোটা বাংলা জুড়ে যে হিংস্র, নিষ্ঠুর আর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল, ইতিহাসে তার বোধ হয় তুলনা নেই। এদের ভয়ে সুন্দরবনের ও মেদিনীপুর জেলার হুগলী নদীর ধারে অবস্থিত হিজলী-খেজুরীর কাছাকাছি বহু গ্রাম একদা পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল। বাংলার মন্দির-সজ্জায় সামাজিক জীবন সংক্রান্ত যেসব ভাস্কর্য-ফলক দেখে থাকি, তার মধ্যেও এইসব জলদস্যুদের প্রতিকৃতিও যে রূপায়িত হয়েছে তেমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কোন কোন পোড়ামাটির ফলকে এমন বন্দী মানুষ বোঝাই জলযানের চিত্রও উৎকীর্ণ করতে কার্পণ্য করেননি মন্দির-শিল্পীরা। মানুষ শিকারের এমন ভয়াবহ কাহিনী বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যাবার আগে

মন্দির-কারিগররা তার যথাযথ চিত্র হয়ত এইভাবেই ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থানের মন্দির গাত্রে বা বিভিন্ন মিউজিয়মের প্রদর্শনীতে এই ধরনের মৃৎভাস্কর্যের এমন ভুরিভুরি উদাহরণ আজও দেখতে পাওয়া যায়।

সোজা কথায়, এইসব মগ-ডাকাতদের কাজ ছিল জোরজবরদস্তি করে মানুষ ধরে নিয়ে যাওয়া। সেজন্য মাঠেঘাটে ওৎ পেতে থাকতো এইসব লুঠেরারা। নদীর ঘাটে ফাঁকা জায়গায় জল আনতে এসেছে কুলবধুরা, সেই ফাঁকে তাদের ধরেবেঁধে নৌকায় তোলা হ'ত। ছেলেরা পথেঘাটে চলাচল করছে তাদেরও যেমন জোর করে ধরে আনা হ'ত, তেমনি জোয়ান মর্দদেরও লাঠির বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে ধরে আনা হত মাঠ থেকে। দাস-ব্যবসা যখন দেশে চালু রয়েছে তখন রাজ্যের শাসনকর্তারা এ অনাচারে বাধা দিতে তেমন উৎসাহ দেখাতেন না, আর বাধা দিতে গেলে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে বা গুলির ঘায়ে জখম করে তাদের কাজ হাসিলে কোন অসুবিধে ঘটত না। এরপর দড়ি বেঁধে শিকার এনে নৌকোয় তোলা হত। পাছে নৌকো থেকে পালিয়ে যায় সেজন্য তাদের হাতের তালু ফুটো করে তার ভেতর বেতের ছাল তোলা দড়ি ঢুকিয়ে পরপর বেঁধে রাখা হত। পাখীদের খাঁচায় যেমন খাবার ছড়িয়ে দেওয়া হয় তেমনি এই শিকার করা প্রাণীদের সামনে খাদ্য হিসাবে ছড়িয়ে দেওয়া হত শুকনো মুড়ি বা চাল। তারপর এইসব বন্দীদের স্থানীয় হাটবাজারে আনা হত বিক্রীর জন্যে; সেখানে যা কাটতি হত বাকীটা চালান দেওয়া হত পর্তু-গীজদের খাস মুলুক গোয়া কিংবা সিংহলের কোন বাজারে। সেখানে ক্রীতদাস হিসাবে কেনা হয়ে সারাজীবন কাটাতে হত মালিক-ক্রেতার গোলামখানায়। মেয়েদের ভাগ্য সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু না বললেই চলে। ক্রীতদাসী বা যৌনদাসী অর্থাৎ ভোগের সামগ্রী হিসেবে তাদের চাহিদাই ছিল সবার আগে। শুধু বেচাকেনাই নয়, তাদের খ্রীষ্টধর্মে জোর করে দীক্ষা দেওয়া হ'ত, যাতে আর কোনদিন তারা নিজেদের সমাজে ফিরে যেতে না পারে। বিদেশী ভ্রমণকারীরা এইসব মানুষ কেনাবেচায় তাঁদের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, গোয়ার বাজারে যেসব সুন্দরী মেয়ে আমদানী হ'ত, তা সবই বাংলা থেকে চালান আসা। অবশ্য দাস ক্রেতারা খুব বেশী পছন্দ করতো ভারতীয় ক্রীতদাসদের, কেননা তাদের স্বভাব নাকি শান্ত ও প্রভুভক্ত। সুতরাং এই চাহিদাকে কেন্দ্র করে এদেশে মগফিরিঙ্গীদের দৌরাত্ম্য যে স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছিল তাতে আর সন্দেহ কি?

অন্যদিকে, দেশে যখন ক্রীতদাস প্রথা চালু রয়েছে তখন বাংলার হাট-বাজারে মেয়ে-পুরুষ কিনতে পাওয়ার তো কোন অসুবিধে নেই। ১৩২৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যার প্রবাসী পত্রিকায় কালীচন্দ্র ঘোষাল এ বিষয়ে এক কৌতুককর তথ্য দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ক্রীতদাসের হাটে বিক্রীর জন্য নৌকোয় চালান আসা যেসব মেয়েদের আনা হ'ত তাদের বলা হ'ত 'ভারের মেয়ে'। এখানে 'ভার' কথাটির অর্থ হল নৌকো, সুতরাং ভারের মেয়ের মানেই হল নৌকোয় চালান আসা মেয়ে। ভারের মেয়েদের নৌকো যখন ভিড়তো ঐসব হাটেবন্দরে তখন একজন ব্রাহ্মণ তত্ত্বাবধানকারী সেজে ক্রেতাদের কাছে বন্দিনী মেয়েদের রূপগুণ নিয়ে খদ্দেরদের কাছে বর্ণনা করতো। যার যেমন পছন্দ তেমন মেয়ে কিনে তারা চলে যেত। দেখা যেত প্রলোভনে পড়ে কোন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ শেষ বয়সে স্ত্রী বিয়োগের পর এখান থেকে স্বজাতি বলেই কোন কন্যা সংগ্রহ করে বিবাহাদি সেরে নিয়েছেন ; কিন্তু কিছুদিন পরে সদ্য বিবাহিতা ব্রাহ্মণীর আচার-ব্যবহারে সন্দেহ হতে জানা গেল যে, তিনি কোন এক অস্পৃশ্য নিম্নজাতির কন্যা।

গ্রামের হাটেবাজারে যেগুলি বিকোতো না সেগুলি আবার চলে যেত ওড়িশা বা দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য হাটে। কাছাকাছি বেশ চড়া দরে মানুষ বিকোবার হাট ছিল, পশ্চিমবাংলার মেদিনীপুর জেলার তমলুক এবং ওড়িশার বালেশ্বর জেলার পিপলী আর দিয়াঙ্গার হাট। ১৯০৭ সালের এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে সাহাবুদ্দিন তালিশ এ সম্পর্কে যে তথ্যপূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন তা পড়লে শিউরে উঠতে হয়। তিনি লিখেছেন, তমলুকের রাজারা সে সময় তাদের জমিদারী এলাকায় এমন একটি ক্রীতদাস কেনাবেচার হাট বসাবার অনুমতি দিয়েছিলেন, তবে সেটি যে উৎপীড়নের ভয় দেখিয়েই বাধ্য করা হয়েছিল, তেমন মনে হয়। তখন মোগল রাজত্বের শেষ সময়, তদুপরি মগের মুল্লুক চলছে গ্রামে গঞ্জে ; ভয়ে আতঙ্কে দিন কাটছে অসহায় প্রজাদের। রাত্রিতে আগুন জ্বালানো বন্ধ ; কেননা তাই দেখে লুঠেরারা বসতি আছে ঠাহর করতে পারে। সুতরাং সন্ধ্যেবেলায় মেয়েদের তুলসীতলায় প্রদীপ দেওয়া বা নদীর ঘাটে স্নান করতে যাওয়া একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল।

বার বার মগদের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত দেশের মানুষকে বাঁচাবার জন্যে মোগল শাসনকর্তারা যে তেমন চেষ্টা করেননি তা নয়। কিন্তু সব চেষ্টাই বিফলে গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে মগদের আসতে হলে সমুদ্রপথ দিয়ে সাগর

দ্বীপের কাছে হুগলী-ভাগীরথীর মোহনা অতিক্রম করে আসতে হত। কিন্তু সে সময় সুন্দরবন এলাকায় দাদখালি, জাহাজঘাটা ও চকরশিতে ছিল বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্যের শক্তিশালী নৌঘাঁটি। সুতরাং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত প্রতাপাদিত্যের নৌবাহিনীর প্রবল প্রতাপে মগদস্যুরা এ পথে পা বাড়াতে সাহসী হ'ত না। কিন্তু মোগলদের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রতাপাদিত্যের পতনের পর সুন্দরবনের সাগর দ্বীপ ক্রমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মোগলদের এক শত্রু নিধনের ফলে আর এক শত্রুর আগমন এমন ত্বরান্বিত হয় যে, সুন্দরবন এলাকায় ক্রমে মগদের দৌরাত্ম্য পরবর্তীকালে বেশ ব্যাপকভাবেই বৃদ্ধি পায়। ক্রমশঃ সুন্দরবন এলাকার বহু গ্রাম বসতিবিহীন হয়ে পড়ে মগদের ভয়ে ও অত্যাচারে। ১৭৭১ সালে তৈরী রেনেল সাহেবের মানচিত্রে সুন্দরবনকে তাই জনশূন্য দেখানো হয়েছে জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘের ভয়ে নয়, কেবলমাত্র **'land depopulated by the Mugs.'**।

পরবর্তীকালে মগদের অত্যাচার নিবারণের জন্য মোগলরা হুগলী-ভাগীরথী তীরবর্তী হাওড়া জেলার মাগুয়া দুর্গে পাহারা বসায়। খ্রীষ্টীয় পনের শতকে প্রস্তুত ভ্যানডেনব্রুকের ম্যাপে এ দুর্গটিকে 'থানা কিল্লা' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর এটিই পরবর্তীসময়ে বিভিন্ন নথিপত্রে হয়েছে 'ফোর্ট মাকুয়া' বা 'থানা মাকুয়া', আবার কোন কোন সময় 'ফোর্ট থানা' বা 'তানা ফোর্ট'। এ দুর্গটির অবস্থান ছিল বর্তমান হাওড়ার বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপারিনটেনডেন্ট-এর বাসগৃহের কাছে। বিভিন্ন কাগজপত্রে দেখা যায়, আদিতে এটির নির্মাতা ছিলেন পাঠান সম্রাট হোসেন শাহ। পরে এটি মোগলদের দখলে আসায় তারা এ দুর্গটি ছাড়াও মেটিয়াবুরুজেও আর একটি দুর্গ নির্মাণ করে। উদ্দেশ্য, মগ দস্যুদের প্রতিহত করার জন্যে এই দুই দুর্গ থেকে আড়াআড়িভাবে শেকল ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা, যাতে শত্রুপক্ষ সহজেই না ভিতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়।

মাগুয়া দুর্গ ছাড়াও মগ দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্য মোগল সেনাপতি শায়েস্তা খাঁ চক্রবেড়ের গড় নামে রূপনারায়ন নদের মোহনায় আর একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন বলে পুরাতন কাগজপত্রে উল্লেখ পাওয়া গেছে। কিন্তু স্থানটি যে কোথায়, তা কোন ঐতিহাসিকই নির্ধারণ করেতে পারেননি। কিন্তু স্থানটি কোনদিন রূপনারায়ন নদের মোহনায় ছিল না, সেটি ছিল হুগলী-ভাগীরথী ও হলদী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এ বিষয়ে 'নন্দীগ্রাম ইতিবৃত্ত' প্রণেতা অধরচন্দ্র ঘটক হাতে লেখা এক পুঁথির বিবরণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বেশ কিছু আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন, নন্দীগ্রাম থানার গুমগড়ের চৌধুরী

বংশের জমিদারী যখন গড়চক্রবেড়িয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তখন জমিদার ছিলেন নন্দীগোপাল চৌধুরী, যাঁর নাম থেকে 'নন্দীগ্রাম' গ্রামনামের উৎপত্তি হয়েছে। ঘটক মশায়ের কথায়, '. তৎকালে মগ ও পর্তুগীজ দস্যুরা সাগরদ্বীপে আড্ডা স্থাপন করিয়া হিজলী প্রদেশের সমৃদ্ধিসম্পন্ন স্থানগুলি লুণ্ঠন করিত। গুমগড়ে চৌধুরী জমিদারী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে উহার অরণ্য অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলটি জনপদে পরিণত ও সমৃদ্ধশালী হইতে সূচিত হওয়ায় ইহার দিকেও দুর্ধর্ষ দস্যুদলের লোলুপ দৃষ্টি পতিত হয়। ফলে সেইসকল দস্যুকবল হইতে জমিদারী রক্ষার জন্য নন্দগোপাল চক্রবেড়িয়াগড়ের সম্মুখস্থ সোনানিবাসটিকে দৃঢ়তর মৃণ্ময় দুর্গে পরিণত করেন ও নদীতীর সংরক্ষণের জন্য পাঁচখানি রণতরী নির্মাণ করিয়াছিলেন।' অধরবাবু এই সঙ্গে চৌধুরীবংশের ওড়িয়াভাষায় হাতে লেখা পুঁথির অংশ বিশেষ থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য :

"ময়ূর পঙ্খী জলযান, গড়ন কৈলে পঞ্চখান।
ভাসায়ে তাকু গঙ্গাজলে, দমন কলে মগ দলে।।"

মগদস্যু দমনের জন্যে যার দ্বারাই হোক্ যেসব ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছিল, তার থেকে একটা স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে, মগ দস্যুরা দামোদর বা রূপনারায়ণ নদে আসতে সাহস পেত না। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের প্রবল পরাক্রান্ত সেনাবাহিনী এবং মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার ছোটখাটো ভূস্বামীদেরও নিজস্ব পাইক-বরকন্দাজ প্রভৃতি থাকায় মগ দস্যুরা নদীপথ বেয়ে ভেতরে তেমন প্রবেশ করতো না। তাছাড়া ইংরেজদের এদেশে আসার পূর্বে মেদিনীপুর জেলার হরিহরপুর গ্রামে ১৬৩৭ সাল নাগাদ ওড়িশার শাসনকর্তার অধীনে যে শক্তিশালী এক ফৌজদার মোতায়েনছিল, তার আক্রমণের ভয়ে মগদস্যুরা নদীর ধার ছাড়া ভেতরে প্রবেশ করতে সাহস পেত না। তবে এই হরিহরপুর গ্রামটির প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে কেউ সঠিকভাবে কোন নির্দেশ দিতে পারছেন না।

সে যাই হোক্, সমসাময়িক ইতিহাসের পাতায় মানুষ কেনাবেচার হাট নিয়ে সাহাবুদ্দিন তালিস যেখানে জানিয়েছিলেন, **'sometimes they brought the captives to sell at a high price to Tamluk and the port of Balasore'**, সেখানে প্রশ্ন হ'ল তমলুকের সে হাটটির অবস্থান কোথায় ছিল ? এদিকে 'তমলুক' নিয়ে তো গবেষণার অন্ত নেই। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রাচীন নগরী তাম্রলিপ্ত নিয়ে খোঁড়াখুঁড়িও চলেছে মাটির তলায়, কিন্তু এখনও প্রত্নতত্ত্ব-

বিদ্‌দের খনিত্র স্পর্শ করতে পারেনি সেই আসল বন্দর-নগরীর ধ্বংসাবশেষ। তবুও কত যুগ, কত কালের, কত হাজার বছরের প্রাচীন, সে বিষয়ে পাওয়া বহু প্রত্নবস্তুর হিসেব দিয়ে বারবারই আমাদের মগজ গুলিয়ে দিতে চাইছে এইসব প্রত্নসন্ধানীরা। সুতরাং এই আসরে সাকুল্যে প্রায় তিনশো বছর আগের এমন এক নর-হাটের কথা নিয়ে কেই বা মাথা ঘামাবে? তবে যখন এমন এক হাটের বন্দোবস্ত ঠিক কোথায় দেওয়া হয়েছিল বা কোন্ জায়গাতেই বা ছিল সেই হাটের অবস্থান —এ প্রশ্ন তুলতে গেলেই আমাদের খুঁজে দেখতে হয়, এমন তুল্যনামীয় কোন গ্রাম আশেপাশে কোথাও আছে কিনা? আর তা যদি থেকে থাকে তাহলে এই কাছাকাছি 'নরঘাট'কেই তো প্রাধান্য দিতে হয়। এমনিতেই তো তমলুকে মগেরা আসতো বলে সাহেবদের তৈরী পুরাণো মানচিত্রে তমলুকের পাশ দিয়ে প্রবাহিত রূপনারায়ণ নদকে তাই বলা হয়েছে 'ডাকাতে নদী' (**'Rogue's River'**)। তাই কে জানে, হুগলী-ভাগীরথীর গায়ে হলদী নদীর মোহনা বরাবর লুট করা মানুষ বোঝাই নৌকো চলে আসতো ঠিক এই জায়গাতে—সেজন্যে স্বভাবতই লোকমুখে এখানকার নাম হয়ে যায় 'নরের হাট', আর কালক্রমে 'হাট' অন্ত্যপদটি অপভ্রংশে হয়ে দাঁড়ায় 'ঘাট'! কেননা এখানের এই ঘাট পার হলেই ওপারে পাওয়া যেত রাস্তা, যা সাবেকী বিলেতী সাহেবদের উপনিবেশ হিজলীর দিকে যাবার পথ।

তাই সেকালের আসল 'নরহাট' থেকেই কি আজকের এই নৌকোডুবির নরঘাট।

১৯. মানুষ কেনা-বেচার কারবার

মগ-ফিরিঙ্গিদের মানুষ লুঠের ব্যবসা না হয় প্রতিহত হল ইংরেজ আমলে, কিন্তু সেইসঙ্গে কি ক্রীতদাস প্রথাও লোপ পেয়ে গেল এদেশ থেকে? তাই যদি হবে, তাহলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গভর্ণর জেনরল-ইন-কাউন্সিল ২২শে এপ্রিল, ১৭৮৯ তারিখে কেন ঘোষণাপত্র জারী করে জানাচ্ছেন যে, এতদিনে 'নেটিভ'দের ক্রীতদাস হিসেবে ভারতের অন্যান্য স্থানে চালান দেওয়ার যে প্রথা ছিল তা রহিত করে দেওয়া হল। এইসঙ্গে কোম্পানির মেদিনীপুর জেলার নিমকি

মহলের হিজলী ও তমলুকের 'সল্ট এজেন্ট' মহাশয়গণকেও যথারীতি অবগত করানো হল, ক্রীতদাস চালানির ব্যবসা বন্ধে কোম্পানির এই ঘোষণাপত্র যাতে তাদের স্ব স্ব এলাকায় ইংরেজি ও স্থানীয় ভাষাতে প্রচারিত হয় তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা যেন করা হয়।

ঘোষণাপত্রটি জারী করে সমস্যা সমাধান করার চেষ্টার মধ্যেও যে ফাঁক থেকে গেল, তা ইংরেজ কর্তৃপক্ষ যে জানতেন না এমন নয়। দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে আসা মানুষ কেনাবেচার এমন লোভনীয় ব্যবসা হঠাৎ চালানীদাররা পরিত্যাগ করেন কি করে, যা কিনা শ্বেতমহাপ্রভুদের অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। তাই আইন হলেও চোরাগোপ্তা পথে যথারীতি এ ব্যবসা চলতে থাকলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্রীতদাস চালানোর দায়ে ধরা পড়লো ফরাসীরা, আর অন্যান্য ইউরোপীয়ানরা সকলেই তখন সাধু সেজে বসলো। কিন্তু তা হলেও চোরাপথে এ ব্যবসার এক নমুনা পাওয়া গেল ১৭৯১ সালে সে সময়ের খেজুরী বন্দরে।

তখনকার খেজুরী বন্দর (যা সাহেবদের লেখায় '**Kedgeree**' বলে উল্লেখ থাকার দরুণ অনেক গবেষক এটিকে 'খেদগিরি' বলেও উল্লেখ করেছেন) দারুণ জমজমাট। কলকাতায় যখন বন্দর হয়নি, খেজুরীতে তখন বন্দর হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'এজেন্টস্ হাউস' এবং 'পোর্ট অফিস'। সাহেবদের বহু বাড়িঘর, হোটেল-ট্যাভার্ণ, ডাক-অফিস সব মিলিয়ে আঠার শতকের খেজুরী এক উল্লেখযোগ্য টাউন। ঐ সময় ফরাসীদের ভাড়া করা এক জাহাজে পাওয়া গেল এমন চব্বিশটি ছেলেমেয়ে, যাদের বিভিন্ন স্থান থেকে বেআইনীভাবে সংগ্রহ করে কলকাতা থেকে পণ্ডিচেরীতে এক মালবাহী জাহাজে গোপনে পাচার করা হচ্ছিল।

১৯৭১ সালে সেন্সাস বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট রেকর্ড' সিরিজের 'মিডনাপোর করসপণ্ডেন্স অফ দি সল্ট ডিষ্ট্রিক্টস্-হিজলী সল্ট ডিভিশন'-পুস্তকে উল্লিখিত এ ঘটনাটি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে যেসব চিঠিপত্র লেখালেখি হয়েছিল, সেগুলির সারাংশ করলে যা দাঁড়ায় তা হল : ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে চাল, সুতো, কাপড় আর হলুদ রঙের গুঁড়ো কলকাতা থেকে পণ্ডিচেরীতে চালান দেবার জন্যে জনৈক ফরাসী ব্যবসাদার এদেশী বেঙ্কটরামদেও-এর কাছ থেকে 'শ্লো শ্রীরামরাও' নামে এক জাহাজ ভাড়া করেন। যথাসময়ে কলকাতা থেকে মালপত্র নিয়ে আসার সময় ২৮শে মার্চ তারিখে ফরাসী ক্যাপ্টেন জাহাজের সারেঙ্গকে কুলপীতে জাহাজ নোঙ্গর করার

আদেশ দেন। জাহাজ থামার কারণ হিসেবে বলা হয়, ক্যাপ্টেনের কিছু মাল-পত্র কলকাতায় রয়ে গেছে, তা পিছনে নৌকোয় করে এসে পৌঁছুলে জাহাজ ছাড়া হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেনের ছেড়ে আসা মালের বদলে এসে পৌঁছুলো দুটি পানসী বোঝাই ছেলেমেয়ে, যাদের ক্রীতদাস হিসাবে চালান দেওয়া হবে বলেই মনে হয়। দেশী সারেঙ্গ তো এসব ব্যাপারটা আঁচ করে প্রবল আপত্তি জানালো, মালপত্র ছাড়া এসব মানুষজন তো নিয়ে যাবার কথা ছিল না। ফরাসী ক্যাপ্টেন তৎক্ষণাৎ জাহাজের ঐ নেটিভ সারেঙ্গকে লাথি ঘুসি মেরে উপযুক্ত জবাব দিল। কিন্তু জানাজানি হবার ভয়ে পানসীর ক্রীত-দাসদের আর জাহাজে তোলা হল না। কিন্তু জাহাজটি বারাটুলির কাছে পৌঁছোবার পর, ক্যাপ্টেন ঐ সব ক্রীতদাসদের পানসী থেকে জাহাজে তুলে নিল। তারপর জাহাজ খেজুরী বন্দরে এসে পৌঁছানো মাত্রই সারেঙ্গ কোন-মতে পালিয়ে এসে এই কুকীর্তি ফাঁস করে দিল খেজুরী রোডের জনৈক ইংরেজ জর্জ হুইটলে-কে। তিনি আবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রীতদাস পাচারের এই ঘটনাটি জানিয়ে চিঠি পাঠালেন হিজলীর সল্ট এজেন্ট মিঃ হিউয়েট-কে ; হিউয়েট সেই মোতাবেক জানালেন কলকাতার গভর্ণর জেনরল-ইন-কাউন্সিলকে। সেখান থেকে যথাযথ আদেশ আসতেই জাহাজ আটক করে খেজুরী বন্দরের সেসব ক্রীতদাসদের উদ্ধার করা হল।

এবার অনুসন্ধানে জানা গেল, উদ্ধার করা চার থেকে কুড়ি বছর পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের ১৭টি মেয়ে আর ৭টি ছেলেকে আনা হয়েছে বাখরগঞ্জ, মাধাখালি, আবাদনগর, মুথাখাল, মাদারীপুর, শান্তিপুর, বন্দীকুল, ঘাটাল, হাসানাবাদ থেকে। যে পদ্ধতিতে সংগ্রহ হয়েছে তার বিবরণ হল, আড়কাঠি-দাররা ঐসব স্থান থেকে চুরি করে, ভুলিয়ে ভালিয়ে বা লোভ দেখিয়ে, কখনো বা দুর্ভিক্ষের কারণে বাপমায়ের কাছ থেকে কিনে এনে, তারপর তাদের চুঁচুড়ার জনৈক মঁশিয়ে জর্ডন ও কলকাতার জনৈক ফৌসিলিকে বিক্রী করে দেয়, যারা এই ক্রীতদাস গোপনে বাইরে চড়া দামে চালান দেবার ব্যবসা রীতিমত চালিয়ে থাকেন। কোম্পানির আইন ভঙ্গের দায়ে শেষ পর্যন্ত এইসব অপরাধীদের ধরা হয়েছিল কিনা এবং আদালতে মামলাটির বিচারে শাস্তিবিধান করা হয়েছিল কিনা, সে সম্পর্কে কোন কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। তবে ফরাসীদের পক্ষ থেকে এই অপরাধ সংঘটনের জন্য ব্রিটিশরা যে বেশ জল ঘোলা করে তুলেছিল তা এই সংক্রান্ত বিভিন্ন চিঠি চালাচালি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে, কোম্পানি ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীতদাস চালানী প্রথা রদ করে দিলেও, গোপনে যে এই ব্যবসাটি চালু ছিল, এইসব নথিপত্রই তার সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে। এদেশ থেকে না হয় কোম্পানি ঘোষণাপত্র জারী করে অন্যত্র ক্রীতদাস চালান রদ করে দেবার হুকুম দিয়েছিল, তবে অন্যস্থান থেকে ক্রীতদাস আনতে তো কোন বাধা ছিল না কোম্পানির কর্মচারিবর্গের। বিভিন্ন ইংরেজ লেখকদের লেখাতেও পাওয়া যাচ্ছে, ক্রীতদাস প্রথা দীর্ঘদিন ধরে এদেশে বর্তমান থেকে গিয়েছিল। বিলেত থেকে আসা বা এদেশী ইঙ্গ-বঙ্গীয় সাহেবদের যেসব দাসদাসী নিযুক্ত করা হত, তাদের অধিকাংশই ছিল ক্রীতদাস। বাইরে থেকে ক্রীতদাস হিসেবে কাফ্রিদের এদেশে আনা হত বলে ইংরেজরা যতই সপ্রমাণ করার চেষ্টা করুক না কেন, আদতে এদেশ থেকেই ক্রীতদাস সংগৃহীত হত বেশ বহুল পরিমাণেই। অভাব দারিদ্র্যের সংসারে ভরণপোষণে অক্ষম গরীব পিতামাতারা তাদের শিশুদের অনেকসময় বিক্রী করে দিতে বাধ্য হতেন। ফলে দাস ব্যবসায়ের আড়কাঠিদাররা তাদের খাইয়ে পরিয়ে সেবাশুশ্রূষা করে শেষ পর্যন্ত বেচে দিতো আগ্রহী ক্রেতাদের কাছে, যারা সারাজীবনের জন্য তাদের ক্রীতদাস করে রাখতো। পছন্দ না হলে সে ক্রীতদাসকে অন্য আগ্রহী ক্রেতাদের উপযুক্ত মূল্যে বেচেও দেওয়া হত। তখনকার সে উপযুক্ত মুল্য ছিল চার থেকে পাঁচশো টাকা মাত্র, যার বিবরণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে সে সময়ের সংবাদপত্রের পাতায়। কেননা আগ্রহী ক্রেতা অনুসন্ধানের জন্য খবরের কাগজে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হত, তাতেই উল্লিখিত হত ক্রীতদাস কেনা-বেচার দরদস্তুর।

সেজন্য মানুষ কেনা-বেচার ও সেইসঙ্গে ক্রীতদাস তৈরীর এই জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে যখন প্রতিবাদ উঠতে থাকলো, তখন সুসভ্য ইংরেজ সাহেবদের টনক নড়লো। শেষ পর্যন্ত বড়লাট উইলবারফোর্সের আমলে ১৮৪৪ সাল নাগাদ এই ক্রীতদাস কেনাবেচার প্রথা উঠে গেল। কিন্তু দীর্ঘদিনের চালু প্রথা সুবিধে-বাদীদের হাড়ে মজ্জায় এমনই মিশে গিয়েছিল যে, আইন হলেও সে প্রথার শিকড় গেড়ে বসেছিল এদেশী গ্রামজীবনের অনেক গভীরে। এক্ষেত্রে আর সরাসরি কেনাবেচা নয়, ধনী ভূস্বামীদের কাছে অর্থের বিনিময়ে আত্মবিক্রীত হতে হত; অর্থাৎ যাকে বলে মানুষ নিয়ে বন্ধকী কারবার। মহাজনের কাছ থেকে জরুরী প্রয়োজনে টাকা ধার করা হয়েছে, সেজন্য সে হুজুর-মালিকের কাছে চিরদিনের মত আজ্ঞাবহ দাস হয়ে থাকার দাসখত লিখে দেবে। অনুসন্ধান-

কালে এমন ধরনের গোলামিখাটার বহু নজির এ জেলার নানাস্থানে খুঁজে পাওয়া যায়। একশো বছরের পুরাতন এমন একটি দাশখতের লিখিত দলিলও অবশ্য পাওয়া গেছে (বর্তমান লেখকের কাছে সংরক্ষিত) যার বয়ানটি থেকে সে সময়ের এই জঘন্য প্রথাটি সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত হওয়া যায়। সেটি হল: "কস্য দাষখৎ পত্র মিদং কার্যানঞ্চাগে আমি আমার জমিদার সেরেস্তা হইতে জমী-জমা খাষ দখল করিয়া লওয়ায় ঐ জমীদার সেরেস্তা হইতে পুনরায় বন্দবস্ত করিয়া লইবার জন্য আপনার নিকট ৪৯৲ উনপঞ্চাষ টাকা গ্রহণ করতঃ অত্র দাষখত পত্র লিখিয়া দিতেছী ও অঙ্গীকার করিতেছী যে আমি আপনার নিকট ইস্তক বর্ত্তমান সনের জ্যোষ্ট নাগাইদ আগামী আশাঢ় মাহা পর্যন্ত গণিতা ২৬ মাহার জন্য মোট চুক্তী উনপঞ্চাষ টাকা বেতন মায় খোরপশাকে অবধারিতে আমি অদ্য হইতে নিযুক্ত হইলাম। যদি সময়মত কার্য না করি বা চুক্তীভঙ্গ করিয়া ছাড়িয়া যাই, তাহা হইলে আপনার ক্ষতীপূরণ বাবদ ফজদারিতে দণ্ডনিয় হৈব এবং আমার নিজদেহ হইতে আদায় দিব। ইতি···।" দেহ বন্ধকের এমন উদাহরণ আর কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে?

সেকালের ধনী ভূস্বামী বা অর্থবানদের কাছে উনপঞ্চাশ টাকায় আত্ম-বিক্রয়ের এই সমাজচিত্র বাংলার অত্যাচারিত মানুষেরই এক দর্পণ। আর এই সঙ্গেই জানা গেল, এরই নাম দেহ-বন্ধকী কারবার; টাকা পয়সা, ভূসম্পত্তির মতো গোলাম পোষাও ব্যক্তিগত সম্পত্তির একটা অংশ ছিল সে সময়ে। সুতরাং এ যদি পুরুষের জীবন সংগ্রামের এই কাহিনী হয়, তাহলে আমাদের জননীকুলের অবস্থাটা কি ছিল তা সহজেই অনুমেয়। তাই বোধ হয় গ্রাম-দেশে মেয়ে জন্মালে আতুঁর ঘরে তাদের পদাঘাত করে স্বাগত জানানো হয়।

২০. কবিকঙ্কণের বাসভূমিতে

আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে যে কবি তার কাব্যের প্রতিটি লাইনে লাইনে সেকালের গ্রাম্য সর্বহারাদের জীবন যন্ত্রণার এক নিখুঁত চিত্র এঁকে-ছিলেন, তিনি আজ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ আপাঙক্তেয়। নেহাতই স্কুল কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার তাগিদে বঙ্গভাষাচর্চায় তাঁর নামটি বঙ্গ-

সন্তানদের কাছে কেবল উচ্চারিত হয় মাত্র। তা না হলে, আজ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিখ্যাত রচয়িতা কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের কোন স্মৃতিচিহ্ন এদেশে নেই কেন? এদেশের কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের যদি তাঁর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকতো, তাহলে এদেশের মাটিতে বিদেশী কবিদের স্মৃতিরক্ষা আয়োজনের মতই এই মহান কবির নামটাও সে-সব উদ্যোগের তালিকায় ঠাঁই পেতো। বাঙালী যে আত্মবিস্মৃত জাতি—এ অপবাদ যে একেবারেই মিথ্যে নয়, তা মুকুন্দরামের আলোচনায় এলে বোঝা যাবে।

মোগল আমলে ডিহিদার মামুদ শরিফের অত্যাচারে কবি দেশত্যাগী হতে বাধ্য হয়েছিলেন। সহায়সম্বলহীন অবস্থায় সেই বর্ধমানের দামিন্যা গ্রাম থেকে হুগলী জেলার ভেতর দিয়ে বহু দুস্তর পথ হেঁটে এবং নদনদী ও খালবিল পেরিয়ে অবশেষে তিনি এসে পৌঁছেছিলেন মেদিনীপুর জেলার ব্রাহ্মণভূম পরগণার আরড়্যাগড়ের ভূস্বামী বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে। অবশ্য সে সময় ব্রাহ্মণভূম ছিল বর্ধমান জেলার মধ্যে—পরে তা মেদিনীপুরের অধীন হয়। বলতে গেলে এখানেই কবির কাব্য রচনার সূত্রপাত। তাই তিনি আশ্রয়দাতা ভূস্বামীর প্রসঙ্গে লিখেছিলেন,—

'সুধন্য বাঁকুড়া রায়, ভাঙ্গিল সকল দায়,
শিশু পাছে কৈল নিয়োজিত।
তার সুত রঘুনাথ, রাজগুণে অবদাত,
গুরু করি করিলা পূজিত।'

মোটামুটি মুকুন্দরামের লেখায়; তাঁর আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে যা বিবৃত হয়েছে তার এইটুকুই হল সারমর্ম—যা আজ আমরা সকলেই পাঠ্য বইয়ের দৌলতে কিছু না কিছু জানি। কিন্তু জানিনা, যেখানে বসে কবি মানুষের সুখদুঃখের কাহিনী তাঁর কাব্যে প্রতিধ্বনিত করেছিলেন সেই আরড়্যাগড়ই বা কোথায় এবং কোন্‌খানে বা কোন্‌পথে?

সুতরাং একদিন এই আশ্বিনের এক দিনক্ষণে বেরিয়ে পড়া গেল আরড়া-গড়ের উদ্দেশ্য। সরকারী প্রকাশনায় মৌজার তালিকায় 'আরড়াগড়'-এর উল্লেখ নেই, আছে 'গড় আরড়া' ও 'বাজার আরড়া'—যা মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানার অন্তর্গত। জিজ্ঞাসাবাদে সোজা পথও একটা মিলে গেল। দক্ষিণপূর্ব রেলপথের খড়্গাপুর স্টেশনে নেমে খড়্গাপুর-বাঁকুড়া বাসে চেপে শালবনি, তারপর আরড়ার উদ্দেশ্যে মেঠো পথ ধরে পাড়ি।

শালবনিতে অনেকেই বললেন, সোজা রাস্তায় নদী পেরিয়ে না গেলে একটু ঘুর পথ হবে বটে, তবে পথে কাউকে জিজ্ঞেস না করলেও চলবে। এবং সে কাঁচা রাস্তাটি এখান থেকে মাইল খানেক গিয়ে মণ্ডলকুপির কাছ থেকে বেঁকে যেতে হবে এবং দূরত্ব হবে মাইল সাতেক। আর রাস্তা সংক্ষেপ করতে চাইলে মাঠের মধ্য দিয়ে গিয়ে নদী পেরিয়ে জঙ্গলের রাস্তায় প্রায় মাইল পাঁচেক দূরত্ব। আমরা পরবর্তী পথটাই বেছে নিলাম।

এরপর মাঠের আল বাঁধের উপর দিয়ে সোজা পুবমুখী মাইলখানেক হাঁটা দিলাম। সামনেই এক নদী। বালির উপর দিয়ে এঁকে বেঁকে বয়ে যাওয়া তার জলপ্রবাহ ক্ষীণ মনে হলেও স্রোতের তেজ দেখাতে ছাড়লো না। কোন-রকমে কোমর ডুবিয়ে গুটি গুটি করে পার হয়ে এপারে এলাম। রাখাল ছেলেরা তখন মোষ চরাচ্ছিল। নদীর নাম জিজ্ঞেস করাতে তারা বললো: 'লদী আছেক গো বাবু—লামটাম তো জানিনা'। পথ চলতি আর এক পথিকেরও ঐ জবাব। পরে জেনেছি এটির নাম তমাল। এ জেলাতেই এর উৎপত্তি। গড়বেতা থানার মেট্যাল গ্রামের জঙ্গল থেকে প্রবাহিত হয়ে গোয়ালতোড়ের পাশ ঘেঁসে আর এক উপনদী 'বুড়াই'-এর জলধারায় পুষ্ট হয়ে সোজা পুবে এসে মিশেছে কেশপুর থানার জগন্নাথপুরের কাছে 'কুবাই'-এ। তারপর সেখান থেকে দুই নদী একত্রে শিলাই সঙ্গমে।

নদী পেরিয়ে মাইলখানেক আবার ধানের মাঠ। মাঠ পেরিয়ে এক শ্রীহীন পল্লী—চলতি কথায় নাম কেঞ্জাপাড়া, পোষাকী নাম জোড় কেঁউদি (বোধ হয় জোড়া কেঁদ বা কেন্দু পাতার গাছের জন্যে স্থানের এই নামকরণ)। তারপর সেখান থেকে ঝামাপাথরের নুড়ি বিছানো এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর ক্রমশঃ যেন চড়াই হয়ে আকাশের দিকে উঠে গেছে। এটারও দূরত্ব প্রায় মাইল খানেক। চড়াই পার হতেই সামনে এক শালের জঙ্গল। জঙ্গলের ডালপালা কেটে কেটে তাদের বাড়বাড়ন্তকে যেন দমিয়ে রাখা হয়েছে। এর মধ্য দিয়েই সরু এক পায়ে চলা পথ। প্রায় মাইল দেড়েক হাঁটার পর বন শেষ হল, তারপর আবার ধানের ক্ষেত। এবার উৎরাই হয়ে নেমে এসে ধরলাম বেশ চওড়া একটা মাটির রাস্তা। মনে হল কাঁচা রাস্তায় ঘুরে এলে এই রাস্তাই ধরতে হত।

দুপুর তখন সাড়ে এগারোটা। রাস্তায় কোন জনপ্রাণীর দেখা নেই। কাছেই এক বটগাছের তলায় পাচনবাড়ি হাতে আর এক রাখাল শিশু। সেই আমাদের মাইল খানেক দূরের এক গাঁ দেখিয়ে আমাদের পথনির্দেশ করে দিল।

তারপর আবার হাঁটা। বেশ খানিকটা চড়াই রাস্তায় এসে পথে বাঁক ঘুরতেই নিশানা মত গ্রামে পৌঁছে গেলাম।

পুবদিকে এক জঙ্গলের ধার ঘেঁসে গ্রাম। আর এই গ্রামই হল বাজার আরড়া। নামেই বাজার আরড়া, কিন্তু বাজারের কোন চিহ্নমাত্রই নেই। হয়ত রাজাদের আমলে তাদের পাইক-পেয়াদা, আমলা-গোমস্তা আর কর্মচারীদের প্রয়োজনে একদা এখানে যে বাজারটি গড়ে উঠেছিল, তাই আজ বাজার থেকে গ্রামে পরিণত হয়েছে। গ্রামে রয়েছে পঁচিশ-ত্রিশ ঘর লোকের বাস। এর মধ্যে দশ ঘর কুম্ভকার, চার ঘর গন্ধবণিক, এক ঘর কামার এবং অবশিষ্ট মাহাতো আর আদিবাসী প্রভৃতি সম্প্রদায় নিয়েই বসবাস। অধিকাংশই খড়ো মাটির বাড়ি—তবে তার মধ্যে আটচালা গড়নের বাড়িগুলির স্থাপত্য সহজেই মন ভুলিয়ে দেয়। গ্রামের ক'ঘর গন্ধবণিকরাই মনে হয় একটু বিত্তবান—কারণ তাদের টিনের ছাউনি এবং পাকাবাড়িই তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা জানান দেয়।

তবে সব মিলিয়ে গ্রামের চেহারা একেবারে শ্রীহীন। সেই চারশো বছর আগে মুকুন্দরামের বর্ণনায় যে নিম্নবর্ণের গরীব শ্রমজীবীর চিত্র আঁকিত হয়েছিল আজও তাই যেন এখানে রয়েছে। গ্রামের কুম্ভকাররা এখনও তাদের জাতি-বৃত্তি নিয়েই রয়েছেন। বাদ বাকী সামান্য জমিজমার অধিকারী ও ক্ষেতমজুর সম্প্রদায় জীবন ও জীবিকার তাগিদে যে ক্ষতবিক্ষত তা গ্রামের পরিবেশ দেখলেই মালুম হয়। গ্রামের মাটিতে আষ্টেপৃষ্ঠে ঝামাপাথর। তাই তেমন পুকুর-ডোবা নেই। মুকুন্দরামের বর্ণনামত দু'এক জায়গায় চৌকো করে পাথর খুঁড়ে 'প্রতি বাড়ী কূপের সঞ্চয়' দেখা গেল। নিথর নিস্পন্দ এক গ্রাম। দেখলেই মনে হয় উন্নয়নের অভাবে ধুঁকতে ধুঁকতে যেন শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে।

এ গ্রাম থেকে দক্ষিণে প্রায় কোয়ার্টার মাইল দূরত্বে রাজাদের গড়—যা গড়আরড়া নামে পরিচিত। মাঠের মধ্যে জমির সরু আল ধরে অবশেষে চলে এলাম গড়আরড়ায়। প্রায় চারশো-সাড়ে চারশো বছর আগের এ গড়বাড়ির চতুর্দিকে প্রাচীন সে গড়খাই-এর চিহ্ন বর্তমান। গড়ের মধ্যে উত্তর গা লেগে আয়তাকার এক পুষ্করিণী। ঝামাপাথর সরিয়ে পুকুর খোঁড়া বিত্তবান ভূস্বামীর পক্ষেই সম্ভব ছিল। তাই দীর্ঘ এত বছর পার করেও পুষ্করিণীটি তার জলধারা বক্ষে ধরে আজও টিকে রয়েছে। তবে তা ঝাঁঝি শেওলা আর ঘাসের জঙ্গলে বোঝাই। মাছের বদলে বড়ো আকারের জোঁক—যা মানুষের সঙ্গ

পেলে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। ঝামাপাথরে বাঁধানো ঘাটের চিহ্নও রয়েছে দক্ষিণপাড়ে। পশ্চিমপাড়ে পুকুরের জল নিষ্কাশনের জন্য সেই জল-প্রণালীর অস্তিত্ব আজও রয়েছে।

বাস্তুর চতুর্দিকে পাথরের স্তূপ। পাতলা ভাঙ্গা ইট আর খোলামকুচির রাজত্ব। তাই রাজবাড়ির এলাকায় কোনটা যে কি বাড়িঘর ছিল তা আজ বোঝা দুষ্কর। যদিও বা কিছুটা বোঝা যেত তার চিহ্নও শেষ করে দিয়েছে শ্যামচাঁদপুর গ্রামের সীতারামজীউ অস্থলের মহন্ত মহারাজারা। তাঁরা তাঁদের জমিদারীর দখলিস্বত্ব বজায় রাখতে এ রাজবাড়ির পোড়ো আবর্জনা ঝামাপাথর-গুলিকে খুলে নিয়ে বেচে দিয়েছেন। ফলে এ জায়গা শ্মশান হয়ে গেল কিনা বা কবির শেষ স্মৃতিচিহ্ন কোনকিছু নষ্ট হয়ে গেল কিনা, তা তাদের দেখার তো কথা নয়—সবই ঠাকুরের ইচ্ছা কিনা! এ দেশ-পাড়াগাঁয়ে জমির দখল বা বেদখল নিয়ে যদিও বা রুখে দাঁড়ানো যায়, কিন্তু মহৎ ব্যক্তিদের স্মৃতি সংরক্ষণে গরজটাই বা কি? তাতে ভোট আসবে, না জমির দখল পাওয়া যাবে? সুতরাং যা হবার তাই হয়েছে। কবিকঙ্কনের সাহিত্য সাধনার পটভূমি এখন ধূলিস্মাৎ। তার উপর এদেশের পণ্ডিত বুদ্ধিজীবী, কবি সাহিত্যিকদের এই গ্রাম্য সেকেলে কবি সম্পর্কে অনীহার কারণে সেই কবিতীর্থ আজ নরকভূমিতে পরিণত।

এসব দুঃখ আক্ষেপ করতে করতে আরড়াগড় থেকে ভর দুপুরের রোদ মাথায় করে চললাম, মুকুন্দরামের আশ্রয়দাতা বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায়ের প্রতিষ্ঠিত জয়চণ্ডীর মন্দির দেখতে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে রঘুনাথ রায়ের গৃহ শিক্ষক ছিলেন মুকুন্দরাম। সে গ্রামও এখান থেকে মাইল খানেক দূরত্বে। শাল জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পূবমুখী এলেই লাগোয়া গ্রাম জয়পুর। গ্রামের উত্তর প্রান্তে এক প্রকাণ্ড বটগাছের নীচে দক্ষিণমুখী জয়চণ্ডীর মন্দির এবং তার পিছনেই একটি মজা পুষ্করিণী—যার জল এ গ্রামের জনসাধারণ আজও পানীয় হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন।

কিন্তু দেবীর মন্দির শুধু নামেই। যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে সে মন্দির বর্তমানে ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। মন্দিরের ঝামাপাথরের দেওয়াল ভেঙ্গে পড়ায় নানান ধরনের পাথর ইতস্ততঃ ছড়ানো। সাবেক আমলে গাঁথনিতে মশলার বদলে পাথর ধরে রাখার জন্য লোহার হুকের যে প্রচলন ছিল তারই নজির রয়েছে এসব পাথরের গায়ে। বর্তমানে চারদিকে সামান্য দেওয়াল তুলে

খড়ের ছাউনি করে দেওয়া হয়েছে মন্দিরটিতে। কিন্তু সে খড়ের ছাউনির কাঠামো সেই কবেই ভেঙ্গে পড়েছে—কেউ মেরামত করার নেই। জয়চণ্ডীর আসল বিগ্রহটিও বর্ত্তমানে অন্তর্হিত। পূজারী ব্রাহ্মণের কথায় জানা গেল, মন্দির ভেঙ্গে পড়ায় বিগ্রহও তার সঙ্গে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যায়। তাই বর্তমানে উত্তর দেওয়ালে পঙ্খপলেস্তারায় সিংহবাহিনীর এক মূর্তি নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে কোনক্রমে ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্যে।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের স্মৃতি বিজড়িত এসব পুরাকীর্তি দেখতে দেখতে কখন যে দুপুর গড়িয়ে এসেছে খেয়াল নেই। এবার ফেরার পালা। তবে ফেরার সময় আর ওপথে নয়। বরং মুকুন্দরাম যে পথ ধরে এসেছিলেন সেই পথ অনুসন্ধান করে ফিরলে মন্দ হয় না। তাই জয়পুর থেকে বেরিয়ে প্রাচীন সেই পথ অনুমান করে এগিয়ে চললাম। সামনে রোলাপাট গ্রাম, বাঁদিকে রয়ে গেল শ্যামচাঁদপুর, তারপর সলিডিহা। বর্তমান পথ এড়িয়ে পুরাতন পথ ধরে এলাম তুষখালি, তারপর ধারাশোল গ্রাম পেরিয়ে এলাম কুবাই নদের তীরে। সেটির ক্ষীণ স্রোত পেরিয়ে সেই পুরাতন পথ ধরেই এলাম আগমূড়া থেকে শিরসা। শিরসা একসময় যে বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল তা ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দের রেনেল সাহেবের ম্যাপে এবং আঠার শতকের শেষ দিকে ইংরেজ শাসনকর্তাদের চিঠি-পত্রেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এবার শিরসা থেকে মোহবনি, শশাবনি গ্রাম পেরিয়ে চলে এলাম তলকুঁয়াইয়ের কাছে নেড়া দেউল শিবমন্দির প্রাঙ্গণে, অর্থাৎ পুরাতন বাদশাহী সড়কের সংযোগস্থলে। মুকুন্দরামের লেখায় যদিও এ পথের কোন উল্লেখ নেই তবুও অনুমান করা যায়, কবি তাঁর লেখায় যে গোচড্যা গ্রামের উল্লেখ করেছেন বর্তমানের সেই গুচুড়ে গ্রাম থেকে সম্ভবতঃ মেঠো পথ ধরে তলকুঁয়াই হয়ে গড় আরড়ায় পৌঁছেছিলেন উল্লিখিত ঐ পথ ধরে। অবশ্য সবই অনুমান, কারণ এছাড়া গড়আরড়ায় যাবার আর কোন পথই ছিলনা সেসময়।

যাই হোক, এখানের এই কবিতীর্থে এসে গভীর দুঃখবোধ হচ্ছিল এই ভেবে যে, এক অখ্যাত গ্রামে বসে যিনি সমকালীন সমাজজীবনের এক মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তার সামান্য কোন স্মৃতিচিহ্নের নিদর্শন নেই কেন? অথবা পৌঁছোনোর জন্যে একটু ভালো রাস্তা? একদা বিদ্যাসাগরের জন্মভিটারও তো এই হাল ছিল; কিন্তু তদানীন্তন রাজকর্মচারী বিনয়রঞ্জন সেনের মত এক আমলার প্রচেষ্টায় বীরসিংহ

গ্রামে বিদ্যাসাগর স্মৃতি রক্ষণে বাঙালীর সেদিন মুখরক্ষা হয়েছিল। সেদিনের রাজপুরুষের কাল নেই, পরিবর্তে অনেক জন-প্রতিনিধি আজকের যুগে এসেছেন সমাজতন্ত্র ও সাম্যতন্ত্রের সিঁড়ি বেয়ে। এখন তাদের কি এ বিষয়ে কোন কর্তব্য নেই?

২৯. জিনশহর, না জিনসর, না বালিহাটি

কোলকাতা থেকে মেদিনীপুর শহরে ঢুকতে গেলেই পড়বে কাঁসাই নদী। এখন তার ওপর যে নতুন সেতুটি নির্মিত হয়েছে, তার নাম 'বীরেন্দ্র সেতু'। স্বাধীনতা আন্দোলনের নিষ্ঠাবান সৈনিক বীরেন্দ্রনাথ শাসমল জনগণের আপন নেতা হিসাবে একদা ছিলেন মেদিনীপুরের মুকুটহীন সম্রাট। এ সেতু তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করে যথার্থ কাজই করেছেন পূর্ত (সড়ক) বিভাগ। কিন্তু এ সেতু নিয়ে আজকের প্রসঙ্গ নয়—একটি গ্রামে যাবার দিগদর্শন হিসেবেই এই সেতুটি উপলক্ষ্য মাত্র।

অবশ্য আমার গন্তব্যস্থল হচ্ছে বালিহাটি গ্রাম। সুতরাং এই সেতুর দক্ষিণ পাড় দিয়েই হাঁটা দিতে হবে সোজা পূব দিকে। পাশ দিয়েই সোনালী চিকচিকে বালির ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে কাঁসাই, একান্ত আপন মনে। মুগ্ধ হয়ে দেখার মতন এই নিসর্গশোভা। বেশ খানিকটা হাঁটার পর পৌঁছে যাওয়া যাবে জিনসহর গ্রামের সীমানায়। এদিকে সরকারী পূর্ত (সড়ক) বিভাগের দৌলতে বড় রাস্তার ওপর এক জায়গায় বোর্ডে গ্রাম-পরিচিতি হিসাবে লেখাও আছে 'জিনশহর'। এখন আপনার মন বলবে 'জিনশহর' তাহলে কি জিনদেবতা বা জৈনদের শহর? পথ চলতে চলতে গ্রামের দু' একজন লোকের সঙ্গে দেখাও হয়ে যেতে পারে। এ গ্রামের নাম 'জিনশহর' কেন হল তা বলতে না পারলেও এটুকু হয়ত বলতে পারবে যে, জেলা মেদিনীপুর আর থানা খড়্গপুরের অধীন মৌজাটির নাম 'জিনসর—জে. এল. নং ২১৫'। 'জিনসহর' যখন সরকারী রেকর্ডে 'জিনসর' তখন এ গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে যে চিন্তা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল, সে চিন্তায় যেন ভাঁটা পড়ে যাবে। ঠিক তখনই মন বলতে চাইবে, জিন বা জৈনদের শহর থেকে এ গ্রামের নাম তাহলে কি হয়নি!

তবু কিন্তু হাঁটার শেষ নেই—কারণ বালিহাটি গ্রাম কতদূরে কে জানে? ১৯৭২ সালে প্রকাশিত 'লেট মিডিভ্যাল টেম্পলস্ অফ বেঙ্গল' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১৬) স্বর্গত ডেভিড ম্যাককাচ্চন লিখেছিলেন, চতুর্দ্দিকে ঘেরা প্রদক্ষিণপথযুক্ত এমন একটি সুপ্রাচীন মাকড়া পাথরের মন্দির সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার বালিহাটিতে আবিষ্কৃত হয়েছে। সুতরাং সেই দুর্লভ মন্দিরটি দেখার আশায় আজ ঐ গ্রামে যেতে হচ্ছে বেশ কয়েক মাইল রাস্তা পেরিয়ে।

পথের মাঝেই রাস্তা থেকে ডানদিকে নজরে পড়বে অযত্নে লালিত একটা শিবের মন্দির। কিন্তু তার সামনের দেওয়ালে সাঁটানো আছে পাথর খোদাই একটি জৈন মূর্তির মস্তক। সত্যিই চমকে ওঠার মত এবং 'ইউরেকা' বলে লাফিয়ে উঠে মন বলতে চাইবে, তবে তো 'জিনশহর' ঠিকই ; সাধন-ভজনের ক্ষেত্র ছিল বলেই পরবর্তী সময়ে এই জৈন সংস্কৃতির ধ্বংসস্তূপের ওপর নতুন করে গ্রাম পত্তনের সময় নামকরণ করা হয় জিনশহর এবং তা ইংরেজ রাজত্বে সাহেবদের জরিপ-কাগজে হয়ে যায় 'জিনশর'!

ততক্ষণে 'বালিহাটি' গ্রামের সীমানায় পা পড়ে গেছে। এবার পুরাণো মন্দিরের কথা জিজ্ঞেস করলেই গ্রামের লোকেরা দেখিয়ে দেবে সেই 'আঁধার-নয়ন'-এর দিকে। না, অন্ধকার চোখের দিকে নয়, ঐ পুরাণো মন্দিরটা যেখানে আছে সেইখানটাকেই এরা বলে থাকেন 'আঁধার নয়ন'। একটা বিরাট ঝামা পাথরের মন্দির—গাছপালা গজিয়ে এমন চেহারা নিয়েছে যে, আদতে এটি যে সত্যিকারের কোন্ রীতির মন্দির ছিল, তা বুঝে ওঠা দুষ্কর। মন্দিরের চতুর্দিকে ছড়ানো রয়েছে সাপের খোলস ; পাশে একটা নীলকুঠি আর তারই লাগোয়া একটা বড়ো দীঘি।

আপনি যখন এ মন্দির দেখতে ব্যস্ত, তখন দেখবেন দু' একজন স্থানীয় লোকও এসে হাজির হয়েছেন। এঁদের মধ্যে একজন মুরুব্বি গোছের লোকের হাতে রয়েছে ১৯৭৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারীর একখানা খবরের কাগজ। সেই কাগজের একদিকে কালো লাইনের বাক্স আকারে যে সংবাদটি পরিবেশিত হয়েছে তার দিকে সহজেই আপনার দৃষ্টি যাবে। ১৯৭২ সালের ছাপা বইয়েতে ডেভিড্ ম্যাককাচ্চন সাহেব এই মন্দির আবিষ্কার সম্পর্কে যাদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন, তা সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খোদ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মন্দিরটি নিজেদের আবিষ্কার বলে দাবী করেছেন। শুধু তাই নয়—এই প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের চিন্তাভাবনা যে কীভাবে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাতে

পারে তার এক প্রমাণ হল, বালিহাটি গ্রামের এ মন্দিরটিকে জিনশহর গ্রামের মন্দির বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। মোট কথা, এইভাবেই চলছে আমাদের দেশের প্রত্নতত্ত্ব সম্পদ রক্ষার প্রচেষ্টা।

তা যাকগে, মন্দিরটি প্রাচীনত্ব ও গঠন-পরিকল্পনার অভিনবত্ব একান্তই বিস্মিত হয়ে দেখার মত। তাছাড়া মেদিনীপুর জেলায় মুসলমান-পূর্ব যুগের এমন কোন প্রাচীন মন্দির এ পর্যন্ত যখন পাওয়া যায়নি তখন এ মন্দিরটি এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বলেই ধরে নিতে হবে। এ গ্রামে জৈন মূর্তির নিদর্শন থাকায় বা পাশের গ্রামের নাম জিনশহর হওয়ায় বেশ বোঝা যায়, এ মন্দিরটিও ছিল কোন জৈন তীর্থঙ্করের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, মধ্যভারতের বিশেষ করে খাজুরাহের কতকগুলি মন্দিরের মত মূল মন্দিরের চতুর্দ্দিকে পাথর ঘেরা প্রদক্ষিণ পথ—যা পূর্ব ভারতের মন্দিরগুলোতে বড় একটা দেখা যায় না।

বনজঙ্গল সরিয়ে মন্দিরের ভেতরে ঢুকতে গেলে একটু ভয় হতে পারে। কতদিন ধরে যে অব্যবহার্য হয়ে রয়েছে কে জানে। প্রবেশপথটি হল স্বড়ঙ্গের মত এবং ভেতরে আট ফুট গেলে তবেই পাওয়া যাবে মূল মন্দির—যেখানে বিগ্রহ অধিষ্ঠিত ছিল। এই প্রবেশপথের স্বড়ঙ্গপথেই আবার ওপরে ওঠার সিঁড়ি আছে বাঁদিকের দেওয়ালে। তদুপরি মূল মন্দিরের লাগোয়া দুদিকে দুটি ছোট ছোট কুঠুরীও দেখা যাবে—যা হয়ত একসময়ে ভাঁড়ার ঘর বা ভোগ তৈরীর ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হত।

কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা হল, প্রায় হাজার বছরের এমন এক গুরুত্বপূর্ণ মন্দিরের আজও কোন সংরক্ষণের ব্যবস্থা বা সংস্কার হয়নি এবং আদৌ হবে কিনা কে জানে? অথচ এ মন্দিরের খবর জানাজানি হওয়ার পর 'বড় বিদ্যে করেছি জাহির'আলা গবেষকরা ছুটোছুটি ফেলে দিয়েছেন—কীভাবে এ মন্দির সম্পর্কে জটিল তত্ত্বের ব্যাখ্যা হাজির করে সংস্কৃতি জগতে নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করে আখের গুছিয়ে তুলতে পারা যায়!

---

২২. স্মৃতি রক্ষার প্রাচীন এক প্রথা : সন্ধান ও সংরক্ষণ

বঙ্গ-সংস্কৃতি ভাণ্ডারের বহুবিধ ঐশ্বর্য নিয়ে অদ্যাবধি বিচিত্র সব আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে। কিন্তু গ্রামীণ সমাজজীবনের এমন অনেক অনালোচিত আচার-আচরণ ও প্রথাকে কেন্দ্র করে একদা যেসব লৌকিক ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠেছিল তার সবকিছু বিবরণ আজও সংস্কৃতি-অভিমানীদের দৃষ্টির নাগালে পৌঁছোয় নি। এর কারণ কিন্তু খুবই স্পষ্ট। হয় সেসব তুচ্ছ বিষয়গুলি নিয়ে ইংরেজ সাহেবরা ইতিপূর্বে তেমন কিছু বিবরণ রেখে যাননি, নয়তো বা দেশের ছোট-বড় কোন সংগ্রহশালাতে এইসব লৌকিক ধ্যানধারণা-প্রসূত সাংস্কৃতিক উপকরণ সংগৃহীত হ'য়ে গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণের সহায়ক হ'য়ে উঠতে পারে নি বলেই এত অনীহা। এই অবস্থায় আঞ্চলিক ও গ্রামীণ সংগ্রহশালাগুলির শুধুমাত্র মূল্যবান সাংস্কৃতিক নিদর্শন সংগ্রহের উপর দৃষ্টি দেওয়া ছাড়াও, আমাদের লৌকিক ধ্যান-ধারণাসঞ্জাত এইসব অবহেলিত উপকরণগুলিরও সন্ধান ও সংগ্রহের উপর জরুরীভাবে দৃষ্টি দেওয়া একান্তই আবশ্যক হয়ে পড়েছে। 'জরুরী' বলার কারণ এজন্যই যে, গ্রামাঞ্চলের দ্রুত রূপান্তরের জন্য আমাদের গ্রাম্য-সমাজের যেভাবে আধুনিকীকরণ পর্ব চলেছে, তার ফলে ভবিষ্যতে সেই গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপকরণের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর হ'য়ে উঠবে।

বঙ্গ-সংস্কৃতির যে অবহেলিত উপকরণটি নিয়ে এই প্রসঙ্গের অবতারণা সেটির মূল বিষয় হল, মৃতের প্রতি নিবেদিত স্মারকস্তম্ভের এক প্রাচীন প্রথা। এখন উদাহরণ দিয়েই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করা যেতে পারে। সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার পুরাকীর্তি সম্পর্কিত এক গ্রন্থ রচনার কাজে জেলার বিভিন্ন গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ানোর সময় অনেকগুলি ঝামা-পাথরের মূর্তি অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় নজরে আসে। মেদিনীপুর সদর থানার এলাকাধীন জোয়ারহাটি গ্রামে পুরাতন কটক রোডের ধারে এমন একটি মূর্তি দেখে থমকে দাঁড়াতে হয়। মূর্তিটি আয়তাকার ঝামা-পাথরের এবং সেটির গায়ে এবড়োখেবড়োভাবে খোদিত হয়েছে তলোয়ার হাতে এক

যোদ্ধার অশ্বারূঢ় মূর্তি। এছাড়া এখানে আরও কতকগুলি এই ধরনের মূর্তি ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে দেখা যায়। স্থানীয় অধিবাসীরা এগুলিকে জোয়ারবুড়ী ঠাকুর বলে পূজো করে থাকেন এবং এই ঠাকুরের নামানুসারে নাকি সে গ্রামের নামকরণও হয়েছে জোয়ারহাটি। কাছাকাছি হরিশপুর গ্রামের কাছেও এই ধরনের বেশ কিছু মূর্তি দেখা যায় যা স্থানীয়ভাবে চাইবুড়ি ঠাকুর নামে পরিচিত। খড়্গপুর থানার বেনাপুরের নিকটবর্তী কাশীজোড়া ও শ্যামলপুর গ্রামের কাছে রাস্তার ধারে ও এই থানা এলাকার সুলতানপুর গ্রামের কুমরেশ্বর শিবমন্দিরের প্রাঙ্গণে এবং নারায়ণগড় থানার চকমকরামপুর, হিরাপাড়ী ও পাকুড়সেনী গ্রামেও এইরকম ঢাল-তলোয়ারধারী অশ্বারূঢ় যোদ্ধার পাথর খোদাই মূর্তিও বেশ কিছু দেখা যায়।

কিন্তু এই মূর্তিগুলি যে কিসের মূর্তি সে সম্পর্কে কেউই কোন আলোকপাত করতে পারেন নি। মূর্তিগুলি ঝামাপাথরে তৈরী; সুতরাং সেগুলির উপর খোদাই ভাস্কর্য যে কোনক্রমেই মনোরম হতে পারে না সেকথা অনস্বীকার্য। তাই এই এলোমেলো তক্ষণের কাজ দেখে আমাদের দেশের নান্দনিক শিল্প-সংগ্রাহকরা এগুলিতে তেমন গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজন মনে করেন নি। অথচ মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে এই পাথর-খোদাই যোদ্ধাদের মূর্তি কেন যে পথে-প্রান্তরে অর্ধপ্রোথিত করে রাখা হয়েছিল তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও উপ-স্থাপিত করা হয়েছে বলে জানা নেই। অন্যদিকে, যদিও-বা এই ধরনের কোন মূর্তি সম্পর্কিত বিবরণ পাওয়া যায় সেগুলি এতই বিভ্রান্তিকর যে তা কোন-মতেই গ্রহণ করা যায় না। বিলেতী সাহেবদের লেখা ইতিহাস ও গেজেটিয়ারে এই জেলার নয়াগ্রাম থানার খেলাড়গড়ে রক্ষিত এমন একটি ক্লোরাইট পাথরে নির্মিত পুরুষ ও নারীর অশ্বারূঢ় মূর্তি সম্পর্কে এক বিবরণ প্রকাশিত হওয়ায়, এ-মূর্তি প্রতিষ্ঠার সমাজতত্ত্ব নিয়ে গভীরে প্রবেশ করার বদলে স্থানীয় ইতিহাস-রচয়িতারা (দ্রঃ যোগেশচন্দ্র বসু : মেদিনীপুরের ইতিহাস) এটিকে পারসীক ও শক প্রতিমূর্তির অথবা ভারতীয় দেবতা কামদেব ও রতিমূর্তির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত বলে মত প্রকাশ করেছেন, যা একান্তই অবাস্তব চিন্তা-ভাবনা।

যাই হোক, পূর্ব-বর্ণিত ঐ ক'টি মূর্তিই নয়, এই জেলার নানাস্থানে অনুরূপ আকৃতির ভিন্ন ভিন্ন আরও অনেক মূর্তি নজরে পড়েছে। মেদিনীপুর শহরের আবাসগড়ে যাবার পথে প্রায় ছ'ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট এমন একটি ঝামাপাথরে

খোদাই নারীমূর্তি অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় দেখা যায়। এই বিশালাকার মূর্তিটি সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে কেউ কোন আলোকপাত না করলেও কাছাকাছি বাড়ুয়া গ্রামে খোঁজ পাওয়া গেল যেখানে নাকি এমন বহু মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আবাসগড় থেকে প্রায় দু' কিলোমিটার উত্তরে বাড়ুয়া গ্রামের সাতনারাণী-তলা নামে কথিত এক গাছতলায় দক্ষিণমুখী করে বসানো এমন ন'টি মূর্তি নজরে পড়ে। স্থানীয়ভাবে এ মূর্তিগুলিকে বলা হয় সাতনারী বা সাতভগিনী বা সাতবোনী। আবার কেউ কেউ বলেন সাতরাণী, যা থেকে বেশ বোঝা যায়, আধুনিক ধর্মকর্মের প্রলেপ নিয়ে এরাই সাতরাণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু এখানে নারী বা বোন অথবা রাণী যাই হোক না কেন, সেগুলি সংখ্যায় সাতের বদলে ন'টি। এমনও হতে পারে, প্রথমে সাতটি মূর্তি স্থাপনের পরই নামকরণ হয়ে গেছে সাতবোনী বা সাতরাণী। কিন্তু পরে আরও দু'টি যুক্ত হলেও নামের হেরফের ঘটে নি। এখানকার ঝামাপাথরের উপর খোদাই মূর্তিগুলিতে দেখা যায়, তীরন্দাজ, ছত্রধারী, ঢাল তলোয়ারধারী প্রভৃতির প্রতিকৃতি। আয়তাকার পাথরের উপর উৎকীর্ণ এ মূর্তিগুলির উচ্চতা কোনটি দু'ফুট বা চারফুট, আবার কোন কোনটি পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচফুট। প্রতি বছর মাঘ মাসের চার তারিখে গ্রামবাসীরা এখানেই উনুন খুলে মাটির হাঁড়িতে দুধ, চাল আর গুড় দিয়ে পরমান্ন তৈরি করে এইসব মূর্তির উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন। এই উপলক্ষে এখানে একটি মেলাও বসে থাকে। স্থানীয় গ্রামবাসীদের বক্তব্য যে তাঁরা বহুদিন ধরেই এইসব মূর্তির উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করে আসছেন, কিন্তু এগুলি যে কোন্ দেবতা বা কি উদ্দেশ্যে এখানে এগুলিকে বসানো হয়েছে তা তাঁদের জানা নেই।

তবে, মূর্তিগুলির সনাক্তকরণ সম্ভব না হলেও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম-প্রান্ত জুড়েই এই মূর্তি প্রতিষ্ঠার এলাকা চিহ্নিত করা যায় এবং এই সীমানা ছাড়িয়ে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বিহারের সিংভূম জেলা পর্যন্ত এই এলাকাকে যে বিস্তৃত করা যায় তার প্রমাণ হ'ল, ঐসব জেলার নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত এই প্রকারের মূর্তির সমাবেশ। দেখা যায়, এহেন মূর্তিস্থাপনের প্রথা শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা বিহারেই সীমাবদ্ধ নয়, এর প্রভাব মধ্যপ্রদেশ থেকে সৌরাষ্ট্র পর্যন্তও বিস্তৃত হয়েছে।

সম্প্রতি জানা যায়, মধ্যপ্রদেশের দুরগ জেলার নারীটোলা গ্রামেও এই প্রকৃতির প্রায় শ'দেড়েক মূর্তি এক জঙ্গলের মধ্যে উঁচু ঢিবিতে অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় রয়েছে এবং ঐ মূর্তিগুলির বর্ণনার সঙ্গে পূর্বোক্ত বাড়ুয়া গ্রামের মূর্তিগুলির যথেষ্ট সাদৃশ্যও আছে। এখানকার অধিকাংশ মূর্তিগুলিও ঢাল-তলোয়ারধারী অশ্বারূঢ় সৈনিক এবং কতকগুলি নারীমূর্তিও রয়েছে যাদের দু'টি হাত উপরের দিকে প্রসারিত। নারীটোলা গ্রামটির আশেপাশে গোণ্ড ও হলবা প্রভৃতি উপজাতীয় সম্প্রদায়ের বসবাস, যারা বিশেষভাবে এই মূর্তি-গুলিকে দেবতুল্য জ্ঞান করেন এবং তাঁদের ধারণায় কোন এক অতীতকালে একদল যোদ্ধা স্থানীয় কোন এক রাজার রাজ্য আক্রমণে এসে অতিপ্রাকৃত শক্তিবলে পাথরে রূপান্তরিত হয়ে যান। সেজন্য বৎসরের এক নির্দিষ্টদিনে বাৎসরিক উৎসবে এইসব মূর্তির কাছে জনসাধারণ নারকেল ও মুরগী মাংস নিবেদন করে থাকেন। (দ্রঃ **Monthly Bulletin of the Asiatic Society : September, 1971.**)

অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাবে মানুষ বা যোদ্ধা যে পাথরের স্তম্ভে পরিণত হয় নারীটোলার এ উদাহরণের মত আমাদের পশ্চিমবাংলার বাঁকুড়া জেলার ছাতনাতেও তেমন দৃষ্টান্ত রয়েছে। ছাতনার চার-পাঁচফুট উচ্চতাবিশিষ্ট অনুরূপ ধরনের শিলাস্তম্ভ সম্পর্কে বিনয় ঘোষ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেখানেও এইসব মূর্তি নিয়ে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তার সারমর্ম হল, কোন এক সময়ে শত্রুপক্ষ সামন্তভূমের রাজধানী ছাতনা আক্রমণ করায় রাজার কুলদেবী বাসুলী যে মায়াসেনা সৃষ্টি করে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করেছিলেন তারাই প্রভাতের আলোকে পাথরে রূপান্তরিত হয়ে যায় (দ্রঃ বিনয় ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি)। সুতরাং শিলাস্তম্ভগুলি যেখানেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, এগুলিকে ঘিরে বহু কাহিনী ও কিংবদন্তী রচিত হয়েছে, যা তথ্য-নির্ভরতার অভাবে যথেষ্ট কল্পনা-পক্ষ বিস্তার করেছে।

মধ্যপ্রদেশের মত সৌরাষ্ট্রের জুনাগড় জেলার রটাডি গ্রামেও এই ধরনের মূর্তি স্থাপনের বেশ কিছু উদাহরণ পাওয়া গেছে। এখানে শুধু মূর্তির সমাবেশই নয়, এখনও পর্যন্ত এই প্রকৃতির মূর্তি নিবেদন করার প্রথাও সেখানে প্রচলিত রয়েছে, যার আলোকে আমরা পশ্চিমবাংলার এইসব পাথরের ফলক প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করতে পারি। সৌরাষ্ট্রের এই রটাডি গ্রামেও দেখা যায়, অপঘাত মৃত্যুজনিত কারণে মৃতের আত্মার শান্তি কামনায় পাথরের মূর্তি

নিবেদন করা হয়। সেজন্য যুদ্ধে মারা যাওয়ার কারণে, মৃতের উদ্দেশ্যে অশ্বারোহী যোদ্ধার মূর্তি বসানো হয়েছে। এছাড়া কোন দুর্ঘটনায়, সাপের কামড়ে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে, সতীরূপে সহমরণে বা আত্মহত্যা করে মারা গেলেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পাথর খোদাই 'খাম্ব' বসানোর রীতি আজও সেখানে প্রচলিত রয়েছে। 'খাম্ব' বা বাংলায় 'খাম্বা' কথাটির অর্থ ই হল স্তম্ভ যা এখানে স্মারক-স্তম্ভ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। এইসব মূর্তির উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর দেওয়ালীর সময় নারকেল এবং ভাতের ভোগও নিবেদন করেন গ্রামবাসীরা। তবে এখানকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, সতীরূপে সহমরণে মৃত্যুবরণ করায় যে স্মারকস্তম্ভ প্রস্তুত করা হয়েছে সেটিতে রয়েছে খোদাই করা হাতের চিহ্ন। (দ্রঃ **Eberhard Fischer & Haku Shah : Rural Craftsmen And Their Work, pp. 39-45**)।

সুতরাং এসব স্মৃতিস্তম্ভ প্রোথিত করার উদাহরণ দেখে আমাদের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, স্মারকস্তম্ভ নিবেদন করার এ প্রথা যথেষ্ট সুপ্রাচীন। সিংভূম জেলায় কোলদের সমাধিতেও এমন সাদামাটা পাথর পুঁতে দেওয়ার রীতি আজও প্রচলিত রয়েছে। এছাড়া ভারতের অন্যান্য জাতি-উপজাতির মধ্যেও, বিশেষ করে নীলগিরি পাহাড়ের আদিবাসীরা এইসব স্মৃতিস্তম্ভকে বলে থাকেন 'বীরকল্লু', অর্থাৎ কল্লু কথার অর্থ পাথর হলে, তা হয় বীরের পাথর বা বীরস্তম্ভ। পশ্চিমবাংলার হুগলী জেলার আরামবাগ অঞ্চলে এইসব স্মৃতিস্তম্ভকে বলা হয় 'বীরকাঁড়' (দ্রঃ বিনয় ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি)।

স্মৃতিস্তম্ভ বা বীরস্তম্ভ প্রতিষ্ঠার পিছনে যে সমাজতত্ত্ব আত্মগোপন করে আছে, সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা গেলেও, পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে এখনও বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান আবশ্যক। তবে সৌরাষ্ট্রে সতীর সহমরণে মৃত্যুর কারণে সেখানে পাথরফলকে হাত খোদাই করে দেওয়ার রীতি আবহমানকাল ধরে প্রচলিত এবং সেই প্রথাটির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে সতীর সহমরণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত স্মারকস্তম্ভেরও যেন মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গেও সহমরণে মৃতাদের স্মৃতিরক্ষায় একদা যে ফলক ব্যবহারের রীতি ছিল তাতেও পাঁচ আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। কয়েক বৎসর আগে হাওড়া জেলার বালী থানার এলাকাধীন বালীর ঘোষপাড়ায় একটি বেশ বড়ো আকারের

পোড়ামাটির ফলক মাটির ভেতর থেকে আবিষ্কৃত হয়। সেটির একপিঠে লেখা আছে :

"ব্রজনাথ
বিমলা
সতীদাহ
১২০৬"।

এবং অন্য পিঠে দু'টি হাতের ছাপের নক্সার সঙ্গে "শ্রী ম সু ঘো" ও "সন ১২৮৫" এই কথাগুলি উৎকীর্ণ দেখা যায়। বেশ বোঝা যায়, আঠার-শতকের শেষদিকে একসময় সহমরণ অনুষ্ঠানের স্থানে এহেন সতীদাহের স্মারকফলক প্রতিষ্ঠা করার রীতি প্রচলিত ছিল।

সুতরাং স্মৃতিরক্ষার এই প্রাচীন প্রথাটি কিন্তু একস্থানেই বা একসময়েই থেমে থাকেনি এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তারই এক রকমফের দেখা যাচ্ছে। এছাড়া ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার ফলে এবং সভ্যতার আধুনিকীকরণের পাল্লায় পড়ে অনেকক্ষেত্রে এমনই পরিবর্তন হয়েছে যে এর আসল রূপটি চেনা বড় দুষ্কর হয়ে পড়েছে। সেজন্যই দেখা যায় একদা যেখানে সতীর সহমরণের মত অপঘাত মৃত্যুতে হাতের ছাপ খোদাই পাথরের স্তম্ভ বা ফলক নিবেদনের প্রথা প্রচলিত ছিল, সেখানে পরবর্তীকালে বিশেষ করে আমাদের গ্রাম-বাংলায়, মৃতের স্মৃতিরক্ষায় ছোটখাট মন্দির নির্মাণের রীতি অনুসৃত হয়েছে। এরই সূত্র ধরে দেখা যায়, মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানায় হরিনারায়ণপুর গ্রামে আগুনখাগীর মাড়ো নামে সতীর সহমরণের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এমন একটি মন্দির নির্মাণ করে তাতে লিপিফলকও নিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যা থেকে আমরা স্মৃতিরক্ষার সেই প্রাচীন প্রথার ধারাটিকে অনুসরণ করতে পারি।

সুতরাং কেবল পাথরের স্তম্ভের বদলে এই স্মৃতিমন্দির নির্মাণটি যদিও উপরতলার দান, কিন্তু স্মৃতিরক্ষার এই প্রথাটি বহুকালের এক প্রথা, যা মানব-সংস্কৃতির অনেক নীচুতলার দান। তাই মৃতের উদ্দেশ্যে পাথরখোদাই স্তম্ভ নিবেদন করার যে আবহমানকালের প্রথা তা ভারতের প্রায় সর্বত্রই এক খাতে বয়ে এসেছে এবং সে হিসেবে মেদিনীপুর জেলার নানাস্থানে রক্ষিত এইসব পাথরের মূর্তিগুলিও সেই প্রাচীন প্রথারই এক দৃষ্টান্ত।

তবে এই পাথুরে স্মারকস্তম্ভ সংস্কৃতির ধারা যে আবার অন্য খাতেও প্রবাহিত হয়েছে তার উদাহরণ প্রসঙ্গত তুলে ধরা না হলে বিষয়টি অস্পষ্ট থেকে

যেতে পারে। এ জেলার কেশিয়াড়ী থানার কিয়ারচাঁদ নামক এক প্রান্তরে এমন বহু পাথরের স্তম্ভ দেখা যায় এবং একসময়ে নাকি এমন পাঁচ-ছশো পাথরের স্তম্ভ ছিল। ফলে এগুলি সম্পর্কেও কল্পনানির্ভর বহু কিংবদন্তী গজিয়ে উঠেছে। যোগেশচন্দ্র বসু তাঁর লেখা 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে এ সম্পর্কে দু'টি অনুমাননির্ভর ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। তাঁর মতে, হয়ত বা প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম নিবাসীদের মৃত আত্মীয়-স্বজনের সমাধিস্তম্ভ, অথবা আঠার-শতকের জহর সিংহ নামে কোন স্থানীয় ভূস্বামী কর্তৃক এই ধরনের হাজারখানেক স্তম্ভ বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহপূর্বক শত্রুপক্ষের বিভ্রম সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আসলে এখানকার এ স্তম্ভগুলি কিন্তু পূর্বে উল্লিখিত স্তম্ভগুলির মত আয়তাকার নয় বা এর গায়ে তেমন কোন মূর্তিও খোদাই করা নেই। মূলতঃ এটি দেখতে ওড়িশা রীতি প্রভাবিত শিখর-দেউলের আকৃতিসদৃশ এক ক্ষুদ্র সংস্করণ এবং বিশেষভাবে সেগুলিতে দেউল-মন্দিরের আমলক অংশটির ভাস্কর্য পরিস্ফুটিত। একসময়ে কোন মনস্কামনা পূরণের জন্য সেই দেবতার মন্দির-চত্বরে এই প্রকৃতির ক্ষুদ্রাকার মন্দির নিবেদন করার রীতি প্রচলিত ছিল, যে প্রথা আজও ওড়িশার বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়। জৈনধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও একদা এইরকমের সুদৃশ্য খোদাই করা আমলকযুক্ত ক্ষুদ্রাকার শিখরমন্দির নিবেদন করার প্রথা যে চলিত ছিল তার এক দৃষ্টান্ত দেখা যায়—ওড়িশার ভুবনেশ্বরের কাছে খণ্ডগিরির জৈনমন্দিরের চত্বরে এমন অজস্র ক্ষুদ্রাকার নিবেদন-মন্দিরের অবস্থাপন। সুদূর পূর্বভারতের নাগাল্যাণ্ডের ডিমাপুরে একদা কাছারী রাজদের রাজত্বকালেও (১৩-১৬ শতক) এমন অনেক পাথর খোদাই নিবেদন-মন্দিরের অস্তিত্ব দেখা যায়, যা আকৃতিতে দাবার ঘুঁটির মত। উদ্দেশ্য যে একই ধরনের মানত নিবেদনের প্রথা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এছাড়া পুরুলিয়া জেলার মানবাজার থানা এলাকার টুইসামা গ্রামের এক মন্দিরচত্বরে এইপ্রকার বহু ছোট ছোট দেউলাকৃতি স্তম্ভও যে এই মানত উদ্দেশ্যে সংস্থাপিত হয়েছিল তাতে কোন সংশয় নেই। কিন্তু আলোচ্য কিয়ারচাঁদের কাছে বর্তমানে কোন মন্দিরের অস্তিত্ব না থাকলেও একসময়ে যে এখানে এক বিরাট মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল সেটির পাথরের আমলকসহ ভগ্নাবশেষ এখানে লক্ষ্য করা যায়।

মানত হিসাবে ক্ষুদ্রাকার দেউল-মন্দির নিবেদন করার প্রথা কিয়ারচাঁদ

ছাড়াও এ জেলার অন্যত্রও যে প্রচলিত ছিল তার কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। সম্প্রতি অনুসন্ধানকালে ডেবরা থানার ডিঙ্গল গ্রামের নরসিংহ শিবমন্দির, পিঙ্গলা থানার নয়া গ্রামের শীতলা মন্দির এবং নারায়ণগড় থানার গোবিন্দপুরের শিবমন্দিরেও অনুরূপ ক্ষুদ্রাকার ঝামাপাথরের নিবেদন মন্দিরও দেখা গেছে, যা কোনসময় হয়ত মানত হিসেবেই প্রদত্ত হয়েছিল। এছাড়া পূর্বোক্ত বাড়ুয়া গ্রামের নিকটবর্তী কলাইচণ্ডীর মাঠেও এই প্রকারের বেশকিছু স্তম্ভের অবস্থিতি এই মানত প্রথার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। পরবর্তীকালে এই প্রথারই আর একটি মার্জিত সংস্করণ আমাদের এই পশ্চিমবাংলাতেই দেখা যায়, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল বীরভূম জেলার বক্রেশ্বর, যেখানে এই ধরনের অসংখ্য ছোট-বড় মন্দির নির্মাণ করে দেওয়ার রীতি একদা প্রচলিত ছিল।

সুতরাং আলোচিত এইসব তথ্য থেকে আমাদের কাছে যে তিনটি প্রাচীন প্রথাগত রীতির পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়, তার মধ্যে প্রথমটি হল, আদিবাসীদের মৃতদেহ সমাধিস্থ করার পর পাথরের সাধারণ স্তম্ভ প্রোথিত করা, যা প্রত্নতত্ত্বের কথায় বলা যেতে পারে 'মেনহির'। দ্বিতীয়টি হল, প্রিয়জনের মৃত্যুতে বা অপঘাত মৃত্যুতে আত্মার শান্তিলাভের জন্য মূর্তিখোদিত স্মারকস্তম্ভ দেবার এক প্রাচীন প্রথা এবং সব শেষেরটি হল, মানত হিসাবে ক্ষুদ্রাকার দেবালয়সদৃশ স্তম্ভ উৎসর্গ করার প্রথা। তবে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে নানাবিধ আঞ্চলিক সংস্কৃতি সংঘাতের দরুন এ আচার-অনুষ্ঠানের এতই পরিবর্তন ঘটেছে যে, আসল রূপটিকে চিনে বের করা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়েছে। সুতরাং এ পরিবর্তনের সেই তারতম্যের মধ্যে মেদিনীপুর জেলার এই স্মৃতিস্তম্ভ নিবেদনের প্রথাটি অংশীভূত হলেও সেগুলি আজও অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ টিকে রয়েছে।

সেজন্যই আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এগুলি সম্পর্কে জেলাভিত্তিক যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ করে সেগুলির সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস সম্পর্কে আরও গভীর তত্ত্বানুসন্ধান করা। পরিশেষে, এ বিষয়টি নিয়ে যদি আঞ্চলিক বা গ্রামীণ সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন ধরনের স্মারক বা স্মৃতিস্তম্ভ ও নিবেদন-মন্দির সম্পর্কে যথাযথ অনুসন্ধানপূর্বক এলাকাগত ব্যাপ্তি দেখিয়ে একটি মানচিত্র প্রণয়ন করেন তাহলে এবিষয়ে নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের ভবিষ্যৎ গবেষকরা যে যথেষ্ট উপকৃত হবেন, তা বলাই বাহুল্য।

২৩. চমকায় প্রজা বিক্ষোভ

"...চমকায় ব্রাহ্মধর্ম লইয়া এক মহা গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। তথাকার সামান্য কর্মোপজীবি এক ব্যক্তির একটি সন্তান ব্রাহ্মধর্মের আলোকপ্রাপ্ত হইয়া পৌত্তলিকতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে। তজ্জন্য তাহার প্রতিবেশী ও কুটুম্ববান্ধব তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিল। একদিবস তাহারা সকলে চক্রান্ত করিয়া কোন কার্যোপলক্ষে তাহাকে সঙ্গে লইয়া আহার করিবে না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল। তাহা শ্রবণ করিয়া আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র নাগ মহাশয় সেই ব্রাহ্মধর্মানুরাগীর সাহার্য্যার্থ আপনি অগ্রসর হইলেন। তিনি ভিন্ন গ্রাম হইতে সেই জাতীয় প্রায় শতাধিক লোককে আনয়ন করিয়া তাহার সঙ্গে আহার করাইলেন। আহারান্তে তাহারা সকলে 'ব্রাহ্মধর্মের জয়' 'ব্রাহ্মধর্মের জয়' বলিয়া উঠিল। ইহা ঘটিবার পরেই অন্য গ্রামস্থ তজ্জাতীয় সকল লোক সেই কতকগুলি ব্যক্তির সহিত আহারাদি বন্ধ করিয়াছে। সুতরাং তাহারা একঘরে হইয়া পড়িয়াছে...।"

এ এক বাতিল চিঠির অংশবিশেষ; আজ থেকে ১১৭ বছর আগে লেখা। যার উদ্দেশ্যে এই চিঠি লেখা হয়েছিল তিনি হলেন মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীযদুনাথ শীল এবং চিঠির লেখক হলেন পিঙলার শ্রীঈশানচন্দ্র বসু যিনি মেদিনীপুরের ঋষি রাজনারায়ণের সংগঠিত ব্রাহ্মধর্মের প্রসারে একজন উল্লেখযোগ্য সহযোগী ছিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে তাঁর তৎপরতা সম্পর্কে তিনি প্রায়ই ব্রাহ্মসমাজে যেসব প্রতিবেদন পাঠাতেন এটি তারই এক অংশবিশেষ। এ চিঠি থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে সে সময়ে মেদিনীপুর জেলায় ব্রাহ্মধর্ম প্রসারে কিভাবে প্রচারক ও অনুরাগীদের দুস্তর বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বলতে গেলে এটি সে সময়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার সংক্রান্ত এক মূল্যবান দলিল।

এছাড়া ঐ চিঠিতে চমকা গ্রামের ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীনবীনচন্দ্র নাগের যে উল্লেখ পাওয়া গেল, তিনিও যে ঋষি রাজনারায়ণের একজন পরিচিত সুহৃদ ছিলেন তাও আমরা তাঁর লেখা 'আত্মচরিত' থেকে জানতে পারি। জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে রাজনারায়ণ ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে আসেন এবং সেখানে তিনি যেসব কাজ করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মেদিনীপুরে ব্রাহ্মসমাজ

গৃহ প্রতিষ্ঠা। এ সম্পর্কে 'আত্মচরিত'-এ তিনি লিখেছেন: "···কয়েকবৎসর পরে চাঁদা দ্বারা এক সমাজগৃহ নির্মাণ করা যায়। ইহার নির্মাণে ২,০০০ টাকার কিছু অধিক পড়ে, তন্মধ্যে দেবেন্দ্রবাবু (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ৮০০ টাকা দেন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জমিদার নবীনচন্দ্র নাগ, অখিলচন্দ্র দত্ত এবং নীলকমল দে ছিলেন···।"

রাজনারায়ণ বসুর এ আত্মজীবনী থেকে জানা যাচ্ছে আলোচ্য নবীনবাবু ছিলেন পেশায় জমিদার। আর কার্যদক্ষতা সম্পর্কে পূর্বোক্ত ঈশানবাবু আরও লিখেছেন যে, হিন্দুমতে ইন্দ্র দ্বাদশীতে স্থানীয় বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ও ভূম্যধিকারী-গণ যে ইন্দ্রপূজার অনুষ্ঠান করে থাকেন তাতে সেবার নবীনবাবু 'তাহা উঠাইয়া দিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিয়া পুণ্যাহের কার্য সমাধা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে দেশবিদেশ হইতে নবীনবাবুর বহু সংখ্যক প্রজা ও চমকার সান্নিধ্য গ্রামবাসী অনেক ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কতকগুলিও সমাগত হইয়াছিলেন। সেদিন আমরা উপাসনার পরে ব্রহ্মসঙ্গীত সুধাপানে সমস্তদিন ও অর্ধরাত্রি পর্যন্ত অতিবাহিত করি। নিমন্ত্রিত সকলে নবীনবাবুর এই উৎসাহ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। চমকায় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সেদিন আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল···।'

চমকা গ্রামের নবীনবাবু জমিদার, তাই বহুসংখ্যক প্রজা যে জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ব্রাহ্ম-ধর্মসভায় যোগদান করেন এটাই তো স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু ব্রাহ্ম-ধর্মসভার এই উপাসনায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম দেখে একান্তই চমক লাগে! কি জানি, এক শতাব্দী আগে চমকা গ্রামে জমিদারী সহায়তায় ব্রাহ্মধর্ম প্রচার কিভাবে সংগঠিত হয়েছিল এবং গ্রামের মানুষরাই বা কিভাবে এই নবধর্মকে তাদের হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলেন—এ প্রশ্ন থেকে যায়। অন্ততঃ এ জিজ্ঞাসার কিছুটা জবাব মিললে একটা মূল্যায়ন হয়ত তখন করা সম্ভব হ'ত। তবে চমকা-কাহিনীর এখানেই ইতি টেনে দেওয়া যেতে পারতো, কিন্তু এর সঙ্গে জড়িত পরবর্তী ঘটনা যে এমনভাবে আবিষ্কৃত হয়ে চমক লাগাবে তা কে জানতো?

* * *

সেবারে চলেছিলাম, নিশ্চিন্তা গ্রামের পথে। দক্ষিণপূর্ব রেলপথের মাদপুর ষ্টেশনে নেমে দক্ষিণে এক লাল মোরামের রাস্তা ধরলাম। ব্রিটিশ আমলের তৈরী এক সেচখালের ধার বরাবর সেই রাস্তা। হাঁটাপথেই জেনেছি মাইল

তিনেক দূরে নিশ্চিন্তা গ্রাম; যেখানে রয়েছে খালের উপর স্লুইশ গেট—যা চিনে নেবার পক্ষে সুবিধে। সুতরাং সেখানটা সনাক্ত করতে কোন অসুবিধাই হল না। বেশ জমজমাট জায়গা, ছোটখাটো দোকানপাট এবং আশপাশের চায়ের দোকানে ছেলে-ছোকরাদের অলস জটলা। পূব দিকে মাঠ পেরিয়ে প্রায় আধমাইল তফাতে গ্রামের গাছপালার মাথার উপর দিয়ে এক মন্দিরের চূড়া যেন উঁকি মারছে। ঐ গ্রামটার নাম শুনে কিন্তু চমকে উঠলাম। কেননা ওই গ্রামটাই হল চমকা আর ঐ মন্দিরটাই হল নাগ-'ফ্যামিলি'দের মন্দির।

সুতরাং চমকায় এখন না গেলে কি চলে! ঈশানবাবুর সেই প্রতিবেদন যেন কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। চমকায় হাল আমলের নাগ পরিবারের আভিজাত্য ও ঐশ্বর্য চমকে দেবার মত না হলেও সে-পরিবারের ইঁটের নবরত্ন মন্দিরটি দেখে সত্যিই চমক লাগে। যদিও অবহেলা-অনাদরে মন্দিরের চারপাশ জঙ্গলে ঢেকে গেছে, তাহলেও মন্দির দেওয়ালে পোড়ামাটির সজ্জা একান্তই মুগ্ধ হয়ে দেখার মত। নাগেদের গৃহদেবতা শ্রীধরজীউর জন্য এ মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল আজ থেকে ১২৫ বছর আগে। মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় এ-পরিবারের অযোধ্যারাম নাগের অর্থানুকুল্যে এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা এবং মন্দির-স্থপতির কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন চেতুয়া-দাসপুর থেকে আগত দু' জন মিস্ত্রী। এঁদের একজন হলেন ঠাকুরদাস শীল এবং অন্যজন গোপাল চন্দ্র। তাঁদের দুজনের হাতে তৈরি পোড়ামাটির ফলকে যেসব ভাস্কর্য রূপায়িত হয়েছে তাতে রয়েছে কৃষ্ণলীলার নানান কাহিনী যায় অক্রুরলীলা, নৌকাবিলাস, বস্ত্রহরণ, কালীয়দমন, পুতনা-বকাসুর বধ প্রভৃতি। তারপর রামরাবণের যুদ্ধ, সেই সঙ্গে তাড়কা রাক্ষসী বধ থেকে রাম বিবাহ, অভিষেক, বনবাস, সূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদন, মায় রাবণের সীতা-হরণ থেকে জটায়ুবধ। এছাড়া আছে শিববিবাহ, দুর্গা, কমলে-কামিনী ও মহন্ত সমাজের জীবনধারার চালচিত্র। চোখ-ধাঁধানো এই 'টেরাকোটা'-সজ্জা খুঁটিয়ে দেখতে গেলে বেশ সময় লাগে।

এইসঙ্গে মন্দিরে কাঠের দরজাটিও মনোহর কারুকাজে পরিপূর্ণ। এ কপাটেরও খোপে খোপে রয়েছে ঐ টেরাকোটাসদৃশ অলঙ্করণ, যার বিষয়বস্তু হল দশ অবতারের মূর্তি-ভাস্কর্য। চমকার এ মন্দির দেখতে দেখতে চমকিত হলেও হঠাৎ চমকে উঠতে হয় যখন শোনা যায় এ মন্দির প্রতিষ্ঠাতার বংশধরই হলেন ব্রাহ্মধর্মের পৃষ্টপোষক আমাদের পূর্বকথিত বাবু নবীনচন্দ্র নাগ।

পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁর অদম্য লড়াই করার বিবরণ আমরা যে লিখিত কাগজপত্র থেকেই জেনেছি, তা আগেই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু ভেবে কূল-কিনারা পাইনি, সম্পত্তির মালিক হওয়া সত্বেও পোড়ামাটির পুতুলসজ্জা নিয়ে বিজ্ঞাপিত এ মন্দিরটিকে কিভাবে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার হাত থেকে তিনি রেহাই দিলেন? এ মন্দির ভেঙ্গে দিলে কার কি বলার ছিল? এটা তার সুমতি না পরাজয়ের পরিচয়?

তবে শেষদিকে নবীনবাবুর জীবনে বেশ বিপদ ঘনিয়ে আসছিল। বিদেশী শাসকদের মদতে দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার নাগ মহাশয় খাজনা আদায়ে যেমন এক ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি জমিদারী তেজ দিয়ে প্রজাদের অন্তরে ব্রাহ্ম উপাসনার বীজ পুঁততে যেয়ে অলক্ষে যে তিনি অপ্রিয় হয়ে পড়ছিলেন, তা তিনি মোটেই বুঝতে পারেন নি। অতি দর্পের ঘোরে থাকলে হয়ত এমনই হয়। একেই তো তার জমিদারীর নিয়ম ছিল, ঢেঁড়া পেটানোর সঙ্গে সঙ্গেই খাজনা আদায় দিতে হবে প্রজাদের, অন্যথায় পরিত্রাণ নেই। জমিদার ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী হলে কি হবে, জমিদারী চালাবার যে সব নিয়মকানুন চালু আছে তা থেকে তো আর তিনি পেছিয়ে আসতে পারেন না। তাই খাজনা অনাদায়ে শাসন-পীড়ন, তদুপরি ভিটে-মাটি উচ্ছেদের বিধান তো ছিলই। লোকে এই জন্যেই ছড়া বানিয়েছিল : 'ডুমুর ডুমুর বাজনা, নবীন নাগের খাজনা।' খাজনার উপরেও ছিল নতুন ধর্ম প্রচারের বাজনা। শুধু নিরীহ প্রজাই নয়, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদেরও যে ব্রাহ্মউপাসনায় ধরে আনা হত, তার কাগুজে প্রমাণও তো দেখতে পাই।

সুতরাং পরিণতি যা হবার তাই হল। জমিদার দরদী ব্রিটিশ সরকারের রক্তচক্ষু শাসনকে উপেক্ষা করেই প্রজারা কোমর বেঁধে দাঁড়ালেন। শেষ অবধি ধূমায়িত প্রজাবিক্ষোভ এক চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল। ফলস্বরূপ বিরাশীটি মৌজার অধিকারী ব্রহ্মজ্ঞানী জমিদার একদিন পথে সম্মিলিত প্রজাদের লাঠি-বল্লম-সড়কির আঘাতে প্রাণ দিলেন। নিগৃহীত প্রজাদের এই রুখে দাঁড়ানোর কাহিনী আজ একান্ত অজানিত হলেও সে ইতিহাস এখনও এখানকার মানুষ ভুলতে পারেনি। সময়ে-অসময়েও তাই স্মরণ করে। যেন মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চায় মদগর্বী হওয়ার কি করুণ পরিণতি! চমকা গ্রামের মাটিতে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের সেই অমোঘ বিধানের কথা স্মরণ করে একান্তই যেন চমকে উঠতে হয়!

২৪. মুণ্ডমারীর ইতিকথা

বালিচক থেকে পিঙ্গলা যাবার পথে বাস এমন এক স্টপেজে দাঁড়ালো, যেখানে কনডাক্টর হাঁক পাড়লো 'মুণ্ডমারী, মুণ্ডমারী' ব'লে। চমকে উঠলাম নাম শুনে; খেজুরী থানায় এই নামে এক গ্রাম আছে বলে শুনেছি, এখানেও তাহলে ঐ নামে আর এক গ্রাম পাওয়া গেল। কিন্তু গ্রামের নাম মুণ্ডমারী হওয়ার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে, তা নিয়ে ভেবে চিন্তে তখন কোন কূলকিনারা পেলাম না। কিন্তু পরে জানা গেল, মুণ্ডমারীর ইতিহাস; ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ব্রজনাথ চন্দ্রের লেখা 'মেদিনীপুর প্রদেশ নিবাসী শোলাঙ্কি বা শুক্লিজাতির আদি বৃত্তান্ত' নামের এক পুস্তিকা থেকে।

ব্রজনাথবাবু তাঁর এই পুস্তকটি রচনার মালমসলা সংগ্রহ করেন প্রচলিত কিংবদন্তী ছাড়াও 'তিন-চারশো বছরের প্রাচীন' এক পুঁথির অনুলিপি থেকে যা ছিল উৎকলাক্ষরে তালপাতায় উৎকীর্ণ। তিনি লিখেছেন, '...পশ্চিম-প্রদেশবাসী কতকগুলি শোলাঙ্কি রাজপুত যবনদিগের ভয়ঙ্কর অত্যাচারে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া তীর্থপর্যটন করিতে করিতে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের দর্শন করিয়া জাহাজপুরের (জাজপুর ?) পথে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন যে, তাঁহারা মেদিনীপুর জেলার সুপ্রসিদ্ধ নন্দকাপাসিয়ার বান্দ নামক সুপ্রসিদ্ধ বর্ত্ম অবলম্বনেই এতদ্দেশে সমাগত হইয়াছিল। এই প্রাচীন রাজবর্ত্মের ভগ্নাবশেষ এখনও স্থানে স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়। (এ পথটি সম্পর্কে ইতিপূর্বে 'পথের সন্ধানে' শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা করেছি—লেখক)। কথিত আছে তাঁহারা এই জেলায় আগমন করিয়াই মহামায়ার প্রসাদে বনমধ্যে ভুড়ভুড়ী কেদার নামক বর্তমান উষ্ণ প্রস্রবণটি (এ প্রস্রবণটি সম্পর্কে "যে সব ঝর্ণাধারার মাহাত্ম্য নিয়ে মন্দির" শীর্ষক অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।) দেখিতে পান এবং তথায় চাপলেশ্বর বা কেদারেশ্বর নাবক অনাদিলিঙ্গের পূজা প্রকাশ করেন। পরে তাঁহারা নিকটবর্তী কোন স্থানে গড় নির্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন এবং উক্ত স্থান তাঁহাদিগের দলপতি বীরসিংহের নামানুসারে বীরসিংহপুর নামে

অভিহিত হয়। ...বীরসিংহ নির্মিত গড়ের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার দুই পার্শ্বে মুণ্ডমরাই ও গর্দ্দানমরাই নামক দুইটি মৃত্তিকাস্তূপ অবস্থিত। কথিত আছে বীরসিংহ লুণ্ঠনোপজীবী...জাতির উচ্ছেদসাধন জন্য তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ধৃত দস্যুদিগকে চণ্ডিকাদেবীর নিকট বলি প্রদান করিয়াছিলেন ; এইরূপ সাতশত দস্যু নিহত হইয়াছিল। বীরসিংহ হত দস্যুদিগকে মুণ্ড ও গর্দ্দান যে দুই বিভিন্নস্থানে' প্রোথিত করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি মুণ্ডমরাই ও গর্দানমরাই নামে অভিহিত হইতেছে।...তদবধি এই দেবী মুণ্ডেশ্বরী ও তাঁহার অধিষ্ঠিত গ্রাম মুণ্ডমারী নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। কথিত আছে মহারাজ বীরসিংহ সগৌরবে কিছু দিবস রাজ্যশাসনান্তর স্বয়ং কোন মহাসমরে পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। ...তাঁহার মৃত্যুর পর শোলাঙ্কিগণ নিরাশ্রয় হইয়া প্রাণরক্ষার্থে যজ্ঞ-সূত্র পরিত্যাগ করিয়া আত্মসংগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা যে স্থলে সূত্রত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা সূত্রছাড়া নামে অভিহিত হইয়া এখনও বিদ্যমান আছে।'

খোঁজখবর করে জানা গেল, এ জেলার পিঙ্গলা থানার এলাকাধীন বীরসিংহ-পুর গ্রামের লাগোয়া 'মুণ্ডমারী' এবং তারই কাছাকাছি 'সুতছাড়া' নামে দুটি গ্রাম বর্তমান। কিন্তু 'গর্দানমারী'র তো কোন হদিশ পাওয়া যায় না। হতে পারে, 'গর্দানমারী' নামে কোন এলাকা একসময় চিহ্নিত ছিল, পরে সেটেলমেণ্ট জরীপ হওয়ার পর সেটি মুণ্ডমারী মৌজার অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। ফলে পরবর্তী সময়ে এ গ্রাম নামটি অপ্রচলিত হয়ে যায়। সে যাই হোক, গ্রামের নামকরণ কিভাবে সম্পন্ন হয়েছে সে বিষয়ে আলোচ্য পুস্তিকাটি থেকে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া গেল। এবার দেখা যাক, সংগৃহীত পুঁথির ভাষ্যে এ ইতিহাসের যথার্থতা কতখানি ?

আলোচ্য পুস্তিকাটিতে উল্লিখিত হয়েছে, গুজরাট থেকে আগত বীরসিংহ নামে কোন এক শোলাঙ্কি রাজপুরুষ জগন্নাথ দর্শন করে ফেরার পথে তাঁর একশো একজন সামন্তসহ যখন বালিকপুরে (বালীচক ?) বিশ্রাম করছিলেন তখন সেখানে দেবী মঙ্গলা ব্রাহ্মণীর বেশে দেখা দিয়ে বলেন : 'তিঁহ কহেন সিদ্ধকুণ্ড দেখ ওই। এখানে করিলে স্নান সিদ্ধমন্ত্র পাই॥ সে মন্ত্র সাধিলে দেব আসি দেন দেখা। ইহা বলি দেখাইল বটবৃক্ষ শিখা॥' বীরসিংহ

অতঃপর কেদার গ্রামে এসে যে কুণ্ডটির সন্ধান পান সেটি আজও ঐ গ্রামে দেখা যায়।

অন্যদিকে দলবলসহ বীরসিংহের এখানে অবস্থিতির সময় দেশে চুয়াড় দস্যুদের দৌরাত্ম্যে স্থানীয় ভূস্বামীরা খুবই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেজন্য এদেশে এমন একজন বীরপুরুষের আগমনে কাছাকাছি জামনা গ্রামের ক্ষত্রিয় জাতিভুক্ত ভূস্বামী প্রমানন্দ ও বেলুন গ্রামের কায়স্থ ভূস্বামী রামানন্দ বীরসিংহের কাছে দুষ্ট দমনের প্রার্থনা জানিয়ে নিজেদের এই বলে পরিচয় দিলেন: "ক্ষত্রিবংশে প্রমানন্দ জামনায় ছিল। দেবের উদয় দেখি আনন্দ হইল।। রামানন্দ কায়স্থ বেলুনেতে আছে। দুইজন একত্রেতে আইল তার কাছে।। রামানন্দ বলে ভাই বড় ভাগ্যবান। কেদারে আসিয়া কৈল দেবের সন্ধান।। প্রমানন্দ বলে রায় আমি ক্ষত্রিজন। প্রজা নাই দেশে তার শুন বিবরণ।। কেদার রায় বলি এক জমীদার ছিল। পশ্চিম চুয়াড় তারে ছলে ধর‍্যা নিল।" পুঁথির এ বিবরণ থেকে জানা যায়, অতীতে এই এলাকায় কেদার রায় নামে এক ভূস্বামী ছিলেন, যিনি স্থানীয় দস্যুদের হাতে নিহত হন।

সে সময় দেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে স্থানীয় দুই ভূস্বামী বীরসিংহকে দেশের শাসনভার গ্রহণের আহ্বান জানায়: "এইখানে আছে সে থটের চরগণ, নিত্যলুটে রখিতে না পারি দুইজন।। রামানন্দ বলে ভাই রাজ ভার লহ। পাছাই তসেলা দিব দেববল দেহ।"

বীরসিংহ স্থানীয় ভূস্বামীদের নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করাতে যে উত্তর মেলে তা থেকে সে সময়ের স্থানীয় জমিদার ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পরিচয় পাওয়া যায়। পুঁথিতে আছে: "রাজা কতগুলি আছে কি নাম সবার। পরিচয় দেহ ত্বরা কোন গ্রামে ঘর।। রামানন্দ ঘোষ বেলুনে করে বাস। আমি আছি জামনায় বর্ধন দাস।। বলিল দুজন আগে পরিচয়। জামালচকে যাদব পাল সদগোপ আশ্রয়।। কালিদীপায় কামার যে দুইজন থাকে। রসিক রাউৎ বলি এই শ্রীরামপুর চকে।। লইয়া সে সঙ্গিগণ সীমা আড়ি থাকে। আর যত বসতি দেখ অভব্য লোকে। ইতশেলা পায়্যা দুঁহে হইল আনন্দ। পাছই তশেলা লয়্যা আইল প্রমানন্দ।।" পুঁথির এই বক্তব্য অনুযায়ী বেলুন, জামনা ও শ্রীরামপুর গ্রামের হদিশ পাওয়া গেলেও, জামালচক (জলচক?) ও কালিদীপা গ্রামের খোঁজ পাওয়া যায় না।

উপযুক্ত শাসনকর্তার অভাবে চুয়াড় দস্যুদের একত্রিশ বছর ধরে অত্যাচারের ফলে স্থানীয় এলাকা একেবারে উজাড় হয়ে যায়। পুঁথির কথায়ঃ 'উজাড় গিয়াছে কেদার একত্রিশ বৎসর।' এই পরিস্থিতিতে শেষ অবধি বীরসিংহকে ত্রাণকর্তা হিসাবে এলাকার শাসনভার গ্রহণ করার অনুরোধ করা হয় এবং ওড়িশা রাজ্যের এলাকার শাসনকর্তাদের তশলা অর্থাৎ ছাড়পত্রও সংগ্রহ করে দেয় জামনা গ্রামের প্রমানন্দ। 'তসেলা' বা ছাড়পত্র সংগ্রহ সম্পর্কে পুঁথির বিবরণমত ব্রজনাথবাবু লিখেছেন,···"বীরসিংহপুরের যুদ্ধের পর আর একজন সামন্ত সঙ্গে পড়িছাদিগের আশ্রয়ে বাস করেন। (পড়িছাদিগকে সাধারণে পাত্তা বলিয়া থাকে।) এই পড়িছাগণ উড়িষ্যার হিন্দুনরপতিগণের অধীনস্থ কর্মচারী ছিলেন। রাজ্যে উপদ্রব নিবারণার্থ শোলাঙ্কিপতিকে রাজ-শক্তি প্রদান বিষয়ে রামানন্দ ঘোষ ও প্রমানন্দ রায়ের ন্যায় পড়িছাদিগেরও অভিমত ছিল এবং তাঁহারাই উড়িষ্যারাজের নিকট হইতে 'তসেলা' অর্থাৎ আবাদী সনন্দ আনাইয়া দিয়াছিলেন।"

পুঁথির বিবরণ অনুযায়ী 'পাছই তশলা'র অর্থ অনুধাবন করা যায়। পরবর্তী পর্যায়ে বীরসিংহ এলাকার শাসনভার পেয়ে যেভাবে পুরস্কৃত করলেন তার বিবরণঃ "তসেলা পাইয়া চিত্তে আনন্দিত বাড়া। তসেলা পাইয়া প্রমানন্দে দিল ঘোড়া।। রামানন্দে ছিলেন জমিন বারবাটী। দেওয়ান মুচ্ছুদ্দী আমার হও তোমরা জুটি।"

বেশ বোঝা যাচ্ছে, স্থানীয় ভূস্বামীদের 'ঘোড়া' উপহার দেওয়ার মধ্যে ভিন্নদেশী যোদ্ধার বাহুবলের সঙ্গে অশ্ববলও ছিল প্রধান এবং সম্ভবতঃ এর ফলেই তিনি যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন বলে স্থানীয় মানুষজনের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিলেন। অন্যদিকে 'ফিউড্যাল লর্ড'-দের বিরুদ্ধে সাধারণ প্রজার অভ্যুত্থানই হয়ত সে সময় স্থানীয় জমিদারদের চোখে চুয়াড় বা ডাকাতের শামিল বলে গণ্য হয়েছিল কিনা তা কে বলতে পারে? ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখি, একদা এদেশে বিদেশী শাসনকর্তা ইংরেজরা জঙ্গলমহলের স্থানীয় অধিবাসীদের অসভ্য চুয়াড় আখ্যা দিয়ে তাঁদের কৃত গণবিদ্রোহকে হেয় করার জন্য কিভাবে চুয়াড় বিদ্রোহ বলে নামকরণ করেছিলেন।

কিন্তু সে যাই হোক, ব্রজনাথবাবুর কথায় জানা যায়, অত্যাচারীরা ছিলেন 'নীচ জাতীয়' 'বাগতি ও ঘোড়ই' জাতিভুক্ত এবং তাদের সর্দার হলেন ডালি ভূঞ্যা। সুতরাং ভিনদেশী অন্যের হাতে শাসনভার তুলে দেওয়াকে সহজ-

ভাবে এরা গ্রহণ করবেন কেন ? পুঁথিতে তাই লেখা হয়েছে 'পরগণা করিতে লুট ডালি ভূঞা এল', যার কিনা 'দশশ ধনুক আর তিনশ সুয়ার (সওয়ারী)। হস্তীতে চড়িয়া আইল করি মার মার।' বীরসিংহের পাল্টা শত্রুনিধন পর্বের বিস্তৃত বিবরণ পুঁথিতে দেওয়া হয়েছে : 'ঘোড়া চড়ে যদুনন্দন রণে পশ্যা যায়্যা। দাঁড়াইল রণমধ্যে মহাক্রোধ হয়্যা।। ভূঞার পশ্চাতে আইল সোয়ার ছয় জোড়া। কাটিতে লাগিল সেনা উঠাইয়া খাঁড়া।। কালীদীপায় লুকাইয়া ছিল যত সেনা। সন্ধান পাইয়া মল্ল তারে দিল হানা।। ভূঞ্যার বেটা বাগ-ভূঞা কালীদীপায় ছিল। মঙ্গলার থানে লৈয়া তারে বলি দিল।।' এইভাবে বীরসিংহ ডালিভূঞ্যার সৈন্যসামন্তকে যুদ্ধে পরাস্ত করে ডালিভূঞাকে বন্দী করতে সমর্থ হয় এবং ডালিভূঞা তার বন্দীশালায় যেসব জমিদারদের বন্দী করে রেখেছে তাদের ছেড়ে দেবার আদেশ দেয়। ফলে বন্দীরা মুক্ত পেয়ে উক্তি করে, 'বন্দিগণ বলে রায় প্রাণ দিলে তুমি। কেদার রায় মারা গেল শুনিয়াছি আমি।। এ দুষ্টের কশন (অর্থ: তাড়না, শাসানি) যে কহি বিবরণ। কেবল কর্যাছে দুষ্ট যমের কশন।।' অবশেষে ডালিমার স্ত্রী গল-বস্ত্র হয়ে বীরসিংহের পায়ে পড়ে এবং লক্ষ টাকা নজরাণা দিয়ে স্বামীকে সে যাত্রায় মুক্ত করে আনে।

কিন্তু ডালিভূঞ্যা এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য গোপনে গোপ-কাঁথির ভূস্বামী নরেন্দ্রের কাছ থেকে সাতশত ধানুকী পাইক সংগ্রহ করে পুনরায় বীরসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে। (পরবর্তী সময়ে এই গোপন সাহায্যের পরিণামে গোপকাঁথির রাজা নরেন্দ্রকে বীরসিংহ পরাস্ত করে পাল-পলমল পরিবারকে সেখাকে সেখানে অধিষ্ঠিত করেন।) পুঁথিতে সে যুদ্ধের বিবরণ দেওয়া হয়েছে : 'কেদার ঘেরিল দুষ্ট যেন বীর ঝড়। কাঁড়গুলি মারে যেন ভূতে উড়ায় খড়।।' কিন্তু তীরধনুকের সে যুদ্ধে ডালি ভূঞা পরাজিত হন। তাকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধরত হাতীর পিঠ থেকে নামিয়ে বুকে ঘোড়ার পা তুলে পিষে মেরে ফেলা হয়। এইনা দেখে ডালি ভূঞার পত্নী অনেক অনুনয় বিনয় করায়, তাদের অল্পবয়স্ক পুত্রকে ছেড়ে দেওয়া হয় এই শর্তে যে, ভবিষ্যতে কুণ্ডের কাছে শিবমন্দির নির্মাণকল্পে তাকে পাথর সরবরাহ করতে হবে। পুঁথির কথায় : অকুমার শিশু এই অবলা যে নারী। ছিল দুষ্ট গেল মারা এহা নাহি মারি।। নমহ দেব বলি বলে যজ্ঞ মল্ল। পাথর আনিয়া তবে তুল্যা দিব দেউল।। দেবের সাক্ষাতে তবে কৈল অঙ্গীকার।

পুত্র কোলে করি গেল দেশ আপনার ॥ পাথর কাট্যায়া সেই দেশে পাঠাইল। দেবনাথ দেবের দেউল তুল্যা দিল ॥'

যুদ্ধে জয়লাভের পর বীরসিংহ কেদার গ্রামস্থ ঐ কুণ্ড-প্রস্রবণের কাছে পূর্ব-প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী শিবমন্দিরটি নির্মাণের প্রতি মনোযোগী হলেন ; ডালিভুঁঞ্যার পত্নী প্রতিশ্রুতিমত যে পাথর সরবরাহ করেছিলেন তা দিয়ে মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হল। বীরসিংহের সংগৃহীত পাথর ছাড়াও মন্দির প্রতিষ্ঠায় নারায়ণগড়ের গোপরাজা পাথর সরবরাহ করায় সে মন্দিরের নির্মাণকার্য কীভাবে সম্পন্ন হয়েছিল তা পুঁথিতে বর্ণিত হয়েছে: "থরমল্ল আপনি পাথর লয়্যা এল। নারায়ণগড়ের গোপের রাজা পাথর কিছু দিল।। (ত্রৈলক্যনাথ পাল রচিত 'নারায়ণগড় রাজবংশ' পুস্তকেও উল্লেখ করা হয়েছে, সে সময়ে চাপলেশ্বর বা কেদারেশ্বর শিবমন্দির নির্মাণে পাথর দিয়ে সাহায্য করেছিলেন নারায়ণগড়ের ভূস্বামী রাজা হৃদয়বল্লভ পাল।) নীচ হইতে পাঁচ বেত পাথর বসিল। পঞ্চাশ বেত উপরেতে সর্দ্দল করিল।। বটবৃক্ষ উপরে যেন দিনে শ্বেত উড়ে। আশি বেত স্থান যে করিল দীর্ঘ আড়ে।। চারি বেত ভিত্তি কৈল স্থানের সোসর। কারিগর বসায় পাথর করি অন্তর।। দেবনাথ আসিয়া আপনি দিলেন মন। নিজে গিয়া বহাইল করিয়া ত্বাড়ন।। তিন রাজা পাথর যোগায় তবু নাহি আঁটে। ভয় পায়্যা দেবনাথ ভয়ে প্রাণ ফাটে।।"

পুঁথিটিতে মন্দির নির্মাণের যে কারিগরি দিকটির কথা তুলে ধরা হয়েছে, তা একান্তই গুরুত্বপূর্ণ। নির্মাণকার্যে মাপজোকের ক্ষেত্রে 'বেত' কথাটি তখন যে চালু ছিল তা বেশ বোঝা যায়। যদিও সেটির তুল্য পরিমাপের মাত্রা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় নি।

আজকের কেদার গ্রামে নাটমণ্ডপ ও জগমোহনসহ পাথরের যে শিখর-মন্দিরটি দেখা যায়, সেটিই কি পুঁথির বিবরণ অনুযায়ী মন্দির? তা যদি হয়, তাহলে পুঁথির ভাষ্য অনুযায়ী সেটি খ্রীষ্টীয় চোদ্দ শতকে নির্মিত হয়ে থাকবে। কিন্তু আকারপ্রকার দেখে অত প্রাচীন বলে ধারণা করা যায় না।

অতঃপর শোলাঙ্কিযোদ্ধা বীরসিংহ পাকাপাকিভাবে বীরসিংহপুরে গড় স্থাপন করে বসবাস করলেও তার অধীনস্থ সেনাপতি প্রভৃতিরা বিভিন্ন স্থানে গড় নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। বঙ্গীয় শোলাঙ্কিদের জাতিগত থাক-বিভাগও এই পুঁথির মধ্যে আলোচিত হয়েছে দেখা যায়। বর্ণিত সে থাক-বিভাগগুলি হল, বারভাই, বাহাত্তরঘরী, দশাস্বী ও মণ্ডকরী। এই চারটি

থাক সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়ে ব্রজনাথবাবু লিখেছেন, রাজার অধীনে ছিলেন 'ভাই' উপাধিধারী বারজন সামন্ত এবং ভাইদের অধীনে যে ছ'জন করে সামন্ত থাকতেন তারা পরিচিত হতেন 'বাহাত্তরঘরী' নামে। এই বারজন প্রথম শ্রেণীর সামন্ত কেদারকুণ্ড পরগণার আস্তি, শিঙ্গারপুর, আদমবাড়, সাহারা, সাঁইতল, মাদপুর, ঘোষখিরা, রামপুর, শ্রীধরপুর, পসঙ্গ, দুর্গাপুর, মল্লপুর নামের গ্রামগুলিতে গড় স্থাপন করে বসবাস করেছিলেন।

নিম্নশ্রেণীর দশাশ্বী নামে দশজন সামন্ত প্রত্যেকে দশ দশ অশ্বের অধিনায়ক হওয়ায় সর্বদাই রাজদরবারে উপস্থিত থাকতেন বলে তাঁদের পৃথক কোন গড় ছিল না। সর্বশেষ মণ্ডকরী উপাধিধারী চারজন সামন্ত রাজার অঙ্গরক্ষক ছিলেন। ভট্ট কবিরা এই বিষয়ে হিন্দুস্থানীতে যে কবিতা রচনা করেছিলেন তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : 'যদ্ পৎ ইন্দু গিহেলাট তিন। ছত্রী বড়িঞা কোহি নো হীন।। পুত পাবককে পুতন বারা। যৌনে সনাতন ধরম উধারা।। পহিলে শ্রেণী সামন্ত হৈ। দ্বাদশ ভাইয়া ইনকে কৈ।। দ্বিসপ্ততি দুসরে হৈ। আংরক্ষীকো শাখা কৈ।। আংরক্ষী নেহি চারো হৈ। মণ্ডকরী নাম ইনকা হৈ।। তিসরা শ্রেণী দশমে হৈ। ইনকা নাম হৈ দশাশ্বৈ।। শুক্কি রাজকে সামন্ত সংখ্যা। চারণ কবি কুলপত্তর লিখখা।।'

হস্তলিখিত পুঁথির বিবরণে দেখা যায়, বীরসিংহ প্রথমে কেদার গ্রামের কাছাকাছি যেস্থানে গড় নির্মাণ করেন সেখানকার নাম হয় বীরসিংহপুর। 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' প্রণেতা যোগেশচন্দ্র বসুর মতে, শোলাঙ্কি ক্ষত্রিয় বীর বীরসিংহ প্রথমে তার সঙ্গীসামন্তসহ খড়্গপুর থানার বলরামপুরে প্রথম অধিষ্ঠান করেন। এবিষয়ে শ্রীবসু লিখেছেন : "মেদিনীপুর সহরের দক্ষিণে কিসমৎ পরগণার মধ্যে চাঙ্গুয়াল গ্রামে বীরসিংহের রাজধানী ছিল। বীরসিংহের প্রস্তর নির্মিত প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ সিংহদ্বার, সেনানিবাস ও পরিখার চিহ্ন এখনও দৃষ্ট হয়। ...বীরসিংহ পরবর্তীকালে 'কেদার বীরসিংহপুরে' দ্বিতীয় গড় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং কেদারে ৺চাপলেশ্বর মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং নিজের নামানুসারে 'বীরসিংহগড়' স্থাপনে নিজে ঐ গড়ে অবস্থান করিয়াছিলেন।"

কিন্তু দেশীয় ভাট কবিগণ বীরসিংহের নামে যে প্রশস্তিটি গাইতেন সেটি সংগৃহীত হওয়ায়, বীরসিংহই যে কেদারে গড়গড়িয়া-পাটনা তথা বীরসিংহগড়

প্রথম পত্তন করেন তেমনই আভাস পাওয়া যায়। কেননা সে যশোগীতিটিতে যথার্থ ই বর্ণনা করা হয়েছে :

'পশ্চিম মুলুকসে আয়া বীরসিংহ মহারাজা। কাশীকা সন্ন্যাসী ইন্‌কো কেদার কুণ্ডমে ভেজা॥ সামন্ত রাজা শও এক আয়া সবকুচ ইন্‌কো সাথে। সবকে ঔরৎ জহরৎ লায়া বহুত যানে মাথে॥ মহারাজ বীরসিংহনে যব্ আয়া বনায়া হৈ। আদিগড় বীরসিংহপুর যিস্কে সাথে গড়িয়া হৈ॥ গড় ঔর গড়িয়া পত্তন সে নাম গড়গড়িয়া পাটনা হৈ॥ বিবাদ ছোড়া শ্রুতিদর্শনকে দেখিয়ে পূরব মীমাংসা হৈ॥ মুণ্ডমরাই গর্দ্দানমরাই যিস্‌সে নাম হুয়া হৈ। বহুত ভূমি জিত লিয়া অউর বহুত দান দিয়া হৈ॥ বহুত দেওকো মন্দির দিয়া ঔর বহুত সব বনায়া হৈ॥ বেদ পড়ায়া জ্ঞান বড়ায়া মান বাড়ায়া দ্বিজনকো। সাধুজনকে ভয় তোড়া ঔর ভয় গড়া অসাধুনকো॥ শরণাগতকে শরণ দিলায়া ধন দিলায়া দুখিনকো। আরৎ জনকে অভাব পূরায়া নীরোগ কিয়া রোগিন কো॥ দান দিয়া বহুত মান লিয়া ঔর প্রাণ লিয়া আততায়িন কো। ভেটিয়া ভূমি ভট্টকো দিয়া সমরসঙ্গীত গানে কো॥ সুতমাগধ কো বন্ধন ঘুচায়া স্তুতি পাঠন্ করনে কো। সবরোজ হাজারো ভোজন করায়া বেদ পারগা দ্বীজন কো॥ মুরখ জনকে তফাৎ করকে সভাসদ কিয়া পণ্ডিত কো॥'

সুতরাং রাজা বীরসিংহ প্রথমে বলরামপুর বা চাঙ্গুয়ালে যে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেননি এই হিন্দুস্থানী গীতিকাব্যটিই তার একমাত্র প্রমাণ। তবে বীরসিংহ যে এ জেলায় পাঁচটি বৃহৎ ও চোদ্দটি ক্ষুদ্র দুর্গ ও গড় নির্মাণ করে পরিবার পরিজন ও অন্যান্য সামন্তবর্গকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' প্রণেতা যোগেশচন্দ্র বসু তেমন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে, শালবনীর সাতপাটিতে রাজা অভয়াসিংহ, গোদাপিয়াশাল গ্রামের কাছে কুমারগড়ে রাজা কুমার সিংহ, জামদারগড়ে রাজা জামদার সিংহ এবং কর্ণগড়, আড়াসিনি, অযোধ্যাগড় ও বলরামপুরগড়ে সুরথ সিংহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। হতে পারে, তাই পরবর্তীকালে বীরসিংহ চাঙ্গুয়ালগড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করে যে গড়নির্মাণ করেন পরে হয়ত সেটি স্থানীয়ভাবে বীরসিংহগড় নামে আখ্যাত হয়।

তালপাতার পুঁথিতে উল্লিখিত বীরসিংহের অন্যান্য স্থানে যুদ্ধযাত্রার বিবরণগুলির উদ্ধৃতি ব্রজনাথবাবু দেননি, তবে তিনি সেগুলির সারাংশ করে লিখেছেন যে, "কিরূপে কলাৎ সিংহ নামক দুর্দান্ত প্রজাপীড়ক রাজাকে বিতাড়িত করিয়া চেতচন্দ্রকে চেতুয়ার রাজা করিয়াছিলেন ও কিরূপে কলাৎ সিংহ পুনরায়

চাপলেশ্বরের পদানত হইলে তাহাকে বরদার গড়ে স্থাপন করিয়াছিলেন, কিরূপে ডালিমার ভূঁঞ্যার সাহায্যকারী গোপকাথীর রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া সেখানে পালপলমলদের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন এই সমস্ত শোলাঙ্কিদিগের প্রাচীন কাহিনী তালপত্রের পুস্তকে বিশদরূপে বর্ণিত আছে।" সুতরাং পুঁথিতে চেতুয়া ও বরদার ভূস্বামীদের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হওয়ায় আমাদের অনুমান, ঐ দুটি স্থানের কাছাকাছি যে বীরসিংহ গ্রামটি দেখা যায় সেটি সম্ভবতঃ ঐ বীর-পুরুষের স্মৃতিই বহন করে চলেছে।

এমন এক আঞ্চলিক পরাক্রান্ত নরপতির পরবর্তী জীবন সম্পর্কে পুঁথির বিবরণ তেমন স্পষ্ট নয়। কিন্তু তা হলেও ব্রজনাথবাবু লিখেছেন যে, তিনি কোন এক মহাসমরে পরাজিত হয়ে নিহত হয়েছিলেন। এ বিষয়ে আরও স্পষ্ট-ভাবে উল্লেখ করেছেন বীরসিংহের বংশধর নিরঞ্জন দেবসিংহ রায়মল্ল তাঁর রচিত 'বঙ্গোৎকলে আগত চৌলুক্য বা শোলাঙ্কী রাজপুত ক্ষত্রিয়' নামক পুস্তকে। তিনি লিখেছেন, তৎকালীন গৌড়ের সুলতান ইলিয়াস শাহের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে বীরসিংহ নিহত হন (১৩৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) এবং মুসলমান সৈন্যেরা বীরসিংহের গড় ধূলিস্মাৎ করে দেন। বীরসিংহের অবশিষ্ট সৈন্যগণ তখন গ্রামবাসীদের গৃহে আত্মগোপন করে এবং নিজেদের যজ্ঞোপবীত এক অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দেয়। যেখানে এই সূত্রত্যাগ ঘটনাটি ঘটেছিল তা পরবর্তীসময়ে সুতছাড়া নামে ব্যাখ্যাত হয় এবং আদিপুরুষ শুক্লের নামানুসারে নিজেদের 'শুক্লী' বা শোলাঙ্কি জাতি নামে পরিচয় প্রদান করে। লক্ষ্য করার বিষয় যে, বিধর্মীদের হাতে বীরসিংহের গড় ধ্বংস হলেও তাঁর প্রতিষ্ঠিত কেদার গ্রামের পাথরের মন্দিরটি কিন্তু আশ্চর্যভাবে রক্ষা পেয়ে যায়, যা প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্যস্বরূপ আজও কোনমতে টিকে আছে। অন্যদিকে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে বীরসিংহের ভ্রাতা তথা সেনাপতি ঘনশ্যামানন্দ নন্দকাপাসিয়ার বাঁধ ধরে সতবেড়া বা বর্তমান সাবড়ায় গড় নির্মাণ করে সেখানকার ভূস্বামী হন। নিরঞ্জনবাবু তাঁর গ্রন্থে ঘনশ্যামানন্দের পুত্র-পৌত্রাদির বংশানুক্রমিক যে কুলপঞ্জী দিয়েছেন তা থেকে বংশলতা এরূপ : (১) ঘনশ্যামানন্দ— (২) অচ্যুতানন্দ— (৩) দীনবন্ধু— (৪) পুরুষোত্তম—(৫) হরগোবিন্দ— (৬) অনিরুদ্ধ— (৭) ব্রজানন্দ— (৮) কৃষ্ণানন্দ—(৯) মুকুন্দ— (১০) বাসুদেব— (১১) রামচন্দ্র —। রামচন্দ্রের আমলে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষোলশতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার শাসনকর্তা সুলেমান কাররানীর সেনাপতি কালাপাহাড়ের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি নিহত হন এবং তাঁর

মৃত্যুর পর পুত্র জ্ঞানানন্দ সাবড়া ত্যাগ করে প্রথমে মধুপুর ও পরে নৈপুর গ্রামে পাকাপাকিভাবে গড় স্থাপন করে বাস করতে থাকেন। কিংবদন্তী যে, কাছা-কাছি রামচন্দ্রপুর গ্রামটি এই রামচন্দ্রের নামেই কথিত হয়েছে।

জ্ঞানানন্দের পুত্র চতুর্ভুজদেব বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়ে নৈপুর গ্রামে (থানা : পটাশপুর) মদনমোহনের মন্দির নির্মাণ সুরু করেন, কিন্তু সেটি শেষ করে যেতে পারেননি। পুত্র শিবরাম সেটির নির্মাণকার্য সমাধা করেন। সেকালের শিখররীতির মদনমোহনের ঐ মন্দিরটি বর্তমানে জীর্ণবস্থা প্রাপ্ত হলেও এখনো সেটি নৈপুর গ্রামের এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। (এ মন্দিরটি সম্পর্কে আমার রচিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'মেদিনীপুর জেলার পুরাকীর্তি' পুস্তক দ্রষ্টব্য)।

শিবরামের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র নীলাম্বর শাসনভার গ্রহণ করেন, কিন্তু সেসময় পটাশপুর পরগণায় মারাঠা অত্যাচার সুরু হওয়ায় তিনি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হন। পরে অবশ্য মারাঠাদের দলপতি 'বেরার ও নাগপুররাজ' রঘুজী ভোঁসলার প্রদত্ত সনন্দবলে আনুমানিক তিন-চারশো বিঘে জমি দেবোত্তর হিসাবে প্রাপ্ত হন এবং ঐসঙ্গে পট্টনায়ক পদবীতেও ভূষিত হন। নীলাম্বরের পুত্র চৈতন্যচরণের সময়েও মারাঠারা পটাশপুর পরগণায় কর আদায় ও লুণ্ঠন করতে থাকে এবং তাঁকেও মারাঠাদের হাতে নির্যাতিত হতে হয়। অবশেষে চৈতন্যচরণ মরাঠাদের বশ্যতা স্বীকার করলে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়ে তাঁকে 'বিলায়তি কানুনগো' পদে বহাল করা হয়।

কথায় বলে 'ধান ভানতে শিবের গীত'। কোথায় মুণ্ডমারীর রহস্য উদ্ঘাটনে তার ইতিহাস সুরু হয়েছিল বীরসিংহপুর গ্রামে আর তার শেষ হল কিনা নৈপুরে। প্রচলিত ছড়া, গীতিকাব্য, কিংবদন্তী ও স্থানীয় পুরাকীর্তির মধ্যে সে সময়ের রাজারাজড়া আর ভূস্বামীদের উত্থানপতন কাহিনীর যে ছিটে-ফোঁটা ঐতিহাসিক বিবরণ লুকিয়ে ছিল তারই এক নির্যাস হল মুণ্ডমারীর ইতিকথা; যার শেষ কথা হল লিখিত উপাদান থাকুক বা না থাকুক, হারিয়ে যাবার আগে এসব বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রয়োজনীয়তাই ভবিষ্যতে মুণ্ডমারীর যথার্থ ইতিহাস উদ্ধারে সহায়ক হবে।

---

২৫. আগুনখাগীর ষাঁড়া

'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত' প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রামমোহনের পরিবারে সহমরণের ঘটনা সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থের একস্থানে উল্লেখ করেছিলেন, "তিনি (রামমোহন) তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহনের স্ত্রীর সহমরণ ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতকাল বাঁচিবেন, এই ভয়ঙ্কর প্রথা সমূলোৎপাটিত করিবেন"। নগেনবাবুর এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে পরবর্তীকালে অবশ্য বহু সাহিত্য-গবেষকেরা বাকবিতণ্ডা করেছেন। তাঁদের অধিকাংশের মতে রামমোহন তাঁর বৌঠাকুরানের সতীদাহের সময় নিজে তো উপস্থিত ছিলেনই না ; উপরন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহনের স্ত্রীরও নাকি সহমৃতা হননি। রামমোহনের জীবনী-রচয়িতাদের সংগৃহীত এসব তথ্যের বিরুদ্ধে পরবর্তী গবেষকরা রামমোহনের বৌদির সহমৃতা না হওয়া বা তাঁর পরিবারে সতীপ্রথার প্রচলন এবং রামমোহনের বৌদির সহমরণের সময় স্বয়ং উপস্থিত না থাকা ইত্যাদি নিয়ে যেসব যুক্তি তথ্যেরই অবতারণা করুন না কেন, সে সময়ের বাস্তব পরিস্থিতি কিন্তু অন্য কথা বলে।

বিশেষ করে হুগলী জেলার খানাকুল ও তৎসন্নিহিত আশপাশের এলাকায় যে ব্যাপকভাবে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তার বেশ কিছু তথ্যগত প্রমাণও পাওয়া গেছে। এক তো সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে কেবলমাত্র ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলায় সতী হয়েছে ১০৪ জন এবং পাশের জেলা মেদিনীপুরে সতী হয়েছে ২২ জন। সুতরাং এ রিপোর্ট থেকেই বোঝা যায়, যে জেলায় একবছরে শতাধিক নারী সতীর আদর্শে জীবন বিসর্জন দিতে বাধ্য হন, সেখানকার একজন সম্ভ্রান্ত বিবেকবান সংস্কারক নিজের পরিবারের বা গ্রামের অন্য কোন নারী সমাজের এই মর্মান্তিক যন্ত্রণায় তিনি বিচলিত না হয়ে কি থাকতে পারেন! এক্ষেত্রে রামমোহন তাঁর বৌদির সতীদাহের সময় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন কিনা, এসব তথ্য নিয়ে কচ্চায়নের অপেক্ষা, বরং সেকালের বিশেষ করে রামমোহনের পৈত্রিক ভিটের আশেপাশের তৎকালীন সতী প্রথার চিত্রটি তুলে ধরা যাক।

আজকের মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার প্রায় গোটা এলাকাটিই একসময়ে ছিল হুগলী জেলার এলাকাধীন। শাসনকাজের সুবিধার জন্য ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এই মহকুমার ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা থানা এলাকা মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়। সুতরাং যে সময়ের কথা আলোচনা করা হচ্ছে, সেই সময় হুগলী জেলার এলাকাভুক্ত খানাকুল, গোঘাট, চন্দ্রকোণা ও ঘাটাল থানার বিভিন্ন স্থানে যে ব্যাপক সতীদাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে তার বেশ কিছু স্মৃতি-চিহ্ন আজও ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে। তাই সে সময়ে সতী-সহমরণের মত এক বীভৎস প্রথা যে কী পরিমাণে গ্রাম্য-সমাজে ব্যাপকভাবে সচল ছিল, এইসব স্মৃতিচিহ্নগুলো থেকে সে সম্পর্কে বেশ একটা অনুমান করা যায়। শুধু তাই নয়, তৎকালে গ্রামের দরিদ্রদের অপেক্ষা উচ্চবিত্তদের মধ্যেই এই প্রথা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না।

মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে, এ জেলার উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে (একদা যে এলাকাটি হুগলী জেলার মধ্যে ছিল) পরিভ্রমণের সময় এই সব সতীদাহ সংক্রান্ত বেশ কিছু স্মারকচিহ্ন নজরে পড়ে। সেগুলির মধ্যে এমন একটি হল, ঘাটাল থানার উদয়গঞ্জ মৌজাভুক্ত কৃষ্ণপুর পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত এক সতী মন্দির। স্থানীয় রায় পরিবারের সাত সন্তানের মাতা এমন এক পুণ্যবতী, আজ থেকে আনুমানিক শতাধিক বৎসর পূর্বে, স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় সতী হিসাবে নিজেকে আত্ম-বিসর্জন দেন। পরে তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে একটি ক্ষুদ্রাকার স্মৃতিমন্দিরও নির্মাণ করে দেওয়া হয়। বটগাছের নীচে সতী মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় এখনও এ স্থানটিকে লোকে সতী বটতলা বলে থাকেন এবং সেখানের এই মন্দিরে স্থানীয় এয়োতীরা পুণ্য লাভার্থে সিঁদুর লেপে যান। অনুসন্ধানে জানা যায়, সে সময় আলোচ্য এই রায় পরিবার বেশ বিত্তশালী ছিলেন এবং এই পরিবারের প্রতিষ্ঠিত একটি নবরত্ন ও শিখর-মন্দির আজও সে পরিবারের অর্থ-কৌলিন্যের সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে।

পরবর্তী আর একটি সহমরণ স্মৃতিমন্দির হল, আলোচ্য উদয়গঞ্জ পল্লীর প্রায় ৯ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত সুলতানপুর গ্রামের বকসী পরিবারের জনৈকা গৃহবধূর সতী মন্দির। একদা এই বকসী পরিবারও যে অর্থবান ছিলেন, তার প্রমাণ হিসাবে বিদ্যমান রয়েছে সে পরিবারের প্রতিষ্ঠিত তিনটি ভিন্নরীতির দেবালয়। যদিও এসব সতী মন্দিরগুলিতে তেমন কোন প্রতিষ্ঠা-

লিপিযুক্ত ফলক নিবদ্ধ নেই, তবুও এগুলিতে আজও পরম শ্রদ্ধাভরে স্থানীয় এয়োতীরা সিঁদুর লেপেন এবং সেইসঙ্গে সন্ধ্যাবাতিও দিয়ে থাকেন।

ঘাটাল থানার পাশাপাশি চন্দ্রকোণা শহরে সতীর কিংবদন্তী জড়িত একটি স্থানের নামই হল সতী বাজার। এছাড়া কাছাকাছি বৈদ্যনাথপুর গ্রামের সন্নিকটে কর পুষ্করিণীর পশ্চিমপাড়ে সতীকুণ্ড নামক স্থানটি কোন এক সতীর সহমরণের ক্ষেত্র হিসাবে স্থানীয় জনসাধারণ চিহ্নিত করে থাকেন। কিংবদন্তী যে, শুভ বিবাহের রাত্রে কোন এক বরের পথিমধ্যে মৃত্যু হওয়ায়, বিরহকাতুরা ভাবী স্ত্রী ঐ ভাবী স্বামীর চিতায় নিজের দেহ বিসর্জন দিয়ে সতী হন। আজও ঐ সতীকুণ্ড নামক স্থানটিতে সধবারা সিঁদুর দান করে কৃতার্থ হয়ে থাকেন।

তবে এই ধরনের সতীদাহের স্মারকচিহ্ন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত স্মৃতি মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপিতে সতীদাহের উল্লেখ একান্তই অভিনব। ঠিক এই বিষয়েরই এক দৃষ্টান্ত রয়েছে—মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানার এলাকাধীন হরিনারায়ণপুর গ্রামে। এখানের অকালপৌষ গ্রাম থেকে মলিঘাটি গ্রামে যাবার পথে রাস্তার ধারেই প্রতিষ্ঠিত পাশাপাশি দক্ষিণমুখী দুটি আটচালা রীতির মন্দির আছে, যা স্থানীয়ভাবে আগুনখাগীর মাড়ো নামে পরিচিত। আসলে এ গ্রামের বর্ধিষ্ণু কোন এক বেরা পরিবারের স্বর্গত কর্তা ও গিন্নীর দুটি সমাধি মন্দির। গৃহবধূটি যে একদা স্বামীর চিতায় নিজেকে বিসর্জন দিয়ে সতী হয়েছিলেন, তারই বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে মন্দিরে উৎকীর্ণ এক লিপিতে। সে লিপিটির হুবহু পাঠ নিম্নরূপ: "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জয়তি / সন ১১৭২ সাল তাং ছয়াই আষাড় / শ্রীবলরাম বেরার মাতা সহমৃতা হইয়াছে / সন ১৩৫১ সাল মাহ আষাড় জ্ঞাতি / সহ মেরামত করা হইল।" অতএব ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এতদঞ্চলে সহমরণ অনুষ্ঠানের এক লিখিত প্রমাণ এই লিপিটি।

এছাড়া এখানের দুটী মন্দিরের একদুয়ারী প্রবেশপথের উপরিভাগের একটিতে সিঁদুর ও অন্যটিতে কালো ভুষো কালি লেপে দেওয়া হয়েছে। সধবারা এখান থেকে সিঁদুর তুলে সিঁথিতে পরার মধ্যে নিজেদের পরম সৌভাগ্যবতী যেমন মনে করেন তেমনি পুরুষেরা আবার ঐ ভুষো কালি চোখে কাজল হিসাবে ব্যবহার করে নিজেদের একান্তই ভাগ্যবান মনে করেন।

সুতরাং এতক্ষণ যে সতীদাহ অনুষ্ঠানের স্মারকচিহ্ন হিসাবে এইসব সতীমন্দিরের উল্লেখ করা গেল, সেগুলির অবস্থানগত এলাকা হল—রাজা রামমোহন রায়ের পৈত্রিক বাসস্থান লাঙ্গুলপাড়ার কাছাকাছি এলাকা। এক

সময়ে এসব এলাকায় রেশম ও সূতীবস্ত্র এবং কাঁসা-পিতলশিল্প উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। তাই একদিকে এইসব শিল্পের দৌলতে প্রতিষ্ঠিত বিত্তবানরা মন্দির-দেবালয় স্থাপন করেছেন এবং সেইসঙ্গে ধর্মের নামে সমাজে প্রচলিত বীভৎস সব প্রথাকে উৎসাহ দিয়েছেন। সেকালে গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, জগন্নাথের রথের চাকায় আত্ম বলিদান, জলাশয় প্রতিষ্ঠার পুণ্যকাজের নামে বধ হিসাবে শিশু সন্তানকে পুকুরের তলায় ডুবিয়ে মারা এবং সবশেষে সদ্য বিধবাকে মৃত স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারার এইসব জঘন্য প্রথাই ছিল সমাজের কল্যাণকর কর্ম। অতএব রামমোহনের গ্রামের বসত-বাড়ির আশেপাশে রক্ষণশীল ও বর্ধিষ্ণু পরিবারে প্রচলিত এই সতীদাহ প্রথা কিভাবে গ্রাম্য সমাজে প্রসারলাভ করেছিল তারই এক জাজ্বল্যমান নিদর্শন পূর্বে আলোচিত এই সতীমন্দিরগুলি। এই অঞ্চলে সহমরণ অনুষ্ঠান ক্ষেত্রের এই পটভূমিকায়, রামমোহন যে স্বাভাবিকভাবেই বিচলিত হয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য এবং এরই পরিণতিতে তিনি এই কু-প্রথার মূলোৎপাটনে যে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তার ইতিহাস অল্পবিস্তর আমাদের সকলেরই জানা। এক্ষেত্রে আলোচিত আগুনখাগীর মাড়ো সেই বীভৎস আচার-অনুষ্ঠানের এক স্মারক মাত্র এবং এ জেলার গ্রাম-গ্রামান্তরে আরও এমন কত যে সতী মন্দির অগোচরে থেকে গেছে কে জানে ?

২৬. মেদিনীপুরের এক গণ-আন্দোলন : প্রসঙ্গ গোপালনগর ইউনিয়ন বোর্ড

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এযাবৎকাল বহু আন্দোলনের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলায় সেকালের বিখ্যাত জননেতা বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী যে গণ-আন্দোলন সুরু হয়, তার ক্রম-বিবরণ ও সাফল্য সরকারী বা বেসরকারী কোন লেখায় যথাযোগ্যভাবে প্রকাশিত হয়নি। অথচ সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার

হিসাবে ব্যবহৃত এইসব ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরুদ্ধে জেলার পূর্বাঞ্চলে যে প্রচণ্ড গণসংগ্রাম সুরু হয়েছিল, তার ফলে ইংরেজ সরকার অবশেষে তাদের প্রস্তাবিত ইউনিয়ন বোর্ড প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেদিক থেকে সেকালের এই সংগ্রাম কাহিনী যেমন আপামর জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধতার পরিচয় তুলে ধরে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনসাধারণের এক বলিষ্ঠ গণচেতনার স্বাক্ষর বহন করে। শাসক শ্রেণীর সব কিছু দমননীতি ও অত্যাচারকে তুচ্ছ করে গ্রামের সহায় সম্বলহীন মানুষদের এই আন্দোলনে শামিল হওয়ার ঘটনা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক সফল গণ-সংগ্রাম বলেই বিবেচিত হতে পারে।

তদানীন্তন বাংলা সরকার, ১৯১৯-এর বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন আইন অনুযায়ী মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের পরিকল্পনা করে এবং সেইভাবে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই জেলায় পঞ্চাশভাগ চৌকীদারী ট্যাক্স বৃদ্ধি সহ ২২৭টি ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হয়। যে আইন অনুযায়ী এই ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা হয়, সেই আইনে ইউনিয়ন ট্যাক্সের রেটও সময়ে সময়ে বাড়ানোর বিধান থাকায়, স্বভাবতই জনসাধারণের মনে আশঙ্কা জন্মায় যে, তাদের উপর ট্যাক্সের বোঝা চাপানোর উদ্দেশ্যেই সরকার এই বোর্ড প্রচলনের মতলব এঁটেছে। ফলে বিদেশী সরকারের প্রবর্তিত এই স্বায়ত্বশাসন নীতিতে জনসাধারণের যে ধূমায়িত বিক্ষোভ সুরু হয়, তাকে কেন্দ্র করেই বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের রূপ দিতে অগ্রসর হন এবং পরবর্তী সময়ে তা এক সার্থক সত্যাগ্রহ আন্দোলনে পরিণত হয়। ব্রিটিশ শাসকদের পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে দেশের কুটিরশিল্প ও বাণিজ্য কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গ্রাম্য অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ার শামিল হয়েছে—এইসব বর্ণনার সঙ্গে শাসমল জনসাধারণের মনে এইভাবে বিশ্বাস উৎপাদন করাতে চাইলেন যে, এক্ষেত্রে জনসাধারণের এই দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থার মধ্যে এই ধরনের ইউনিয়ন বোর্ড-ট্যাক্স বসানো হলে সাধারণ মানুষের অবস্থা এক অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে পেঁীছে যাবে। সুতরাং গান্ধীজীর নির্দেশমত অহিংস উপায়ে সত্যাগ্রহের পথে ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট আন্দোলনের জন্যে তিনি গ্রামবাসীদের আবেদন জানালেন। ইতিমধ্যে বন্যাত্রাণ ও নানাবিধ সেবামূলক কাজে অংশ গ্রহণের দরুণ সাধারণের মনে যে গভীর আত্মবিশ্বাস জন্মায় তার ফলে তাঁর সংগ্রামী আহ্বানে জেলার পূর্বাঞ্চলের জনসাধারণ স্বভাবতই এই আন্দোলনের পথে পা বাড়ায়।

শাসমলের নেতৃত্বে এই ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট আন্দোলন এমনই সফল আকার ধারণ করে যে, বহু স্থানের বেশ কিছু সংখ্যক নির্বাচিত ইউনিয়ন বোর্ড সভ্যেরা পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। যাঁরা সভ্যপদ ত্যাগ করতে চাননি, বা পরোক্ষে সরকারকে এই বিষয়ে সাহায্য করছেন তাদের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীগণ সামাজিক বয়কট স্বরু করেন। ট্যাক্স আদায় না দেওয়ায় সরকারী আমলারা যে সব অস্থাবর মাল ক্রোক করেন সেগুলি বয়ে নিয়ে যাবার মত কোন মজুর সেসময়ে পাওয়া যায়নি। যদিও শেষ পর্যন্ত সরকারী যানবাহনে এইসব ক্রোকী মালগুলি কোর্ট-কাছারীতে বহন করে আনা হয়েছিল, কিন্তু জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের ফলে ঐগুলির নীলাম ডাকায় কেউ এগিয়ে আসেননি। এছাড়াও জেলার বহুস্থান থেকে দফাদার, চৌকিদাররাও পদত্যাগ করতে স্বরু করে। স্বতরাং এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার পিছু হট্‌তে বাধ্য হন এবং এইভাবেই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এই জেলা থেকে ইউনিয়ন বোর্ড তুলে নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

মেদিনীপুর জেলার পূর্বাঞ্চলের এই ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলন যখন ইংরেজ শাসকদের কাছে এক ভয়াবহ শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি করে, তখন পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে একদিকে সরকারের তরফ থেকে সাধারণ মানুষের ওপর দমননীতি চালানো হয়, অন্যদিকে অনুগত ব্যক্তিদের দ্বারা ইউনিয়ন বোর্ড পরিচালনার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নানান অপচেষ্টা চালানো হয়। সরকারের এই প্রচেষ্টা সম্পর্কে কলিকাতার মহাকরণের মহাফেজখানায় রক্ষিত সে সময়ের নথিপত্রে দেখা যায় যে, মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে তদানীন্তন বাংলা সরকারের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সচিবের কাছে এক রিপোর্ট পাঠিয়ে বলেছেন—২২৭টি ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যগণের প্রত্যেকের কাছে চিঠি পাঠিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, তাঁরা যদি ইউনিয়ন বোর্ড রাখতে ইচ্ছুক হন তাহলে ১২ই ডিসেম্বরের (১৯২১) মধ্যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাতে হবে এবং এই চিঠির উত্তরে ১১টি ইউনিয়নের ১৬ জন সভ্যের কাছ থেকে বোর্ড রাখার স্বপক্ষে মতামত এসেছে বটে, কিন্তু দুটি ইউনিয়নের ৬ জন সভ্যের মধ্যে ৩ জন বোর্ড থাকার পক্ষে মতামত দেওয়ায় বোর্ড রাখার অনুকূলে কোন সঠিক মতামত পাওয়া যাচ্ছে না।

মহাফেজখানায় রক্ষিত ঐসময়ের চিঠিপত্রাদির মধ্যে দেখা যায়, মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পুনরায় ১৭ই ডিসেম্বর (১৯২১) তারিখে বাংলা সরকারের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সচিবকে একটি পত্রে অবগত করাচ্ছেন যে, পাঁশকুড়া থানার গোপালনগর ইউনিয়ন বোর্ডের ৪ জন নির্বাচিত ও ২ জন মনোনীত সভ্যের মধ্যে ৩ জন নির্বাচিত ও ২ জন মনোনীত সভ্য বোর্ড রাখার পক্ষে গরিষ্ঠ মতামত দেওয়ায়, বিশেষ করে এখানের ইউনিয়ন বোর্ডটি প্রত্যাহার না করার পক্ষে সুপারিশ করা গেল। জেলা শাসকের কাছ থেকে এই সুপারিশ আসায় বাংলা সরকারের স্বায়ত্তশাসন বিভাগ ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২১ তারিখে ৫০২৫ নং বিজ্ঞপ্তি জারী করে জানালেন যে, জেলার পাঁশকুড়া থানা এলাকার গোপালনগর ইউনিয়ন বোর্ড ছাড়া সমস্ত জেলা থেকে ইউনিয়ন বোর্ড তুলে দেওয়া হল।

ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্বেই কিছুটা উল্লেখ করা হয়েছে। দেখা যায়, মেদিনীপুর জেলার পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ গ্রামগুলিই ছিল কৃষি ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত এবং বলতে গেলে অধিকাংশই ছিলেন দরিদ্র ও নিরক্ষর কৃষিজীবী পরিবার। কিন্তু কোলকাতার কাছাকাছি আলোচ্য গোপালনগর গ্রামটিতে উচ্চ জাতিবর্গের বহু বর্ধিষ্ণু পরিবারের এবং সরকারী চাকুরীজীবীর বাস হওয়ায়, দরিদ্র ও নিরক্ষর মানুষদের এই গণচেতনা তাঁদের কাছে খুব গৌরবজনক বলে বিবেচিত হয়নি। তাই সরকারী তোষণনীতির পৃষ্ঠপোষকতায় জেলার মধ্যে একটিমাত্র স্থান এই গোপালনগরে ইউনিয়ন বোর্ড রক্ষায় তাঁরা যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে মহাকরণের মহাফেজখানায় রক্ষিত পুরাতন কাগজ-পত্রে। এই কাগজপত্রের মধ্যে একটি প্রামাণ্য বিবরণ রয়েছে নিম্নোক্ত নথিটিতে :

'Government of Bengal, Local Self-Government Department, Local Self-Government (Local Branch), July 1922. Proceeding No S. 36-39, File No — L. 2-U-S Serial No S. 1-7' । আলোচ্য এই নথিটিতে ১লা জানুয়ারী, ১৯২২ তারিখে গোপালনগর গ্রাম থেকে বাবু সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ও অন্যান্য কর্তৃক প্রেরিত একটি দরখাস্ত গ্রথিত আছে। দরখাস্তটিতে লেখা আছে :

'To

The Hon'ble Minister-in-charge,

Local Self Govt Deptt, Govt. of Bengal

মহাশয়,

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পাঁশকুড়া থানার এলাকাধীন ৩৭ নং গোপালনগর ইউনিয়ন বোর্ড অধীন ভিন্ন ভিন্ন স্বাক্ষরকারী অধীনগণের কাতর প্রার্থনা এই যে, কতকগুলি অসহযোগ আন্দোলনকারী ও মতলববাজ গ্রাম্য মহাজনগণের দ্বারা প্রচারিত নানারূপ মিথ্যা গুজবে উত্তেজিত হইয়া আমরা ও অন্যান্য গ্রামবাসীগণ আমাদের ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরুদ্ধবাদী হইয়াছিলাম। তজ্জন্য আমাদের বোর্ড মেম্বারগণ সম্প্রতি বোর্ডটি উঠাইয়া দিবার জন্য মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের নিকট আবেদন করিয়াছেন। আমরা প্রথমে আন্দোলনকারীদের চক্রান্ত বুঝিতে না পারিয়া বোর্ড স্থাপনের বিরুদ্ধে ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আন্দোলনকারীগণের অন্য উদ্দেশ্য এবং বোর্ডের অশেষ উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছি। অতএব হুজুর বাহাদুরের নিকট করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, আমাদের ইউনিয়ন বোর্ড যেন উঠাইয়া লওয়া না হয়। নিবেদন ইতি। ১।১।২২।'

পূর্বেই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল যে, গোপালনগর বাদে সমস্ত স্থানের ইউনিয়ন বোর্ড প্রত্যাহৃত হল, কিন্তু তা সত্ত্বেও গোপালনগরবাসীরা সন্দেহমুক্ত হতে পারেননি বলেই এই গণ-দরখাস্ত প্রেরণ করেছিলেন। এছাড়া বোর্ড রাখার সমর্থনকারীরা এই দরখাস্ত পাঠিয়ে সরকারের কাছে তাঁদের আনুগত্যের গভীরতা বোঝাতে চেয়েছিলেন এই জন্যে যে, ভবিষ্যতে তাঁরা বলতে পারবেন গোটা জেলার 'অসহযোগ আন্দোলনকারী ও মতলবাজদের' চক্রান্তের বিরুদ্ধে একমাত্র তাঁরাই প্রতিবাদ জানিয়ে এই বোর্ড রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন।

গোপালনগর বাদে মেদিনীপুর জেলা থেকে ইউনিয়ন বোর্ড উঠে যাবার সংবাদ সেসময় জেলার সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিতেও প্রচারিত হয়। ১৭ই জানুয়ারী ১৯২২, তারিখে কাঁথির সাপ্তাহিক 'নীহার' পত্রিকায় এই সম্পর্কে যে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল, তা নিম্নরূপ :

'ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্ধান। মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার কেবলমাত্র গোপালনগর ইউনিয়ন ছাড়া অন্য সকল স্থানের ইউনিয়ন বোর্ড উঠিয়া গেল বলিয়া কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর, তমলুক, ঘাটাল ও কাঁথি এই চারটি স্থানে সর্বশুদ্ধ প্রায় ২২৭টি ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইয়াছিল।'

কিন্তু গোপালনগরবাসীর আন্তরিক ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত পূরণ হল না এবং তাঁদের প্রেরিত দরখাস্তের আবেদন-নিবেদন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ ই হল। গোটা জেলা জুড়ে অসহযোগ আন্দোলনকারীরা যে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন স্থরু করেছিলেন, তা শত দমননীতি সত্ত্বেও যখন সরকার পক্ষ থেকে ভেঙ্গে দেওয়া গেল না, তখন বাধ্য হয়েই সরকারকে পিছু হট্‌তে হল এবং সম্মান রক্ষার জন্যে গোপালনগর ইউনিয়ন বোর্ড রাখাটা তাঁদের কাছে যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হল না। তাই ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই আন্দোলনের প্রচণ্ড তীব্রতা অনুভব করে গোপালনগর থেকেও ইউনিয়ন বোর্ডটি তুলে দেবার স্থপারিশ করে পাঠালেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের স্থপারিশ অনুযায়ী বাংলা সরকারের স্বায়ত্তশাসন বিভাগ থেকে সেইমত ১লা মার্চ, ১৯২২ তারিখে ১১৬০ নং বিজ্ঞপ্তি জারী করে গোপালনগর থেকেও অবশিষ্ট ইউনিয়ন বোর্ডটি প্রত্যাহার করে নেওয়ার আদেশ জারি করা হল।

মেদিনীপুর জেলাবাসীর ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দের এই ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট আন্দোলন এইভাবেই এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলে জয়যুক্ত হয় এবং তার ফলে পরবর্তী অন্যান্য আন্দোলনে জনগণের অংশগ্রহণের পথ স্থপ্রশস্ত হয়। স্থতরাং আধুনিককালের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিখ্যাত জননেতা বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে এই জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট ও ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন যে একটি সফল গণসংগ্রাম হিসাবে বিবেচিত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

---

২৭. শিল্পীর প্রতিবাদের স্বাক্ষর

মধ্যযুগীয় কবিদের অনেকেই যাঁরা সে সময়ের শাসককুলের হাতে উৎপীড়িত হয়েছিলেন, তাঁরা সেই নিগ্রহের কাহিনী কিছু কিছু তুলে ধরেছিলেন তাঁদের সৃষ্ট কাব্যসাহিত্যে। প্রবলপ্রতাপ শাসককুলের সঙ্গে সামান্য মসীজীবী কবিরা পেরে উঠবেন কেন? তাই কোনরকমে জান-প্রাণ বাঁচিয়ে অবশেষে কলম ধরেছিলেন প্রতিবাদের আকাঙ্খায়। তারপর সে কলমের কালি যখন তুলট কাগজের পাতার উপর ফুটে বেরুলো, তখনই জানতে পারা গেল ঐসব কবিদের ব্যথা-বেদনার কাহিনী আর অত্যাচারের দাপট। ডিহিদার মামুদ সরিপের অত্যাচারে চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম শেষপর্যন্ত দেশছাড়া হয়ে মেদিনীপুরের আড়ড়ার গড়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। শিবায়নের বিখ্যাত কবি রামেশ্বরও তথৈবচ। মেদিনীপুরের চেতুয়া পরগণার ক্ষুদে লেঠেল জমিদার হেম্মত সিংহও তাঁর ঘর ভেঙ্গে যদুপুর থেকে বাসত্যাগী করে দেয়। শেষ পর্যন্ত তিনি কর্ণগড়ের রাজাদের আশ্রয়ে এসে কাব্যচর্চা করার সুযোগ পান। হাওড়া জেলার পেঁড়োর রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বা এই জেলার শিবায়নের আর এক কবি রামকৃষ্ণ রায়ও বর্ধমান মহারাজাদের হাতে যথেষ্ট নিগৃহীত হয়েছিলেন। স্বভাবতই এইসব কবিরা যেমন পেরেছেন তেমনই শ্লেষাত্মক ও কঠোর ভাষায় তাঁদের ঈপ্সিত কাব্যে তুলে ধরেছিলেন সে-সব ব্যথা বেদনার কাহিনী যা আজ প্রতিবাদের এক জীবন্ত স্বাক্ষর হয়ে আছে। তাই ঐসব কবিদের পুঁথির বিবরণ আমাদের কাছে সেকালের সমাজজীবনের এক জীবন্ত দলিল বলেই বিবেচিত হয়ে আসছে।

এতো গেল কবিদের কথা। কিন্তু সেকালের শিল্পী-স্থপতিরা তাঁরা কি শাসককুলের অধীনে পরমানন্দে জীবন কাটিয়েছেন, না এবম্বিধ চিরাচরিতভাবে নিগৃহীতও হয়েছেন? যদি তাঁরা অত্যাচারিত হয়েই থাকেন, তাহলে তার কোন প্রতিবাদের চিহ্ন কি রেখে গেছেন তাঁদের সৃষ্ট স্থাপত্য-ভাস্কর্যে বা শিল্পকলায়? এখন প্রশ্ন, সেকালের এমন কোন স্থপতি বা শিল্পীর কৃত কোন শিল্পকর্মে তেমন কোন প্রতিবাদের নিদর্শন কি একালের শিল্পরসিক বুদ্ধিজীবীরা খুঁজে পেয়েছেন?

উত্তরে হয়ত অনেকে বলবেন, কেন পটুয়া চিত্রকরদের বেলায় তো তেমন কিছু প্রতিবাদ দেখা গেছে! কেবলমাত্র এখানেই স্বীকার করে নিতে হয় যে, একদা দেশের অবহেলিত পটুয়া-চিত্রকররা ব্রিটিশ শাসনের উৎপীড়নের কাহিনী তাদের পটের মাধ্যমে চিত্রিত করে বেশ কিছু বিদ্রোহের গান পরিবেশন করেছিলেন। এসব পটুয়ারা লম্বা ধরনের কাগজের উপর কোন এক কাহিনীর চিত্ররূপ অঙ্কন করতেন। তারপর দুদিকের কাঠিতে জড়ানো সেই পটগুলি আস্তে আস্তে খুলে দেখাতেন এবং গ্রাম্য সুর সহযোগে সেগুলি গানের মাধ্যমে তুলে ধরতেন। পটুয়াদের এমন এক পটের নাম ছিল, 'সাহেব পট'। সাদা চামড়ার সাহেবরা একসময় কিভাবে দেশের বিদ্রোহী প্রজাদের শাসন করার জন্যে তাদের ধরে গাছের ডালে ঝুলিয়ে ফাঁসি দিয়েছিল—তারই প্রতিটি বিবরণ ছিল সে সব পটে। স্বভাবতই বিদেশী শাসককুল এসব পটুয়া-পট বা গান সুনজরে দেখেনি। তাই একসময় চৌকীদার দিয়ে ঐসব পটুয়াদের থানায় ধরে এনে যথাবিহিত শাস্তিও দেওয়া হয়েছিল। রাজরোষে একসময় সাহেব পটও এইভাবে নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

আর কী আশ্চর্য, সাহেবরা দেশ ছেড়ে ১৯৪৭ সালে চলে গেলেও, স্বাধীনতার পরে দেশের কি হাল হয়েছে, তাও যদি পটুয়ারা তাদের পটে ছবি এঁকে দেখিয়ে গান করতো, অমনি দেশের বলশালী রাজনৈতিক দলের ছোঁড়ারা পটুয়াদের ঐসব পট জোর করে কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিত। এমন ঘটনা তো হামেশাই ঘটেছে, তাই সেসব উৎপীড়নের ঘটনা এই প্রসঙ্গে নথিবদ্ধ করে রাখা গেল।

লোকচিত্রকরদের প্রতিবাদের স্বরূপ তো কিছুটা পাওয়া গেল। কিন্তু আর সব শিল্পী-স্থপতিদের প্রতিবাদের কিছু পরিচয় কি কোথাও নেই? যদিও এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুবই কঠিন, তাহলেও খুঁজে পেতে দেখতে হবে। থানায় চুরির ডাইরী না হলে, যেমন দেশে চুরির কোন ঘটনা ঘটেনি বলে থানার দারোগাবাবু সদরে রিপোর্ট করেন তেমনি বুদ্ধিজীবীদের নজরে না আনলে তাঁরাও তেমন নজির খুঁজে পান না। তাই এসব বিষয় নিয়ে আরাম কেদারায় পাখার তলায় বসে পুঁথি-পত্র না ঘেঁটে বরং গ্রাম-গ্রামান্তরে মঠ-মন্দিরে বা বনেদী বিত্তশালীদের আবাসগৃহে রক্ষিত কাগজপত্রের জঞ্জালে অনুসন্ধান চালানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তবেই হয়ত পাওয়া যেতে পারে এমন কোন প্রতিবাদের স্বাক্ষরযুক্ত নমুনা।

কারণ অভিজ্ঞতা বলছে, হয়ত কোথাও বা মিলতে পারে। অবশ্য এর আগে আমরা বেশ কিছু শিল্পী-স্থপতিদের পরিচয় খুঁজে বের করতে পেরেছি। কেননা আমাদের পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থানে যে সব মন্দির-দেবালয় আছে সেগুলির প্রতিষ্ঠালিপিতে উৎকীর্ণ আছে এমন সব মিস্ত্রী-কারিগরের নাম। তার ফলে আমরা জানতে পেরেছি মন্দিরগড়া এইসব কারিগরের নিবাস কোন্ কোন্ জায়গায় কেন্দ্রীভূত ছিল (আমার লেখা 'মন্দিরলিপিতে বাংলার সমাজচিত্র' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। অবহেলাভরে যদি এগুলির কোনদিন খোঁজখবর না করা হত, তাহলে মধ্যযুগের সামাজিক ইতিহাসের এমন ছড়ানো-ছিটানো মালমসলা সেই কবেই ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যেত।

মন্দির দেওয়ালের উৎসর্গলিপিতে স্থপতির নাম খুঁজতে গিয়ে কিছু কিছু অদ্ভুত জিনিষ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কোথাও কোথাও যেন মনে হয়েছে শিল্পীর জীবন যন্ত্রনার প্রতিবাদ মূর্ত হয়েছে তার সৃষ্টিতে। যদিও বিষয়টি একটা অস্বাভাবিকতার পর্যায়ে পড়ে, তবু মনে হয় এটি যেন শিল্পীর যথার্থ এক প্রতিবাদ। শিল্পীর ঐ অভিনব প্রতিবাদের চিত্রটি জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্যই এতক্ষণ ধরে এই গৌরচন্দ্রিকা করা হল। কি পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে তার পশ্চাৎপটটি এখানে তুলে ধরা ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

মন্দিরগাত্রে কামকলা-ভাস্কর্য বিষয়ে বুদ্ধিজীবী তথা সাধারণ মানুষের ধারণা যে এগুলি পুরী, কোণারক ও খাজুরাহ প্রভৃতি স্থানেই বেশী দেখা যায়। কিন্তু এই পশ্চিমবাংলার বহু গ্রামের মন্দিরে মন্দিরেও যে এমন মিথুনমূর্তি রয়েছে তা আমাদের অনেকেরই হয়ত অজানা। এখন বক্তব্য হল, বাংলার মন্দিরে যেসব মিথুন ফলক নজরে পড়ে, সেগুলির মধ্যে বিত্তশালী মন্দির প্রতিষ্ঠাতাদের 'ম'-কারান্ত সাধনায় বারাঙ্গনা-বিলাসের এক পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এসব প্রতিষ্ঠাতারা তাদের কামনা-বাসনাকে প্রথাগত মিথুন-ভাস্কর্যের শাস্ত্রীয় অনুশাসনে বেঁধে রাখতে চেয়েছেন বলেই মনে হয়েছে। তাই মন্দির নির্মাণের সময় দরিদ্র শিল্পীদের হুকুম দিয়ে ঐসব কাম-কলা ভাস্কর্য মন্দির দেওয়ালে সাঁটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। শিল্পীরাও মালিকের ইচ্ছায় কর্ম করে সেইমত গা ভাসিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটে গেল, মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার উত্তর গোবিন্দ-নগর গ্রামে উনিশ শতকের মাঝামঝি সময়ে প্রতিষ্ঠিত ভুবনেশ্বর শিবের মন্দিরে। মন্দিরের সম্মুখভাগের সজ্জায় শিল্পী যথারীতি পোড়ামাটির ফলকে খোদাই করে

দিলেন রাম-রাবণের লঙ্কাযুদ্ধ প্রভৃতি। ১৭৭২ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত বলে যেমন এক ফলক তিনি উৎকীর্ণ করে দিলেন, তেমনি শিল্পী নিজের নামও খোদাই করে জানিয়ে দিলেন যে, এই মন্দিরের মিস্ত্রী শ্রীআনন্দরাম দাস, সাকিম দাসপুর। সে সময়ের প্রথামত কামকলার মিথুন-ফলক যখন বসানোর নিয়ম, তখন শিল্পী মালিকের হুকুমমত পোড়ামাটির ফলকে খোদাই করলেন কামক্রিয়ারত এক পুরুষ ও নারীর মূর্তি আর তার পাশে দণ্ডায়মান আরও এক পুরুষের মূর্তি। আর পাঁচটা মন্দিরের বন্ধকাম নরনারীর এই বিষয়টা এখানেই শেষ হলে হয়ত কিছু বলার ছিল না। কিন্তু শিল্পী ঐ মিথুন ফলকের নীচে কয়েকটি কথা উৎকীর্ণ করে দিয়েই গোল বাঁধিয়ে বসলেন। ঐখানে তিনি যা লিপি খোদিত করে দিলেন তার মর্মার্থ হল যে, ফলকে নিবদ্ধ দণ্ডায়মান পুরুষটি হলেন একজন নরসুন্দর এবং মিথুন ক্রীড়ারত ঐ নারী হলেন নরসুন্দরের অর্ধাঙ্গিনী; যিনি কিনা স্বামীর সাক্ষাতেই নরলোকের মানুষকে রতিদান করে থাকেন।

বিষয়টা পাঠকবর্গের কাছে একটু জটিল হয়ে যাবে বলে, পরিষ্কার করে বলাই ভাল। পুরুষানুক্রমে যে ঘটনাটি প্রচলিত আছে তা হল, স্থানীয় এক নরসুন্দরের স্বভাবগত ধূর্ততার কাছে ঐ হতভাগ্য মন্দির-শিল্পী নানাভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, কিন্তু কোন পাল্টা আঘাতে তাকে পরাস্ত করতে পারেন নি। তাই মন্দিরে প্রথানুযায়ী মিথুন ফলক বসানোর যে রীতি ছিল, তাকে আশ্রয় করেই শিল্পী এহেন প্রতিবাদ জানালেন ঐ নরসুন্দরের বিরুদ্ধে—যার নাকি সতীসাবিত্রী স্ত্রী সাধারণের কাছে এক উপভোগ্যা মাত্র। শতাব্দীর প্রাচীন এক সাধারণ শিল্পীর এহেন এক অভিনব প্রতিবাদ আমাদের একান্তই চমৎকৃত করে।

আলোচ্য মন্দিরের মিস্ত্রী আনন্দরামের মতই আর এক প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে সূত্রধর-শিল্পী যুগলচন্দ্রের তৈরী কাঠের মূর্তিতে। তদানীন্তন রংপুর জেলার (বর্তমানে বাংলাদেশ) ইমামগঞ্জে ছিল ঐ শিল্পীর নিবাস। একদা তিনি তাম্বুলপুর গ্রামের এক ভূস্বামীর আদেশে কাঠের এক রথ তৈরী করেন এবং রথটির গায়ে অনেকগুলি কাঠের পুতুলও লাগিয়ে দেন। এসব কাঠের পুতুলের মধ্যে একটিকে স্থানীয় ভোজন জেলেনীর মূর্তি বলে সকলেই সনাক্ত করেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সূত্রধর সমাজের এক পুস্তিকায় লেখা হয়েছিল, কেন শিল্পী ঐ ভোজন জেলেনীর হুবহু মূর্তি তৈরী করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল: "ভোজন জেলেনী যুগলচন্দ্রকে মাছ দিতে চায় নাই। সুতরাং

ভোজনকে লোকচক্ষে হাস্যাস্পদ করিবার জন্য মাছের চুপড়ি সম্মুখে করাইয়া রথের পার্শ্বে বসাইয়াছেন। এই দারুমূর্তি এরূপ স্বাভাবিক হইয়াছিল যে, যে কেহ দর্শন করিত উহা ভোজনের মূর্তি বলিয়া চিনিতে পারিত………।"

এখন পাঠকবর্গের কাছে প্রশ্ন তোলা রইল, উল্লিখিত দুটি নিদর্শনের মধ্যে কি শিল্পীর প্রতিবাদের স্বাক্ষর নেই? যদি থেকে থাকে, তাহলে সাবেক আমলের শিল্পীরাও যে বহুবিধ নিপীড়নের মধ্যে প্রতিবাদ জানাতে কসুর করেননি এগুলি তারই এক জলন্ত দৃষ্টান্ত।

২৮. মেদিনীপুরের একজন মন্দির-স্থপতি : শিল্পনিপুণ জীবন পরিচয়

খনার বচন বলেছে :

ধর্ম করিতে যবে জানি।
পোখরি দিয়া রাখিব পানি॥
গাছ রুইলে বড় কর্ম।
মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ম॥

সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রমতে বাঙ্গালীর জীবনে পুণ্যকর্মের পরিচয় দেবার জন্যে যা যা করতে হবে, তার মধ্যে পুকুর খনন, গাছ প্রতিষ্ঠা এবং ঠাকুর মণ্ডপ বা মন্দির নির্মাণ। একযুগে রাজা-মহারাজা আর ধনী ভূস্বামীদের কৃত এই সব মজে যাওয়া দিঘি আর জলাশয় এবং ভগ্ন মন্দির-দেবালয় আজ কিংবদন্তীর এমন বহু কাহিনী সৃষ্টি করেছে।

সমাজ জীবন তো বদ্ধ জলাশয় নয়। তাই সে এক জায়গায় থেমে নেই; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভাঙাগড়ার জীবন পরিচয় বহন করেই তার ইতিহাস রচিত হয়েছে। আর্থিক পরিপুষ্টতায় একদিন ধর্মাচরণ করার অধিকার শুধু যে সব সামন্ত নৃপতি ও ভূস্বামীদের একচেটিয়া ছিল, তারও একদিন পরিবর্তন ঘটলো কালের প্রবাহে। বাংলায় উৎপন্ন হস্তশিল্পজাত উৎকৃষ্ট দ্রব্যসম্ভারের আকর্ষণে প্রলুব্ধ হয়ে দেশবিদেশের বণিক সমাজের একদা সমাগম ঘটলো এদেশে। আর তারপরে নানান পাকে-প্রকারে ও কলা-কৌশলে পরাধীন করে রাখা হোল এদেশের মানুষকে। শাসন ও শোষণে প্রতিষ্ঠিত জমজমাট

ব্যবসা-বাণিজ্যের দৌলতে গ্রাম-বাংলার বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু ব্যবসায়ী, আড়তদার ও চালানীদার পরিবার ফুলে ফেঁপে উঠলেন। লাভের উদ্বৃত্ত কাঁচা পয়সায় আগের দিনের রাজা-মহারাজাদের মতই সুরু হোল 'মণ্ডপ দিলে বড় ধর্মের' কার্যকরণ। অষ্টাদশ শতাব্দীর সুরু থেকে উনবিংশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত এমনি ধরনের বহু পরিবার তাদের অর্জিত বিত্তকে ধর্মাচরণের কাজে লাগালেন মন্দির প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। তাই এই সময়েই দেখা যাচ্ছে পোড়া-মাটির মন্দির বেশী সংখ্যক তৈরী হয়েছে বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে।

এই সব মন্দির তৈরীর কাজে ডাক পড়তো যাঁদের, তাঁরা হলেন বাংলার সূত্রধর সম্প্রদায়; অর্থাৎ সুতো ধরে নিখুঁত কাজ করার অধিকারী যাঁরা। পাকাবাড়ি তৈরী, সান বাঁধানো ঘাট, কাঠের নানান রকম কাজ, দেবদেবীর মূর্তি তৈরী—এসব কাজের জন্যে সূত্রধর সমাজের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জনসমাজে লোকপ্রিয় হয়েছিলেন তাই 'ছুতোর মিস্ত্রি' নামে লৌকিক পদবী লাভ করে। বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত কুটিরশিল্পীদের বসতি যেমন একটা জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে, তেমনি সূত্রধরসমাজের ক্ষেত্রেও তাই দেখা গেল। আশপাশের জেলাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া-দাসপুর, হাওড়া জেলার থলে-রসপুর আর হুগলী জেলার রাজহাটি-নন্দনপুর—এমনি সব বড়ো কেন্দ্র হয়ে পড়েছিল সূত্রধর সম্প্রদায়ের। অন্য জেলার এই সব সূত্রধর সমাজের নিবাস সম্পর্কে আগ্রহীদের পূর্বোক্ত 'মন্দির লিপিতে বাংলার সমাজচিত্র' শীর্ষক পুস্তকটির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যাতে এ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে।

এহেন মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া-দাসপুর হোল ঘাটালের নিকটবর্তী একটি বর্ধিষ্ণু এলকা। দাসপুর একদা তার শিল্প ও বাণিজ্যে সমৃদ্ধির চরম শিখরে উঠেছিল। তাই বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ কাজে সূত্রধর কারিগরের প্রয়োজনে এখানেই গড়ে উঠেছিল এক বিস্তৃত সূত্রধরপল্লী—যেখানে নাকি একদা ছিল দু'শো ঘর সূত্রধর পরিবারের বাস। আর এই গ্রামেরই শীল পরিবারের এমনই একজন মন্দির-স্থপতি ঠাকুরদাস শীল; জাতি সূত্রধর।

ভারতবর্ষের বহু বিশালাকার মন্দির দেখতে গিয়ে দর্শকরা হা-হুতাশ করেন লিপিফলক না থাকায় শিল্পীর নাম না জানতে পারায়। তাই শিল্পীর সৃষ্টি-প্রসঙ্গ কল্পনাপক্ষ বিস্তার করে একসময় তা রক্তমাংসের মানুষ থেকে দেবতা বিশ্বকর্মার রূপ পরিগ্রহণ করে। বাংলার পোড়ামাটির ভাস্কর্য সমন্বিত মন্দির-

গুলি সম্পর্কে ঐ একই কথা বলা যেতে পারে। সপ্তদশ শতকের বহু মন্দিরে কোন লিপিফলক নেই। সুতরাং এ মন্দির কবে তৈরী হয়েছে বা কে তৈরী করেছেন—সে স্থাপয়িতা বা স্থপতির পরিচয় পাওয়া একান্তই কষ্টকর হয়ে পড়ে। কিন্তু পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতক থেকে শুরু করে উনবিংশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত নির্মিত বহু মন্দিরে কিছু কিছু লিপিফলক পাওয়া যাচ্ছে—সাল তারিখ ও স্থাপয়িতার নামের সঙ্গে শিল্পীর নামও দুর্লভ নয়। এ ক্ষেত্রে শিল্পীর কর্মকাণ্ডের পরিচয় আবার একটি কি দুটির বেশী মন্দিরে দেখা যায় না। কিন্তু একজন শিল্পীর বিভিন্ন স্থানে মন্দির নির্মাণের কার্যধারা সম্পর্কে যদি মন্দির-লিপি থেকে জানতে পারা যায়, তাহলে তা একটা ছোটখাট আবিষ্কার বলা যেতে পারে এবং আবিষ্কারের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই বোধ হয় মন্দির-শিল্পী ঠাকুরদাস শীল মন্দিরলিপিতে নিজের বুদ্ধিবৃত্তির প্রসঙ্গ লিখে রেখেছিলেন।

দাসপুর গ্রামের এই স্থপতি-শিল্পীর মন্দির তৈরীর প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়, দাসপুরের চক্রবর্তীদের মন্দির নির্মাণে। মন্দিরের গর্ভগৃহের দেওয়ালে চুনবালির পলেস্তারার উপর একটি লিপি আছে। লিপির বয়ান নিম্নরূপ :

'শ্রীশ্রী জিউ দোধিবামনাসন/সকাব্দা ১৭৬৮ সন ১২স ৫৩ সাল/তারিক ১৫ ফাল্গুন পরিচারক শ্রীযুত/রাসবেহারি চক্রবোর্ত্তির মন্দির/কৃত মিস্ত্রি শ্রীঠাকুরদাস সিল/সাং দাসপুর ॥ ইতি সমাপন।'

বোঝা গেল, ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরদাস শীল কোন এক রাসবিহারী চক্রবর্তীর গৃহদেবতা দধিবামনজীউ-এর মন্দির নির্মাণে স্থপতির ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মন্দিরটি পঞ্চরত্ন; অর্থাৎ চলতি কথায় এর পাঁচটি চূড়ো আছে, যার চূড়াগুলি বেশ লম্বা লম্বা আকারের এবং সাধারণ ঢালু সাদা-মাঠা ছাদ চূড়াগুলির। এই ধরনের চূড়া দাসপুর অঞ্চলের শিল্পীদের বৈশিষ্ট্য এবং চূড়া দেখেই বলে দেওয়া যেতে পারে তা সেখানকার শিল্পীদের কৃত।

আলোচ্য মন্দিরটির সম্মুখভাগ পোড়ামাটির অলংকরণে সমৃদ্ধ। কার্নিসের উপরে অর্ধ বক্রাকৃতি প্যানেলে দু'সারি ফলক, একই ধরনের মূর্তির পুনরাবৃত্তি সবকটি কুলুঙ্গিতে এবং উপর থেকে আবার খাড়াভাবে নেমে এসেছে একসারি ফলকের মালা। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত মন্দির। তাই ঠাকুরদাস শীলের নির্মিত এই পোড়ামাটির অলংকরণের কাজে বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত মন্দিরের পোড়ামাটির কাজের মতো সেই বলিষ্ঠতা বা ছন্দোবদ্ধতা নেই, তবুও যা আছে তা একান্তই আড়ষ্ট নয়। স্থূল পুতুলের মত গড়ন এই

ফলকগুলির। এই মন্দিরের সম্মুখভাগের মধ্যবর্তী প্যানেলে যে পাঁচসারি চিত্রফলক আছে সেই বিষয়বস্তুগুলি আবার এই শিল্পীরই কৃত সুরথপুরের মন্দিরের বাঁদিকের প্যানেলে উপস্থিত করা হয়েছে। চিত্রফলকের বর্ণনার মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা নেই। কৃষ্ণলীলা ও রাম-রাবণের যুদ্ধ কাহিনীর বিভিন্ন ঘটনা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করে মন্দিরগাত্রে উপস্থাপিত করা হয়েছে। দাসপুরের মন্দিরের ফলকগুলি নিরীক্ষণ করলে দেখা যাবে, যে সারিতে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করানো হচ্ছে—সেই সারিতেই রাম-সীতা ও তার অনুচরবর্গকে দেখানো হচ্ছে। এমন অনেক ঘটনাই দেখানো হয়েছে মন্দিরগাত্রে, যার ধারাবাহিকতা পর পর সংরক্ষিত হয়নি। প্রাচীন মন্দিরগুলিতে দেখা যায় মেঝে থেকে সামান্য উঁচু পর্যন্ত স্থানে এবং সেইসঙ্গে থামের দেওয়ালে পোড়ামাটির ফলক নিবদ্ধ হয়েছে এবং এই ফলকগুলিতে থাকতো কৃষ্ণলীলার ঘটনা—টানা একসারি এবং তারপর নীচে থাকতো যুদ্ধ-বিগ্রহ, শিকারযাত্রা বা সমসাময়িক আড়ম্বরপূর্ণ ধনী ভূস্বামীদের জীবনধারার চিত্র। কিন্তু পরবর্তীকালের মন্দিরগুলিতে এই ধরনের ফলক আলোচ্য স্থানগুলিতে অনুপস্থিত থেকেছে এবং ঠাকুরদাস শীলের কৃত মন্দিরের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছে। দাসপুরের চক্রবর্তীদের এ মন্দিরটি বর্তমানে বিগ্রহ পরিত্যক্ত এবং তার ফলে এটি জঙ্গলাবৃত।

যাই হোক, এই মন্দিরের তিন বছর পরে সুরথপুরের মন্দির তৈরীতে অংশগ্রহণ করেছেন আমাদের আলোচ্য স্থপতি। সুরথপুর গ্রামটি দাসপুর থানার অন্তর্ভুক্ত এবং এই গ্রামের শীতলা ঠাকুরের মন্দিরটির পূর্বদিকের দেওয়ালে যে লিপিফলক আছে, তার বয়ানের সঙ্গে আগের মন্দিরলিপির যথেষ্ট মিল আছে। বলা যেতে পারে এও সেই ঠাকুরদাসি মন্দিরলিপি। লিপিফলক হোল :

'শ্রীশ্রী৺ সিতলা মাতা/সকাব্দা ১৭৭১ সন ১২৫৬/সাল তারিখ ১৮ বৈসখ পরিচারক শ্রীযুক্ত/সেত্রুঘন হাজরা মিস্ত্রি ঠাকুর দাস সিল/সাকিম দাসপুর পরগণে চেতুয়া ইতি।'

সুরথপুরের এই মন্দিরটিও পঞ্চরত্ন। তবে এর চূড়ার বৈশিষ্ট্য আছে। এর চূড়ার ছাদ হল খাঁজকাটা—ঠিক কাঠের রথে যেমন খাঁজকাটা চূড়া থাকে। এইখানে শিল্পী তাঁর ভিন্নমুখী প্রতিভার এক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু মন্দিরের পোড়ামাটির ফলক সংস্থাপনে আগের মতই ধারা অনুসরণ করেছেন। সেই উপরের কার্নিশে বাঁকানো চালে দুসারি ফলক, তারপরে নীচে সামনের

প্যানেলের মাথায় এক সারি ফলক এবং খাড়াভাবে নীচে নেমে আসা এক সারি ফলকের মালা দুদিকে দুপাশে। সুরথপুরের মন্দির-ফলকের কাজ দাসপুরের কাজের মতই—বিষয়বস্তুর যেন প্রাধান্য আর সেই পুতুলের মত গতিহীন।

দাসপুরের হুসেনিবাজারে এর পরে চার বছর বাদে ঠাকুরদাসের এক কীর্তি তুলসীমঞ্চ নির্মাণ। রাসমঞ্চ ও দোলমঞ্চের মতই আর এক প্যাটার্ন—তুলসী-মঞ্চ। এটিও দেখতে ঠিক যেন পঞ্চরত্নের মত, তবে এর চারদিক খোলা। শুধুমাত্র উঁচু বেদীর উপর চারটি থাম নির্ভর পঞ্চরত্নের ছাদ সংস্থাপন করা হয়েছে। তুলসীমঞ্চের মেঝেতে একটা গর্তে মাটি ভরাট রয়েছে অর্থাৎ সেখানে তুলসীগাছ লাগানোর জায়গা। তুলসীমঞ্চের গায়ে একটি লিপিফলকে সেই ঠাকুরদাসি লিপির বয়ান আগের মন্দিরলিপির মতই। এটি হোল :
"শ্রীশ্রী বিন্দাদেবি সবাব্দা ১৭ স ৭৫ সন ১২ স ৬০ সাল তারিক ২৭ য়গ্রান / পরিচারক শ্রীরাধামহন পরায়ানিক মিস্ত্রী ঠাকুর্দাস সিল।"

এ তুলসীমঞ্চটিও বর্তমানে অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে এবং চতুর্দিকে আগাছার জঙ্গলে এমন ছেয়ে গেছে যে এটি ভেঙ্গে পড়তে আর বেশি দেরী নেই।

ঠাকুরদাস শীল এখন দেখা যাচ্ছে, পঞ্চরত্ন মন্দির নির্মাণে পারদর্শী। কিন্তু শুধুই কি তিনি পঞ্চরত্ন করেছেন? তাঁর জীবনসাধনায় দেখা যায় পঞ্চরত্ন ছাড়া নবরত্ন মন্দির নির্মাণেই বা কম কি! দেখা গেল এবার ঠাকুর-দাসের ডাক পড়েছে দাসপুর আর ড্যাবরা থানা এলাকার কোন গ্রামে নয়, একেবারে খাস খড়্গপুর থানা এলাকায় চমকা গ্রামে। হুসেনিবাজারের তুলসীমঞ্চ নির্মাণের বছর তিন বাদে এবার ডাক এলো চমকা গ্রামের বিরাশী মৌজার প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার অযোধ্যারাম নাগের পক্ষ থেকে। জমিদারী বিত্তবৈভবের দরুণ শিল্পী এবার বায়না পেলেন নাগ পরিবারের গৃহদেবতা শ্রীধরজীউর নবরত্ন মন্দির নির্মাণের, যার সম্মুখভাগে শিল্পী লঙ্কাযুদ্ধ ও কৃষ্ণলীলার 'টেরাকোটা'-ফলক তো উৎকীর্ণ করে দিলেনই, উপরন্তু মন্দিরের কাঠের দরজাটির পাল্লাতেও খোদিত করে দিলেন নানাবিধ ভাস্কর্য-অলংকরণ। মন্দিরে যে উৎসর্গলিপি নিবদ্ধ হল তার বয়ান: 'শ্রীশ্রীস্‌ধর জয়তি/আরব্ধ শকাব্দা ১৭৭৮ সন ১২৬৩ সাল তাং ৮ বৈসাখ যুক্রবার কৃত শ্রীযুক্ত/অযোধ্যারাম নাগ মিস্ত্রী শ্রীঠাকুর দাষ সিল॥ শ্রীগোপাল চন্দ্র সাং দাসপুর।'

আগের বছরে মন্দির তৈরী সুরু হয়েছিল শেষ হল পরের বছর বৈশাখে এদিকে ড্যাবরার বলরামপুর থেকে মল্লিকরা একটি শিবমন্দির নির্মাণের।

দায়িত্ব দিয়েছেন শীল মশাইকে। তিনি এবার অন্যান্য রীতির মন্দির ছাড়া এ মন্দির তৈরীতে ওড়িশা রীতি অনুসরণ করলেন তার শিল্পকর্মে। চুনবালির সাদামাঠা পলেস্তারা দিয়ে যে পঞ্চরথ শিখর-মন্দির নির্মাণ করলেন তার আকার তেমন বিশাল নয় বটে তবে তা একান্ত ক্ষুদ্রও নয়। তবে এ মন্দিরটি বোধ হয় ঠাকুরদাসের শিখর-মন্দির নির্মাণের প্রথম পদক্ষেপ। মন্দিরগাত্রের লিপিটি সাধারণের অবগতির জন্যে তুলে দিলাম :

"শ্রীশ্রী৺সিব ঠাকুর/স্থভমস্ত সকাব্দা ১৭স ৭৮/সন ১২স ৬৩ সাল তারিক/১৪ কার্ত্তিক/মিস্ত্রি শ্রীঠাকুর দাস শিল/সাং দাশপুর চেতুয়া।"

এর ঠিক বছর তিনেক পরেই মল্লিক পরিবারের গৃহদেবতা সীতারাম জীউয়ের মন্দির নির্মাণে শিল্পী তার কারিগরি নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখলেন। নির্মিত হোল সপ্তরথ শিখর-দেউল এই বলরামপুর গ্রামেই। ওড়িশার মন্দির রীতিকে প্রকট করে তোলার জন্যে মেদিনীপুররীতির ছোট 'আমলক' ব্যবহারের পরিবর্তে বড় ধরনের আমলক বসানো হোল। কিন্তু মন্দিরের সম্মুখভাগে বাংলা চারচালা বাঁকানো ছাদের ঢংয়ে জগমোহন নির্মাণ করা হোল। জগমোহনের সম্মুখভাগ পোড়ামাটির অলংকরণ দিয়ে সজ্জিত করা হোল। এবারে কার্নিসের উপরে দু'সারি ফলকের বদলে একসারি ফলক অর্ধবৃত্তাকারে রাখা হোল। অত্যন্ত দুঃখের কথা, এই মন্দিরের সম্মুখভাগে মন্দির-ফলকের বিষয়বস্তু কি ছিল, তা বর্তমানে বোঝা যাবে না। জনৈক অপরিচিত ব্যক্তি আদিবাসী মজুর লাগিয়ে সমস্ত খুলে গরুর গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে চলে গেছেন। আজও এখানে গেলে সেই কালাপাহাড়ী অত্যাচারের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে।

তবে সে যাই হোক, বলরামপুরের এই মন্দিরটির লিপিতে ঠাকুরদাস শীল এক অভিনব বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দিলেন। তখনকার দিনের পুঁথি পাঠের মধ্যে সেই প্রাচীন বাংলার কাব্যছন্দের প্রভাব বলরামপুরের মন্দির দেওয়ালে পড়লো। শুধু ছন্দোপ্রভাবই লিপিফলকটির বৈশিষ্ট্য নয়, এর মধ্যে কারিগরি-বিদ্যা সম্পর্কেও যথেষ্ট মালমসলার সন্ধান দিয়ে গেলেন ঠাকুরদাস। মন্দির-লিপিটি হোল :

'শ্রীশ্রী৺সিতারামচন্দ্র জিউ/শুন সর্ব্বজন করি নিবেদন/মন্দীর নির্ম্মাণ কথা/ দাসপুরে বাষ মিস্ত্রি ঠাকুরদাস/শিল পদবীতে গাঁথা।/ মিস্ত্রীর সঙ্গে অশটজন করিল শুগঠন/শকলে ক্ষেমতা পূর্ণ/আরম্ভ সাতশষ্ঠী সালে গেল দিন হরি বলে/ আসষ্টীর আসাড়ে সংপূর্ণ।'

ঠাকুরদাসের এ লিপিটি থেকে একটি জিনিস ভবিষ্যতের গবেষকদের কাছে উদাহরণ হয়ে রইল যে, সাধারণত এইসব মন্দির নির্মাণে স্থপতিরা কতদিন সময় নিতেন। প্রভূতভাবে পোড়ামাটির অলংকরণ মন্দিরগাত্রে দেখে উৎসাহী ব্যক্তিমাত্রেরই ধারণা হোত, বোধ হয় বহু দিন বহু বছর ধরে মন্দির নির্মাণের কাজ চলতো। কিন্তু আলোচ্য মন্দিরলিপি বলছে, এক বছরের মধ্যেই মন্দির নির্মাণের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। মনে হয় এ বিষয়ে গৃহস্বামীরও একটা তাগিদ আছে। আকারে বড়-ছোট বা সুসজ্জিত ইত্যাদির প্রশ্ন নেই, প্রশ্ন হোল এক বছরের মধ্যেই শেষ হচ্ছে কিনা? বলরামপুরের মন্দির ছাড়াও অন্যান্য মন্দিরের লিপি থেকে জানা গেছে, সম্পূর্ণ করার সময়কাল ঐ এক বৎসর। এক্ষেত্রে আলোচ্য লিপিফলকে ঠাকুরদাস শীল এইসব উদাহরণ রেখে গেছেন বলেই মন্দির নির্মাণের সময়কাল এবং প্রধান শিল্পীর অধীনে সহযোগীর সংখ্যা ইত্যাদি আমাদের গোচরীভূত হয়ে অশেষ উপকার সাধিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তাই ঠাকুরদাসের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

এখন নানান রীতির মন্দির নির্মাণে ঠাকুরদাসের বেশ সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। তাই ড্যাবরা থানার তালবান্দি গ্রাম থেকে গোস্বামীরা ডাক ছিলেন শিল্পীকে তাঁদের রাধাবল্লভের একটি পঞ্চরত্ন মন্দির নির্মাণের জন্যে। গোস্বামী ব্রাহ্মণ, শিল্পীর দক্ষিণা তেমন দিতে পারলেন না। তাসত্ত্বেও স্থপতি মন্দিরের প্রবেশপথের উপরে এক সারিতে দশাবতার ও কৃষ্ণলীলার 'টেরাকোটা'-ফলক বসিয়ে সাদা-মাঠা মন্দিরের সৌকর্যবৃদ্ধিতে নিজের গুণপণার স্বাক্ষর রাখলেন। সেইসঙ্গে খোদাই করে দিলেন নিজস্ব কীর্তিলিপি, যার পাঠ হল: 'শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জিউ॥ সকাব্দা ১৭৮৫॥ সন ১২৭০ সাল তাং ১৫ আসাড়। শ্রীঠাকুরদাস সিল সাং দাসপুর।'

এছাড়া ঠাকুরদাস বোধ করি শিখর-দেউল নির্মাণে খুব সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠে-ছিলেন। এর তৈরী সর্বশেষ আর একটি শিখর-দেউলের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ মন্দিরটি হোল ড্যাবরা থানার অন্তর্গত চকবাজিত গ্রামে একশো বাইশ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দির। এ মন্দিরের গায়ে যে লিপিটি আছে, তার বয়ান হোল:

'শ্রীশ্রীজিউ সিব ঠাকুর: যুভমস্তু সকাব্দা: ১৭৮৭/য়ারম্ভ ৭২ সালে সন ১২৭৩ সালে স্রাবণে সংপূর্ণ: / মিস্ত্রী শ্রীঠাকুর্দাষ সিল সাং দাষ পুর।'

দেখা যাচ্ছে ঠাকুরদাস বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের মন্দির তৈরী করেছেন।

কোন মন্দিরে পোড়ামাটির ফলক দিয়ে অলংকৃত করেছেন, আবার কোথাও সাদামাঠা রেখেছেন। বেশ বোঝা যাচ্ছে, এক্ষেত্রে গৃহস্বামীর আর্থিক দিকটা দেখা হোত। কত টাকা সর্বসাকুল্যে খরচ করবেন সেই হিসেবমত আকার বা আয়তন ঠিক করে শিল্পী মন্দির নির্মাণে রত হতেন। ঠাকুরদাসের সব কটি স্থাপত্যকর্মে এই দিকটি ভালভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন আকারের মন্দির নির্মাণের মধ্যে।

মন্দির-ফলকের মোটামুটি হিসেবমত ঠাকুরদাসের প্রায় কুড়ি বছরের কর্মময় জীবনের এই হোল একটা পরিচয়। ঠাকুরদাস এই কুড়ি বছরে হয়ত অনেক পাকাবাড়ি, স্নানের ঘাট, আর অনেক প্রতিমা নির্মাণ করেছেন। কাঠ খোদাইয়ের বহু কাজও হয়ত করেছেন। সব ক্ষেত্রে নাম খোদাইয়ের সুযোগ ছিল না বলে ঠাকুরদাস তাঁর সৃষ্ট সব কাজেই তাঁর নাম কালের সাক্ষী হিসেবে রেখে যেতে পারেননি। এ ছাড়া ঠাকুরদাসের কৃত সব মন্দিরগুলির খোঁজ-সন্ধান এখনও হয়নি। আলোচ্য মন্দিরগুলি ছাড়াও ঠাকুরদাস হয়ত আরও অনেক মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, কিন্তু তা কালপ্রবাহে বিধ্বংসী বন্যার তাণ্ডবে ও ভূমিকম্পের আঘাতে শেষ হয়ে গেছে। মারী-মড়কের বিভীষিকায় গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে, তাই পরিচর্যার অভাবে গ্রামের মন্দিরগুলি তিল তিল করে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। যা আজ পর্যন্ত টিঁকে ছিল তা সামাজিক উদাসীনতা ও অবহেলায় শেষ হয়ে যেতে বসেছে। বাংলার মন্দিরগুলির কেউ আদমসুমার করে রাখেন নি। তাই মাথা খুঁড়ে মরলেও তার হিসেব খুঁজে পাওয়া ভার—কেননা ইতিমধ্যেই কত ধ্বংস হয়ে গেছে।

তবুও একটি কথা এই প্রসঙ্গে আসছে। তবে কি ঠাকুরদাস আরও যে সব মন্দির করেছিলেন, তাতে লিপিফলক দেওয়ার আদেশ পাননি গৃহস্বামীর কাছ থেকে? তা যদি হয় তাহলে অনেক মন্দির তাঁর কৃত হলেও আজ তা অজ্ঞাত শিল্পীর নির্মিত বলে ধরে নিয়েছি। কিন্তু এক্ষেত্রে ঠাকুরদাসের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে তা মনে হয় না। ঠাকুরদাস যতগুলি মন্দির নির্মাণ করেছেন, মন্দিরের সম্মুখভাগে লিপিফলক দেওয়ার সুযোগ যেখানে পাননি, সেখানে মন্দিরের পাশেও অন্ততঃ লিপিফলক রেখেছেন। এখানে মন্দির স্থাপয়িতার আদেশ বা মর্জি অনুসরণ করে ঠাকুরদাস চলেন নি; শিল্পী তাঁর শিল্পক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে বিচরণ করেছেন। আর সেই জন্যেই বোধ হয় এতগুলি মন্দিরে তার শিল্পকৃতির বিবরণ পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

ঠাকুরদাসের কাল শেষ হয়েছে বহুদিন আগে। তার রচিত মন্দিরলিপিই তাঁর শিল্পনিপুণ জীবনের ইতিহাস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। স্মরণ করিয়ে দেয় মন্দির নির্মাণ-কৌশলের সেই হারিয়ে যাওয়া সূত্রের বিবরণ; সেই পতন অভ্যুদয়ের সামাজিক ইতিহাসের ছায়া যেন এসে পড়েছে এই বিবরণের মধ্যে। অনেক অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত মন্দির-নির্মাণ শিল্পী ও স্থপতিকুলের মধ্যে অন্ততঃ একজন স্থপতির পরিচয় পেয়ে আমরা ধন্য। ঠাকুরদাসের স্মৃতিসভা হবে না জানি, কিন্তু গৌরবময় সূত্রধর সমাজের ঠাকুরদাস শীল অমর হয়ে রইলেন মেদিনীপুরের মাটিতে তার কৃত প্রতিষ্ঠাফলকে, জাতির গৌরব ঘোষণায়।

২৯. পেডি সাহেবের ইস্তাহার

একদা মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন জে. পেডি। তখন ইংরেজ রাজত্বে স্বদেশী আন্দোলনের কাল। এই সময়েই সন্ত্রাসবাদীদের হাতে তিনি নিহত হয়ে লোকমুখে ইতিহাস হয়ে পড়লেন। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির কারণে কিভাবে মেদিনীপুরের বিপ্লবী তরুণরা তাকে খুন করলো—সেই ঘটনাই তখন লোকের মুখে মুখে শোনা যেত। তাই সাধারণভাবে দয়া বা করুণার আড়ালে পেডি সাহেবের মৃত্যু ঢাকা পড়ে গেল। কিন্তু তাঁর আসল পৌরুষের মাহাত্ম্য আর শেষ পর্যন্ত জানতে পারা গেল না।

তবে তখন জানা না গেলেও, সে সময়ের সংবাদপত্রে বা পত্র-পত্রিকায় কিংবা সরকারী মহাফেজখানার দলিল-দস্তাবেজে বিলেতী রাজপুরুষদের শাসন পরিচালনার এমন বহু কেরামতীর পরিচয় রয়ে গেছে। রাজ্য চালাতে গেলে কড়া শাসন চালাতে হয়—আর তা যদি নেটিভদের দেশ হয়। এমনিতেই বশে আনা দায়, তার উপরে সবাই যদি জোট বেঁধে এককাট্টা হয়ে 'ব্রিটিশ রাজত্ব ধ্বংস হোক' বলে চেঁচামেচি করে, তাহলে উপযুক্ত দেশ-শাসন না করে কি উপায় আছে! আমাদের আলোচ্য পেডি সাহেবও তাই ব্যতিক্রম নন, আর তিনি যখন ছিলেন জেলার সর্বময় কর্তা; সুতরাং তাঁর দাপটের নমুনা সম্পর্কে যদি

একটা ফিরিস্তি দেওয়া যায়, তাহলে সে সময়ে বিদেশী শাসকদের দমননীতির একটি চিত্র অতি সহজেই পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু তার আগে দেশের হালচাল সম্পর্কে দু'চার কথা না বললে বিষয়টি একবগ্গা হয়ে যেতে পারে। কারণ মেদিনীপুরের রাজনৈতিক আকাশে তখন এক উত্তপ্ত আবহাওয়া বইছে। সে সময়ে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী তরুণদের ভূমিকা ছাড়াও, ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সুরুতেই জেলার পূর্বাঞ্চলে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে যে প্রবল ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত হয়, তাকে রুখে দেবার মত সাধ্য ছিল না প্রবল প্রতাপ ইংরেজ সরকারের। তাই সেই তীব্র ও ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মুখে পড়ে সরকারকে পিছু হটতে হয় এবং তারই পরিণতিতে গোটা মেদিনীপুর জেলা থেকে ব্রিটিশ সরকারকে ইউনিয়ন বোর্ড তুলে নিতে বাধ্য হতে হয়। ফলে এই আন্দোলন থেকেই জনসাধারণ নিজেদের অধিকার ও সংগঠিত প্রতিরোধের শক্তি যে কি—তা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় এবং সেইভাবেই বিদেশী ও তার চেলাচামুণ্ডা দেশী শোষক মহাজনদের বিরুদ্ধেও সংগঠিত হবার শপথ গ্রহণ করে।

পরবর্তী পর্যায়ে ১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব যখন গৃহীত হয়, তখন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আইন অমান্য আন্দোলনের সুত্রপাত হল নতুন করে। সেদিক থেকে মেদিনীপুর হয়ে উঠল এই আইন অমান্য আন্দোলনের ধ্রুবতারা। ১৯৩০ সালের পটভূমিকায় লবণ আইন ভঙ্গ সত্যাগ্রহের কেন্দ্র হিসাবে বেছে নেওয়া হল কাঁথি থানার পিছাবনী এবং তমলুক থানার নরঘাট গ্রাম।

মেদিনীপুরের জনগণকে ইংরেজ শাসকরা অনেক আগেই হাড়ে হাড়ে চিনতে পেরেছিলেন। সুতরাং আইনঅমান্য জনিত এই পরিস্থিতি মোকাবিলার উদ্দেশ্যে সরকারী শাসনযন্ত্র তার চিরাচরিত কায়দায় দমননীতির উদ্যোগ-আয়োজন সুরু করে। ফলে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। সরকারী প্রশাসনের সেই পুরানো চিন্তা মাথাচাড়া দেয়— লাল পাগড়ীর পুলিশ দেখলে গ্রামের লোকেরা যেখানে আতঙ্কে ভিরমি যায়, যেখানে থানা-পুলিশ আর তার দোসর জমিদারি পাইক-বরকন্দাজদের লেলিয়ে দিলেই তো শায়েস্তা হয়ে যায়। এক্ষেত্রে পেডি সাহেব তো জেলার ম্যাজিস্ট্রেট। তাই অবাধ্য দেশবাসীর কাছে হুমকি দিয়ে ইস্তাহার ছাড়লেন। গ্রামের

চৌকিদার-দফাদাররা ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে হাটে-বাজারে পেডি সাহেবের জারি করা ইস্তাহার দেখিয়ে বলতে লাগলেন,—খবরদার, খবরদার, আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিলে জেল-জরিমানা তো হবেই, তদুপরি অবস্থা বুঝে লোকের বিষয়-সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হবে। অবশ্য পেডি সাহেবের দস্তখতমতে জারি করা সেই ইস্তাহারের ভাষা থেকে বোঝাই যায় না যে, এটি গ্রামবাসীদের প্রতি সরকারী হুঁসিয়ারি, না আগামী গণ-আন্দোলনের ব্যাপকতায় বিলেতী সরকারের আতঙ্ক! এক্ষেত্রে পেডি সাহেবের ইস্তাহারটিই দেখা যাক্। প্রচারিত সে ইস্তাহারের হুবহু নকল হল :

"ইস্তাহার

যেহেতু কংগ্রেস বলিয়াছে যে, তমলুকে লবণ আইন ও অন্যান্য আইন ভঙ্গ করিবার জন্য আবার চেষ্টা হইবে সেইহেতু এই বিজ্ঞাপন দ্বারা তমলুকের অধিবাসীদের সাবধান করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, যদি আবার সেইরূপ আন্দোলন আরম্ভ হয়, তবে তমলুকে নবম অর্ডিন্যান্স জারী করা হইবে। সেই অর্ডিন্যান্স অনুসারে যে কেহ বাসস্থান বা খাদ্যদ্রব্য বা গাড়ী দিয়া বা অন্য উপায়ে আইন সমিতির স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য করিবে বা কোন উপায়ে আইন অমান্য সমিতির উদ্দেশ্যসাধনের সাহায্য করিবে—তাহাদের ছয় মাস জেল ও এক হাজার টাকা জরিমানা হইতে তো পারিবেই, এমন কি তাহাদের বিষয় সম্পত্তি পর্যন্ত গবর্ণমেন্ট বাজেয়াপ্ত করিবেন। ইতি তারিখ ২৮।১১।৩০ জে. পেডি. ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, মেদিনীপুর।"

বলাই বাহুল্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বকলমে দেওয়া এই ইস্তাহার-বিজ্ঞাপন দিয়ে দেশের মানুষকে দমানো যায়নি। তবুও পিছাবনীর লবণ সত্যাগ্রহে নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর পুলিশের পক্ষ থেকে যে পশুসুলভ অত্যাচার চালানো হয়েছিল, তার ফলে জনমানসের মনোবল তো ভাঙেইনি, উপরন্তু তা আরও বড়ো সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণে সহায়ক হয়ে উঠেছিল। অনুরূপ 'নরঘাট' কেন্দ্রে লবণ আইন অমান্যের সঙ্গে ট্যাক্স-বন্ধ আন্দোলনও যুক্ত হয়ে এই জেলায় গণসংগঠনের যে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল, তারই জের চলেছিল ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের মধ্যে।

৩০. সঙ্গীত সাধনায় মেদিনীপুর

মেদিনীপুর জেলার শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য গৌরবের মত এ জেলার সঙ্গীত সাধনার অবদানও একান্ত উল্লেখযোগ্য। অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত, সে ইতিহাস সংগ্রহ করলে দেখা যাবে খ্যাত-অখ্যাত বহু কবি ও গায়ক সঙ্গীত সাধনায় জেলার ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন তাঁদের সৃষ্ট কাব্য ও সঙ্গীতে। সেই সঙ্গে বিস্মৃতির গর্ভে এমন কত কবি ও সঙ্গীতকার যে হারিয়ে গেছেন এবং ভবিষ্যতে আরও কত যে মনের মণিকোঠা থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে চলতে বসেছেন তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। তাই আজ এঁদের সকলের পরিচয় নথিবদ্ধ করে রাখার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

এ জেলার প্রাচীন কবিদের প্রসঙ্গ তুললে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে আমাদের ফিরে যেতে হবে—যে শতাব্দীকে মেদিনীপুরের কীর্তন সঙ্গীতের সুবর্ণযুগ বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সেযুগে এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বহু ভক্তিমান বৈষ্ণব কবি এবং মধুরকান্ত পদাবলী রচনা করে তাঁরা কীর্তন সঙ্গীতের বিশেষ সমৃদ্ধি সাধন করে গেছেন। এঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় শ্যামানন্দ ও তাঁর প্রধান শিষ্য রসিকানন্দের। রসিকানন্দের সুযোগ্য শিষ্য গোপীজনবল্লভ দাস 'রসিক মঙ্গল' গীতিকাব্য লিখে যশস্বী হয়েছিলেন। শ্যামানন্দের দ্বিতীয় শিষ্য সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিত দামোদর এবং দামোদরের সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন গোবর্ধন। এঁর লেখা সাতটি বৈষ্ণব পদ পাওয়া গেছে। যার একটি হল,

"মধুর কেলি মধুর কেলি
মধুর মধুর করয়ে খেলি
মধুর যুবতী মাঝে মধুর
শ্যাম গোরী কাঁতিয়া।
কিবা সে দুহুঁক বদন বন্দু
তাহে শ্রমজল বিন্দু বিন্দু
আনন্দে মগন দাস গোবর্ধন
হেরিয়া ভরল ছাতিয়া॥"

দামোদরের আর এক শিষ্য ছিলেন ধারেন্দার কানুরাম দাস। মোট চৌদ্দটি পদ রচয়িতা এ কবির একটি মধুর পদের অংশ হল :

"নূপুর রণিত কলিত নব মাধুরী
শুনাইতে শ্রবণ উল্লাস
আগুসারি রাই কাননে অবলোকই
কহতই কানুরাম দাস।"

তমলুকের বাসুদেব ঘোষও ছিলেন এমন এক বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি। তিনি যেসব ঐতিহাসিক পদাবলী রচনা করেছিলেন তা লোকমুখে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এছাড়া শ্যামানন্দের আর এক শিষ্য শ্যামাদাসও তাঁর পদাবলী কীর্তনের জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন। এঁর নিবাস ছিল কেদারকুণ্ড পরগণার হরিহরপুরে এবং এঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম গোবিন্দমঙ্গল, যার অংশ বিশেষ হল :

"রক্তিম অধর শ্যাম রাঙ্গা আঁখি অনুপাম
রক্তিম বসন কটি মাঝে।
রসনা কিঙ্কিনী সাজে রতন মঞ্জির রাজে
রাঙ্গা পায় রুণু ঝুনু বাজে॥"

প্রাচীন বৈষ্ণব কবি ও কাব্য ছাড়াও এ জেলার মঙ্গলকাব্যের যেসব কবি তাঁদের কাব্য রচনা করেছিলেন, সেগুলিকে কোন রাগ-রাগিনীর কোঠায় ফেলা না গেলেও সে সব গান মেদিনীপুরের অন্তঃপুর মহলে ও পল্লীতে পল্লীতে বিশিষ্ট সুর সহযোগে একদা গীত হয়ে থাকতো। এ বিষয়ে জেলার উল্লেখযোগ্য কবি ও কাব্য হল, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, রামেশ্বরের শিব সংকীর্তন, নিত্যানন্দের শীতলামঙ্গল, দয়ারামের সারদামঙ্গল, অকিঞ্চনের চণ্ডীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল, দ্বিজ হরিরামের অদ্রিজামঙ্গল, দ্বিজ গঙ্গারামের অভয়ামঙ্গল, কবি শঙ্কর ও কবি শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের শীতলামঙ্গল, প্রাণবল্লভ ঘোষের জাহ্নবীমঙ্গল প্রভৃতি। মঙ্গলকাব্যের মতই হিজলী অঞ্চলে আর এক জনপ্রিয় লোকসংগীত প্রচলিত ছিল—যা 'মসন্দলী' অর্থাৎ 'মসনদ-ই-আলার গান' বলে সাধারণ্যে, পরিচিত ছিল।

ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে এই জেলায় সংগীত সাধনায় দুটি ভিন্নমুখী ধারা লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে একটি হল, স্থানীয় ভূস্বামীদের পৃষ্ঠপোষকতায় দরবারী সংগীত সাধনা এবং অন্যটি হল কবিয়াল ও লোক-কবিদের সংগীত

চর্চা। যদিও এ জেলার ভূস্বামীদের উদ্যোগে বিষ্ণুপুর ঘরানার মত মেদিনীপুরের নিজস্ব কোন সংগীত রীতি বা school of music গড়ে ওঠেনি, কিন্তু তাহলেও এখানে ধ্রুপদ, ধামার, ঠুংরী, টপ্পা এবং সবরকম প্রাচীন যন্ত্রসংগীতে বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানী গীতের পূর্ণ প্রভাব দেখা যায়। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, বাংলার বাইরে অন্যান্য প্রদেশের শিল্পীরা বহুদিন থেকেই মেদিনীপুর জেলায় বসবাস করার এবং সেইসঙ্গে শিক্ষাদানের জন্যে এ জেলায় প্রাচীন হিন্দুস্থানী সংগীতের প্রচলন ও প্রবর্তন হয়েছে। শুধু তাই নয় এই সঙ্গে ভারতের উত্তরাঞ্চলের সব রকমের ঘরানা এবং বিভিন্ন রীতির গীতবাদ্যও এ জেলায় স্থান পেয়েছে। এইসব বিশুদ্ধ দরবারী সংগীতের সাধনায় যাঁরা অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে পঁচেট-গড়ের চৌধুরী পরিবার, নাড়াজোলের রাজবংশ খাঁ পরিবার, মহিষাদলরাজ গর্গ পরিবার, বেলবেড়্যার প্রহরাজ বংশ এবং মেদিনীপুর শহরের বাবু রাধা-গোবিন্দ পাল ও বাবু যামিনীনাথ মল্লিক। এঁদের মধ্যে মেদিনীপুরের দরবারী সংগীত ভাণ্ডারে পঁচেটগড়ের দান অসামান্য। উচ্চাঙ্গ সংগীত শিক্ষার জন্য যখনই কোন ছাত্র এ পরিবারের দ্বারস্থ হয়েছেন, তাদের কিন্তু ফিরে যেতে হয়নি। ওস্তাদ উজির খাঁর সুযোগ্য শিষ্য চৌধুরী যাদবেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র স্বয়ং একজন দক্ষ শিল্পী ছিলেন এবং এই সংগীতশিক্ষার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় এবং শারীরিক কষ্ট স্বীকার করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। পরবর্তী সময়ে এ পরিবারের অনাদিনন্দন ও সত্যেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্রও সংগীতের ক্ষেত্রে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন এবং বর্তমানে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'যাদবেন্দ্র সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়'।

অন্যদিকে কবিয়াল সম্প্রদায়ের আলোচনায় এলে দেখা যায়, চন্দ্রকোণা শহরে সে সময় ছিল এক বিখ্যাত কবিয়াল পরিবারের বসবাস—যাঁদের তিন পুরুষ ছিলেন গীত রচনায় পারদর্শী। সেই বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের রাম-সুন্দর ছিলেন ভক্তিগীতি রচয়িতা, তাঁর পুত্র গঙ্গাবিষ্ণুও ছিলেন একজন দক্ষ সংগীতকার এবং গঙ্গাবিষ্ণুর পুত্র রমাপতি ছিলেন সেকালের বিখ্যাত শিল্পী। প্রথমদিকে ইনি কবিয়াল হিসাবে কবির দলে গান রচনা করতেন। তারপর তিনি অনেক উৎকৃষ্ট ধ্রুপদ ও বৈঠকী গান রচনা করেন এবং উর্দু ও ফার্সী গান বাংলায় অনুবাদ করে সেগুলিতে বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানী সুর সংযোজন করেন। রমাপতির বিখ্যাত শ্যামাসংগীত হল,

'কার বামা এল সমরে
জলদ রূপসী চঞ্চলা ষোড়শী
করেতে অসি, সঘনে নাদ করে।'

রমাপতির স্ত্রী করুণাময়ীও যে সংগীত রচনায় পারদর্শিনী ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়, স্বামীর বেহাগ রাগের বিখ্যাত গানের সঙ্গে সমানে তিনি প্রত্যুত্তর করে যেতেন। রমাপতির এমন এক বিখ্যাত গান হল :

"সখি, শ্যাম না আইল,
অবশ অঙ্গ, শিথিল কবরী,
বুঝি বিভাবরী অমনি পোহাল।"

বেহাগ রাগের তান বয়ে যাবার মুহূর্তেই স্ত্রী জবাব দিতেন :

"সখি, শ্যাম আইল,
নিকুঞ্জ পুরিল মধুপ ঝঙ্কারে,
কোকিলের স্বরে গগন ছাইল।"

বলা বাহুল্য, এ বেহাগ রাগের গানটি সে সময়ে এ অঞ্চলে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

চন্দ্রকোণায় আরও যে সব কবি ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্যামাসংগীত বিষয়ে শিবু দে এবং যজ্ঞেশ্বর সিংহ অন্যতম। এই দু'জন কবির গান একসময়ে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। এই অঞ্চলের আগমনী সংগীতের আর একজন কবি হলেন অখিলচন্দ্র দাঁ। এ ছাড়া চন্দ্রকোণার রঘুনাথপুরের আর এক সংগীত রচয়িতা ও গায়ক ছিলেন নদেরচাঁদ বারিক। বিখ্যাত 'লালফুল' উপন্যাসের লেখক চন্দ্রকোণার প্রবোধচন্দ্র সরকারও 'বিবিধ সংগীত' নামে এক পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং সে সময়ে তাঁর রচিত আগমনী গানটি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সে গানটির কয়েক লাইন হ'ল :

"আসবে না আর আমার উমা
আরোহিয়ে ইষ্টিমারে,
ঝড় তুফানে অনেক বিপদ জলপথেতে
ঘটতে পারে।
লাটসাহেবের হুকুম নিয়ে, রেল ফেলে পথ
বেঁধে দিয়ে

ট্রেনে করে আপনি গিয়ে, আমার উমায়
আনবে ঘরে ।।" ইত্যাদি

চন্দ্রকোণার আর এক প্রতিভাধর সংগীত শিল্পী হলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। তাঁর রচিত সংগীতবিষয়ক পুস্তকের মধ্যে ঐকতানিক স্বরলিপি, সঙ্গীতসার, গীতগোবিন্দের স্বরলিপি, কণ্ঠকৌমুদী, আশুরঞ্জণী তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থগুলি অন্যতম। ঘাটালের বরদা গ্রামে প্রাচীন এক মহিলা কবির সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁর নাম তারিণী দেবী। তিনি সে সময় প্রায় শ'চারেক সংগীত রচনা করেছিলেন। এরপর উল্লেখযোগ্য সংগীতজ্ঞ হিসাবে নাম করা যেতে পারে ক্ষীরপাইয়ের রামনারায়ণ ভট্ট, পিংলার কৈলাসেশ্বর বসু, খেজুরীর পুরন্দর মণ্ডল ও নন্দীগ্রামের ব্রজলালচকের জয়গোবিন্দ দে প্রভৃতির নাম। এ ছাড়া মেদিনীপুরেয় সংগীত রচয়িতা হিসাবে দুজন ভূস্বামীর নামও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁরা হলেন, নাড়াজোল-রাজ মহেন্দ্রলাল খাঁ ও নরেন্দ্রলাল খাঁ। সংগীত বিষয়ে মহেন্দ্রবাবু পাঁচখানি এবং নরেন্দ্রবাবু একখানি গ্রন্থ (সংগীত মঞ্জরী) প্রণয়ন করেন।

চন্দ্রকোণার মত চেতুয়া পরগণার দাসপুর এলাকায় মহাপ্রভু প্রবর্তিত কীর্তন গানেরও বিশেষ খ্যাতি ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ জেলার পশ্চিমাঞ্চলে শ্যামানন্দী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে রেণেটি কীর্তন ধারা প্রচলিত থাকলেও পূর্বাঞ্চলের এই চেতুয়া পরগণায় অনুষ্ঠিত লীলাকীর্তনে মনোহরশাহী ঘরানার প্রভাব দেখা যায়। এখানকার লীলাকীর্তনের অতীত গৌরবের সেই ধারাবাহিকতা সম্পর্কে স্থানীয় অধিবাসী শ্রদ্ধেয় ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয় 'বাংলার কীর্তন সংস্কৃতির আলোকে দাসপুরের একটি আঞ্চলিক সমীক্ষা' শীর্ষক এক নিবন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন বিগত দশকে দাসপুর এলাকার বৈকুণ্ঠ ওস্তাদ ছিলেন এক খ্যাতিমান কীর্তনীয়া। সেজন্য তাঁকে ও সোনাখালি স্কুলের হেড মাষ্টার প্রসন্নকুমার নন্দিগ্রামীকে নিয়ে সেসময়ে একটি প্রবাদও রচিত হয়েছিল, যথা : 'বৈকুণ্ঠ ওস্তাদের তেরেকিটি, প্রসন্ন মাষ্টারের এ. বি.সি. ডি'। মহবৎপুর গ্রামের বাসিন্দা বৈকুণ্ঠবাবুর পিতা মুক্তারাম মণ্ডলও ছিলেন একজন যশস্বী কীর্তনশিল্পী। সুযোগ্য পিতার কাছে সঙ্গীতশিক্ষা ছাড়াও বৈকুণ্ঠবাবু সে সময়ের বিখ্যাত কীর্তনীয়া বংশী বায়েনের কাছে তালিম নিয়ে নবদ্বীপ থেকে কৃতবিদ্য হয়ে ফিরে আসেন। স্বভাবতই তাঁকে ঘিরে এই এলাকায় মনোহরশাহী ঘরাণার এক বিশুদ্ধ কীর্তনগোষ্ঠী

গড়ে উঠে। বৈকুণ্ঠ ওস্তাদের বৈমাত্রেয় ভাই গোবর্ধন মণ্ডলও কীর্ত্তনীয়া হিসাবে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এছাড়া বৈকুণ্ঠ ওস্তাদের সুযোগ্য শিষ্যদের মধ্যে মহবৎ-পুরের চরণ ওস্তাদ (মণ্ডল), হরেকৃষ্ণপুরের শশিভূষণ পণ্ডিত (বেরা), বেলিয়া-ঘাটার হৃদয় করন, হাটগেছিয়ার রামচরণ মুখোপাধ্যায়, ঘাটালের নবকুমার পাল ও কুশধ্বজ পাল প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত চরণ ওস্তাদের যেসব শিষ্য খ্যাতিমান হয়েছিলেন তাঁরা হলেন, বৈকুণ্ঠ ওস্তাদের পুত্র কীর্তনগায়ক শম্ভুনাথ মণ্ডল ও মৃদঙ্গবাদক হরেকৃষ্ণ শাসমল। অন্যদিকে গায়ক শশীভূষণ বেরার সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন হরেকৃষ্ণপুর গ্রামের পদ্মলোচন বেরা। এছাড়া আরও যে দু'জন যশস্বী কীর্তনীয়ার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁরা হলেন দরি গ্রামের হরিপদ ঢাকী ও কৃষ্ণপদ ঢাকী, যাঁদের কাছে পদ্মলোচনবাবুও একদা কীর্তনশিক্ষার পাঠ নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কৃষ্ণপদ ঢাকীর পুত্র শীতল ঢাকী একজন ওস্তাদ মৃদঙ্গবাদক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। এই এলাকায় পদাবলী কীর্তনের আর এক যশস্বী গায়ক ছিলেন গুপী কাবাড়ী, যাঁর সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন বাসুদেবপুরের শশধর চক্রবর্তী ও গোষ্ঠবিহারী বেরা প্রমুখ কীর্তনীয়াগণ। বেশ বোঝা যায়, কীর্তনসঙ্গীতে দাসপুর এলাকায় সেই অতীত গৌরব আজ অস্তমিত হলেও, সেকালের খ্যাতিমান কীর্তনীয়াদের পরিচয় আজও সাধারণ মানুষের স্মৃতির মধ্যে জাগরুক হয়ে আছে।

এ জেলার বাউল সংগীতে বিখ্যাত ছিলেন হবিবপুরের নবীন বাউল। জাতিতে ইনি ছিলেন নমঃশূদ্র। তাঁর রচিত অনেক গানের মধ্যে বিখ্যাত হল, মোহনপুর এ্যানিকেট-এর ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে রচিত গান :

"কাঁসাই নদী বাঁধলো ইংরেজ বাহাদুরে
পামার-কিমার দুজন এসে রাখল খ্যাতি সংসারে।"

কবিয়াল হিসাবে এ জেলার দু'জন বিখ্যাত সংগীত রচয়িতা হলেন, ঘাটালের হরিবোল দাস এবং চন্দ্রকোণার জগন্নাথ দাস ওরফে যজ্ঞেশ্বর দাস, ডাকনাম জগা। এঁদের দুজনের মধ্যে জাড়ার জমিদার বাড়িতে যে কবির লড়াই হয়েছিল, তার গানগুলি সাধারণের কাছে এখনও স্মরণীয় হয়ে আছে। সে গানগুলির মধ্যে জগা যখন জাড়ার স্তুতি করে গান করেছিলেন :

"জাড়া গোলক বৃন্দাবন
জাড়ার পরব্রহ্ম বাবুগণ
যেমন গোলক হতে গোকুলেতে
অবতীর্ণ গোবর্ধন।" ইত্যাদি

অপরপক্ষে কবিয়াল হরিবোল কাটান দিয়েছিলেন এই বলে,

"কি করে বললি জগা জাড়া গোলক বৃন্দাবন,
যেথায় বামুন রাজা চাষী প্রজা চৌদিকে তার বাঁশের বন।
কোথায় রে তোর শ্যামকুণ্ডু, কোথায় রে তোর রাধাকুণ্ডু
সামনে আছে মাণিককুণ্ডু, করগে মূলা দরশন।
তুই বাজিয়ে যাবি ঢুলির ঢোল,
কেনরে তোর গণ্ডগোল
তুই কবি গাবি, পয়সা নিবি, খোসামুদির কি কারণ?"

সংক্ষেপে, এই হল মেদিনীপুর জেলার সংগীত সাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তবে এটি সম্পূর্ণ নয়, হয়ত অনেকের কথা আমরা অদ্যাবধি জানতে পারিনি এবং এইভাবে কত যে অখ্যাত ও অবজ্ঞাত সংগীত-শিল্পী বন চামেলীর মত অজ্ঞাতে তাঁদের সংগীত প্রতিভার সৌরভ ছড়িয়ে গেছেন এই জেলার মাটিতে কে তার খবর রাখে?

৩১. বার্জ সাহেবের সমন

উনিশশো তিরিশ সালের ব্রিটিশ রাজত্বে পেডি সাহেবের দেশশাসন সম্পর্কে আগেকার নিবন্ধে দু'চার কথা বলেছি। এখন বত্রিশ-তেত্রিশ সালের আর একজন খাস বিলেতী ম্যাজিস্ট্রেটের দেশশাসন সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে এবং এখানেও আলোচিত হচ্ছে পেডি সাহেবের উত্তরাধিকারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বি. জে. বার্জের স্বদেশী আন্দোলন দমনে তাঁর মহৎ প্রচেষ্টার কিছু প্রসঙ্গ। যদিও তিনি পেডির মতই গুপ্তঘাতকের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ঐ পদাসীন থাকা শাসনকালে নিজস্ব কীর্তি-কথা যে বিলীন হবার নয়!

তিরিশ সালের আইন অমান্য আন্দোলন গোটা মেদিনীপুরে তখন ছড়িয়ে পড়েছে এবং তার জের চলেছে সেই একত্রিশ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত। দেশের গণবিক্ষোভের চেহারা দেখে ইংরেজ শাসকরা ইতিমধ্যেই একটা মিটমাটের কথা চিন্তা করেছে—যার ফলশ্রুতি হল গান্ধী-আরউইন চুক্তি। বিলেতে বসলো

গোলটেবিল বৈঠক। কিন্তু তা কার্যতঃ ব্যর্থ হওয়ায় গান্ধীজী ডিসেম্বরে ফিরে এলেন স্বদেশে। পুনরায় দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হল আইন অমান্য আন্দোলন।

তমলুক মহকুমায় আবার সুরু হল লবণ আইন অমান্য আন্দোলন এবং তারই জের টেনে নুন-মারা চললো দিনের পর দিন। পুলিশ এসে সত্যাগ্রহীদের নুন তৈরীর পাত্র ভেঙে গুড়িয়ে দিয়ে সত্যাগ্রহীদের উপর মারধোর চালালো ও সেইসঙ্গে কোর্ট-কাছারীতেও তাদের চালান দিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, জেলার প্রায় প্রতিটি বাজার বা হাটে সত্যাগ্রহীদের তৈরী স্বদেশী লবণ বিক্রীর জন্যে আসতে থাকে এবং খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ এসে সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করে। তদুপরি বেধড়ক প্রহারের সঙ্গে সত্যাগ্রহীদের কারাবরণ করতে হয়। চোরপালিয়া ও প্রতাপদিঘি গ্রামের নিরস্ত্র মানুষের উপর পুলিশের পক্ষ থেকে চালানো হয় নারকীয় অত্যাচার এবং তাদের গুলির মুখে প্রাণ হারায় এ দু' গ্রামের বেশ কিছু নিরীহ গ্রামবাসী। তবুও অবাধ্য দেশবাসীদের ইংরেজ সরকার দমন করতে ক্রমশই অপারগ হয়ে পড়ে।

এদিকে আবার এইসব দমন-পীড়নের পরেও নুন-মারা বা নুন বিক্রী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয় ট্যাক্স-বন্ধ আন্দোলন। খাজনা-'টেক্সো' সব বন্ধ। তদুপরি ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সবরকম সহযোগিতাও বন্ধ। স্কুল কলেজে ছাত্ররা যায় না। কারণ ইংরেজ সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থায় তাদের কোন আস্থা নেই। সবাই তখন এককাট্টা। মানুষের মনও তখন অত্যাচারে অত্যাচারে এক বারুদের স্তূপে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থা চলতে চলতে ইংরেজ সরকারের শাসনব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়ার মুখোমুখি এসে পৌঁছেছে।

এ সময়ের এই আন্দোলনের তীব্রতা সম্পর্কে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ১৯৩২ সালের মাঝামাঝি সময়ে পাঁশকুড়া থানার ১২ নং ইউনিয়নের আমদান-খাসমহল হাটে জনৈক কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক 'কংগ্রেস-বুলেটিন' বিক্রী করার সময় পুলিশের দালাল শ্রেণীর কিছু লোকের হাতে নিগৃহীত হয় এবং স্বেচ্ছাসেবকটির উপর বেপরোয়াভাবে মারধর করা হয়। এরই পরিণতিতে স্থানীয় গ্রামবাসীরা প্রতিবাদে ঐ হাট বয়কট করার সিদ্ধান্ত করে এবং সেইমত বয়কটের ফলে স্বাভাবিকভাবেই ঐ হাট বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশের শুকনো হুমকীতেও যখন ঐ হাট নতুন করে খোলানো গেল না, তখন শাসকশ্রেণী পাল্টা আঘাত দেবার জন্যে ঐ হাটের তরিতরকারী বিক্রয়কারী ও হাটের দোকানদারদের উপর জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট বার্জ সাহেবের স্বাক্ষরিত এক সমন

জারি করে। ঐ সমনে অবিলম্বে বিক্রয়কারীদের হাটে পুনরায় মাল-তরকারী বেচাকেনা করার জন্যে হুকুম দেওয়া হয়। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট বার্জ সাহেবের দেওয়া সেই নোটিশটির বয়ান হল :

"ম্যাজিষ্ট্রেটের নোটিশ

যেহেতু আমি অবগত হইয়াছি যে, তুমি পাঁশকুড়া থানার আমদান-খাসমহল হাটে হাটবারে তরীতরকারী বিক্রয় করিতে এবং যেহেতু বে-আইনী প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিগণ কর্তৃক তুমি তোমার স্বাভাবিক পেশায় বাধাপ্রাপ্ত হইতেছ সেইহেতু আমি তোমায় আদেশ করিতেছি যে, তুমি তোমার স্বাভাবিক পেশা পুনরায় আরম্ভ করিবে এবং ২৫শে এপ্রিল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি মঙ্গলবারে আমদান-খাসমহল হাটে তরকারী বিক্রয় করিবে এবং প্রতি হাটবারে আসিয়া খাসমহল কাননগোকে তোমার হাটে উপস্থিতির বিষয় জানাইবে। ১০।৪।১৯৩৩

(স্বা:) বি. জে. বার্জ

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, মেদিনীপুর।"

বলা বাহুল্য, আমদান-খাসমহলের বিক্রেতারা এ সমনকে যে হেলায় তুচ্ছ করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং এ থেকে বেশ বোঝা যায়, ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৩ সালের আইন অমান্য আন্দোলন এ জেলায় কীভাবে এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল যার ফলে প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজ প্রশাসন মূলতঃ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল এবং তারই এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে আছে সেদিনের বার্জ সাহেবের দস্তখতমাতে জারি করা এই সমন।

৩২. খড়িয়াল
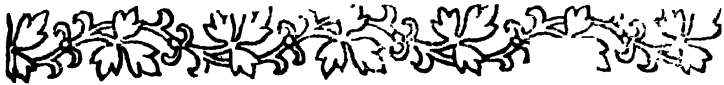
পশ্চিমবাংলার প্রতি জেলাতেই এমন সব হস্তশিল্প ও তার কারিগর রয়েছে যাদের সম্পর্কে আমরা তেমন খোঁজখবর রাখিনা। অথচ বঙ্গ-সংস্কৃতির ভাণ্ডারে এইসব আঞ্চলিক শিল্পসম্পদগুলিকে কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় না; কেননা এইসব শিল্প ও কৃষ্টির সংমিশ্রণেই বঙ্গসংস্কৃতি সমগ্রতা ও বিশিষ্টতা লাভ করেছে।

সেদিক থেকে এমনই এক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে এ জেলার 'খড়িয়াল' জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে, যাঁরা একজাতীয় নরম খড়িগাছের কাঠি দিয়ে ঝুড়ি বুনে থাকেন। হয়ত 'খড়ি' গাছ দিয়ে এহেন বৃত্তিগত শিল্পকর্মের জন্যে অতীতে তাঁরা 'খড়িয়াল' জাতি হিসাবে সমাজে চিহ্নিত হয়ে পড়েছেন। সমাজ রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে জাতিগত বৃত্তি বিসর্জন দেয়নি বলেই গ্রাম-গ্রামান্তরে আজও তাদের পরিচয় কোনরকমে টিকে রয়েছে। এঁদের কৌলিক পদবী পাত্র, ঘোড়ই, মণ্ডল, ভুঁইয়া, মাজী প্রভৃতি হলেও এদের জাতিগত বা বৃত্তিগত বিষয় নিয়ে এখনও তেমন কোন অনুসন্ধান হয়নি। জেলার সরকারী আদমশুমারীর বিবরণেও এ জাতি সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী বলেই হয়ত বিদগ্ধসমাজের তেমন দৃষ্টি আকর্ষণের সহায়ক হয়ে উঠতে পারেনি। অন্যদিকে তাঁদের শিল্পসৃষ্টিতে হয়ত তেমন চমৎকারিত্ব নেই বলে 'আর্ট লাভার' সম্প্রদায়ের আগ্রহও সৃষ্টি হয়নি। তাহলেও এটি ধ্রুবসত্য যে, এ জেলায় 'খড়িয়াল' নামের এক জাতিগোষ্ঠী এখনও বসবাস করে থাকেন।

আমি প্রথম এঁদের সাক্ষাৎলাভ করি সবং থানায় প্রবাহিত কেলেঘাই নদ-এর এক শাখা চণ্ডী নদী তীরবর্তী শ্যামসুন্দরপুর গ্রামে। এই মজা নদীর ধারে নরম কাঠির যে সরু খড়িগাছ জন্মায় তা দিয়েই এঁরা ঝুড়ি-বুনোনীর কাজ করে থাকেন। সবং থানার বেশ কয়েকটি স্থানে উৎপাদিত বিশেষ এক ধরনের ঘাসের জন্য যেমন সেখানে মাদুর শিল্পটি কেন্দ্রীভূত হয়েছে, তেমনি এখানকার মজা খালবিল ও নদীর ধারে এই খড়ি কাঠি উৎপন্ন হওয়ার কারণে শ্যামসুন্দরপুরের মত, কাছাকাছি দশগ্রাম ও পটাশপুরের আড়গোড়া গ্রামেও এই সম্প্রদায়ের বসতি গড়ে উঠেছে। উল্লিখিত এসব স্থান ছাড়াও পটাশপুর থানার পুশা, খড়িগেড়িয়া, অমরপুর, গোকুলপুর, বাসুদেবপুর, সবং থানার মনসাগ্রাম, মহিষাদল থানার কেশবপুর ও গেঁওখালি প্রভৃতি গ্রামে এবং ভগবানপুর ও ময়না থানার কয়েকটি গ্রামেও এইসব খড়িয়াল জাতির বসবাস। এছাড়া হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার ডিমগুলঘাটেও এ সম্প্রদায়ের কয়েকঘরের বসতিও আছে, যাঁদের সঙ্গে এ জেলার খড়িয়াল জাতির বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে।

অধিকাংশ খড়িয়াল সম্প্রদায়ের নিজস্ব কোন জায়গা-জমি নেই। মেয়ে পুরুষ সবাই মিলে পুরুষানুক্রমে এই ঝুড়ি তৈরীর জীবিকায় নির্ভরশীল।

নদীর ধার থেকে কাঁচা খড়ি কেটে এনে শুকিয়ে নিয়ে ঝোড়া বোনার কাজ শুরু হয়। এঁদের তৈরী ঝুড়িগুলির বুনন দেখলে মনে হয় যেন বেত কাঠি দিয়ে তৈরী। মাটির গামলার উপর দিকে যেমন মোটা বেড় দেওয়া থাকে, তেমনি এদের ঝুড়ির উপরের দিকেও একটা মোটা বেষ্টনী করে দেওয়া হয়, হয়ত হাতে ধরার সুবিধের জন্যে। এসব ঝুড়ি ঘর গেরেস্থালী মায় যাবতীয় কাজে ব্যবহৃত হয়। একসময় বেশ চাহিদা ছিল, হাটেবাজারে বিক্রীর জন্যে তো আসতোই, উপরন্তু পাইকাররা কিনে নিয়ে বাইরে চালান দেবার জন্যে বালীচক রেলষ্টেশনে স্তূপীকৃতভাবে জমা করে রাখতো।

বর্তমানে সামাজিক নানান প্রয়োজনে ঝুড়ির ব্যবহার কমে এসেছে, তাই এই হস্তশিল্পটিতে স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিয়েছে মন্দা। ফলে এই সম্প্রদায় এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। কিন্তু পেটের ভাত-ভিতের চিন্তা তো করতেই হয়। তাই আজকাল ঝুড়ির বদলে মরসুমে বাঁশের চাচারী দিয়ে ধান রাখার 'টুলী' তৈরীর কাজও এইসঙ্গে সুরু হয়েছে। আর সে টুলীও তেমন ছোটখাটো নয়, তাতে পনের থেকে ষোল মণ ধান ধরতে পারে। কিন্তু বোনার বিষয়ে শত মুন্সিয়ানার স্বাক্ষর রাখলেও, খদ্দেরদের কাছ থেকে দাম পাওয়া যায় সামান্যই, মাত্র বারো থেকে চোদ্দ টাকা। বিকল্প জিনিষের প্রচলনে যা দিনকাল এসেছে তাতে ঝোড়া আর টুলী তো হাটেবাজারে ঠিকমত বিকোতে চায় না, তাই দায়ে পড়ে সময়ে অসময়ে খড়িয়ালদের জনমজুরীতে খাটতে হয়। এই জীবন সংগ্রামে খড়িয়ালরা কি তাদের জাতপেশা শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পারবে, না পেশা হারিয়ে অবশেষে একান্তই ক্ষেতমজুরে পরিণত হবে, এটাই আজ জিজ্ঞাস্য ?
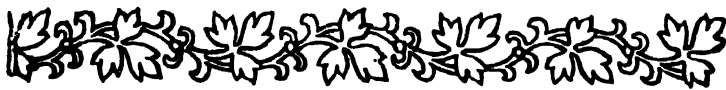
৩৩. মেদিনীপুর জেলার ঝিঝিঙ্কি পুজো

বঙ্গ সংস্কৃতির ইতিহাসে গ্রাম দেবতারা চিরকাল অনাদৃত ও অবহেলিত হয়েই আছেন এবং এই সব দেবদেবীর উৎপত্তি ও অবস্থান সম্পর্কে বহু তথ্যই কুয়াশাবৃত হয়ে রয়েছে। যদি এই কুয়াশাবৃত অবস্থা থেকে বাংলার গ্রাম দেবতাদের উৎপত্তির ইতিহাস উদ্ধার করা যায়, বঙ্গসংস্কৃতির অনেক ঐশ্বর্য ও

উপকরণেরই সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান ও বার-ব্রতের বহু বিচিত্র তথ্য এখনও গ্রাম-গ্রামান্তরে অনাবিষ্কৃত অবস্থায় রয়েছে যার সন্ধান পাওয়া গেলে বাংলার আদিম সংস্কৃতির সেই রূপটির এক পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা থানার 'বাড়-উত্তরহিংলী' গ্রামের মেয়েলী আচার-অনুষ্ঠানের এমনই এক উদাহরণ হোল 'বিরিঞ্চি' পুজো, যা ঐ গ্রামের মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পালোধিদের বাড়ির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

সমতল ভূমির উপর নরম কাদা বা গোবর দিয়ে বিমূর্ত প্রতীক তৈরী করে পুজো করার লৌকিক রীতিপদ্ধতি বহুদিন ধরে গ্রাম-গ্রামান্তরে চলে আসছে। আলোচ্য 'বিরিঞ্চি' পুজোর প্রতীক নির্মাণের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, শিবলিঙ্গের গৌরীপট্টের আকৃতির মতো একটা কাদার তাল আর তার পাশে যেন একটা ছোট কুমীরের বাচ্চা। পুজার্চনার বিবরণ হোল সংক্ষেপে এই: পৌষ মাসের প্রতি রবিবারে এর পুজো শেষ হয়। ঐ শেষ দিনের পুজোয় মেয়েরা ফলমূল ও অন্যান্য উপাচার, নৈবেদ্যের ডালা দেয় তাদের মনস্কামনা পূরণের জন্যে। সুতরাং এ পুজো স্বভাবতই মেয়েলী আচার-অনুষ্ঠান। আগে এই গ্রামের ভীমা মায়ের থানে 'বিরিঞ্চি' পুজো হতো; বর্তমানে পালোধিদের বহির্বাটির প্রাঙ্গনেই অনুষ্ঠিত হয়। তবে পালোধিরা ব্রাহ্মণ বলেই ব্রাহ্মণ দিয়েই পূজার্চনার কাজ সমাধা করেন। বিরিঞ্চি পুজো এদের কাছে সূর্য পূজারই সমতুল্য। সূর্যের ধ্যানমন্ত্র তাই উচ্চারণ করা হয় এই পুজোয়। এই পুজো করলে বন্ধ্যা নারী সন্তানবতী হয়, মেয়েলী অসুখ বিসুখ থেকে রোগমুক্তি ঘটে, ঘা-পাঁচড়ার উপশম হয় এবং সর্বোপরি ধন-সম্পদ লাভ ঘটে।

পৌষমাসের প্রথম রবিবার দিন খুব সকালেই প্রাঙ্গণের এক কোণে সমতল ভূমির উপর কোন এক সধবা রমণী বিরিঞ্চির প্রতীক নির্মাণ করেন নরম কাদার তাল দিয়ে, লম্বায় যা হবে ২৫ থেকে ৩০ সেন্টিমিটারের মতো। শীতের সময় বন জঙ্গলে কুঁচ ফল পাকে। ছোট ছোট মেয়েরা বিরিঞ্চি ঠাকুর তৈরীর জন্যে আগে থেকেই এই সব কুঁচ ফল সংগ্রহ করে রাখে। তারপর বিরিঞ্চির ঐ কুমীর ও গৌরীপট্ট তৈরী হলে তার উপর সুন্দর করে লাল রঙের ক্ষুদে কুঁচ ফলগুলি গেঁথে দেওয়া হয়। এই ভাবেই বিরিঞ্চির প্রতীক নির্মাণ শেষ হয়। তারপর ব্রাহ্মণের ডাক পড়ে পুজার্চনার জন্যে। সাধারণতঃ সকালের দিকেই এই আচার-অনুষ্ঠান সীমাবদ্ধ থাকে।

সুতাহাটা এলাকা ছাড়াও তমলুক থানার বিভিন্ন গ্রামে মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণদের মধ্যেও যে এই পূজার্চনার প্রচলন রয়েছে সে সম্পর্কে ডঃ তারাশিস মুখোপাধ্যায় 'তমলুকের বিরিঞ্চি নারায়ণ' শীর্ষক এক প্রবন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি সায়রা গ্রামে চক্রবর্তী পরিবারের দ্বারা অনুষ্ঠিত পূজা ও মূর্তি সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা পূর্বোক্ত বাড়-উত্তরহিংলীর বিরিঞ্চি মূর্তি থেকে ভিন্নতর। তাঁর পর্যবেক্ষণ মতে, 'পৌষ মাসের প্রথম রবিবারের ভোরে অথবা পূর্বদিন বিকেলে কড়ি, হরীতকী, কুঁচফল, নরম মাটি ও জল দিয়ে বসতবাটীর সামনে বিরিঞ্চি ঠাকুরের মূর্তি গড়া হয়। ঐ সময় বিরিঞ্চির প্রতীক মাথা হিসেবে গোলাকার মাটির স্তূপের ওপর লম্বাভাবে একটি হরীতকী বসানো হয়। এই হরীতকীর সামনে বিরিঞ্চির চোখ হিসাবে পাশাপাশি দুটি কড়িও থাকে। সমগ্র স্তূপের ওপর কুঁচ ফলের অলংকরণে সূর্যের রক্তিম আভা প্রকাশ পায়। বিরিঞ্চির মাটির স্তূপটিকে বেষ্টন করে ছোট ছোট চৌদ্দটি মূর্তি সাজানোর প্রথা আছে। ...এদের কৌলিক চিন্তায়, কড়ি ও কুঁচফল সমৃদ্ধ এই চৌদ্দটি মূর্তি বিরিঞ্চি নারায়ণের পুত্র সন্তান। ...বিরিঞ্চি ঠাকুরের বামে মনুষ্য মূর্তি তার বাহন হিসাবে স্থান পায়। সেটিকে বলা হয় 'বস্তুবল্লবা' বা চটিরাজ। বস্তুবল্লবার মাথার উপরে ও জঘনে একটি করে হরীতকী লম্বাভাবে বসানো থাকে। বস্তুবল্লবার চোখ হিসেবে তার মাথার ঠিক নিচে দুটি কড়ি ও সারাদেহ কুঁচফলের রূপসজ্জা। ...আনুষ্ঠানিক পূজার সময় ব্রাহ্মণ বিরিঞ্চি নারায়ণের মাথায় যে কাঁচা দুধ ঢালেন তা মূর্তির সামনে কুণ্ডে জমা হয়। দুধ ঢালা ছাড়াও, সূর্যের ধ্যানমন্ত্রে তিনবার অর্ঘ্য দেওয়া হয়। ..পূজার শেষে ব্রতিনীরা কুণ্ড থেকে কাঁচা দুধ সংগ্রহ করে পান করেন। কেবল বন্ধ্যা নারীরাই নয়, সন্তানবতী রমণীরাও সন্তান রক্ষা এবং ব্যাধিমুক্তির কারণে বিরিঞ্চি পূজোয় অংশ নেন।'

দেখা যাচ্ছে, আলোচ্য দুটি স্থানের বিরিঞ্চি পূজোয় মূর্তির বিভিন্নতা থাকলেও, সূর্যের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভক্তের কামনা বাসনার তেমন কোন হেরফের ঘটেনি। তবে তমলুক থানার জয়কৃষ্ণপুর গ্রামের বিরিঞ্চি ঠাকুরের প্রতীকমূর্তি পূর্বে উল্লিখিত দুটি স্থানের মূর্তির সঙ্গে খাপ খায় না। এবিষয়ে ডঃ মুখোপাধ্যায় সরজমিন অনুসন্ধানকালে যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা হল, '...মাটির স্তূপের আকারে তৈরি বিরিঞ্চির ওপরে কুঁচফল এবং হরীতকী বসানো হলেও কড়ি দেওয়া হয় না।

এছাড়া বিরিঞ্চির বামে ও দক্ষিণে যে প্রতীক মনুষ্য মূর্তি চোখে পড়ে, তার উপরে কেবলমাত্র কুঁচফল শোভা পায়।'

অন্যদিকে পার্বতীপুরে চক্রবর্তী পরিবারের পূজিত বিরিঞ্চির প্রতীক হল, হাতির শুঁড়ের মত আকৃতি ও হাঙরের মত লেজযুক্ত বসুবলদেব মূর্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাতটি গোলাকার মৃৎপিণ্ড। এখানে বসুবলদেবকে বিরিঞ্চির বাহন ও ঐ সাতটি মৃৎপিণ্ডকে 'অষ্টবসুর' প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। অন্যত্র মীর্জাপুর গ্রামে বিরিঞ্চি দেবতার বাহন হল ঘোড়া।

এখন প্রশ্ন হোল, বিরিঞ্চি পুজোর এইসব প্রতীক কিসের সাক্ষ্য দেয়? সূর্য-পূজার সঙ্গে বিরিঞ্চি পূজার সম্পর্কই বা কি? এটি শাস্ত্রীয় পূজার্চনা, না একান্তই লৌকিক গ্রাম্য মেয়েলী আচার অনুষ্ঠান—এ সব প্রশ্ন বিরিঞ্চি সম্পর্কে একান্তই মনে উদয় হয়।

'শব্দ রত্নাবলী' অভিধানে বিরিঞ্চি হোল, ব্রহ্মা বা শিব বা বিষ্ণু—অর্থাৎ সৃষ্টির অধিকর্তা। এখানে সূর্যের কোন উল্লেখ নেই। বিরিঞ্চির মত এমন ধরনের মাটির উপর প্রতীক তৈরী করে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজার্চনায় উদাহরণ রয়েছে বিভিন্ন গ্রাম-গ্রামান্তরে। আজ থেকে বছর পঁচিশ আগে আমার লেখা 'হাওড়া জেলার লোকউৎসব' পুস্তকে হাওড়া জেলার অরন্ধন-উৎসব সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি মনসা পূজার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলাম। অরন্ধন উৎসব মূলতঃ মনসা পূজাকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হয়। হাওড়া জেলার গ্রামাঞ্চলে অরন্ধন উৎসবের সময়ে মনসা পূজা উপলক্ষে সমতল ভূমির উপর যে মূর্তি তৈরী করা হয় তা হোল, নারীর জননাঙ্গের আকারে তৈরী একতাল কাদার উপর বসানো হয় একটি সিজ মনসা গাছের ডাল। দেখলে মনে হবে যেন যোনিগর্ভ থেকে উদ্গত হয়েছে এই বৃক্ষটি, যা উর্বরতাবাদ বা **Fertility cult**-এরই পরিচায়ক এবং সংস্কৃতি বিজ্ঞানীদের বক্তব্য মতই মনসার সাপের সঙ্গে বৃক্ষের সম্পর্কের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার, বিশেষ করে সুন্দরবনের ক্যানিং অঞ্চলের কিছু কিছু গ্রামে সমতলভূমির উপর নিবদ্ধ পাশাপাশি দুটি শোয়ানো মাটির মূর্তি দেখেছি। এর মধ্যে একটি পুরুষ ও অন্যটি যে নারীমূর্তি তা বোঝা যায় মাটির তাল দিয়ে তৈরী স্তন যুগলের অবস্থানে। এছাড়া ঐ নারীমূর্তির যোনি-দেশে বসানো হয়েছে একটি সিজ মনসা গাছ। হাওড়ার মনসাপুজায় মনসার প্রতীক মূর্তির সঙ্গে এটি বিশেষ লক্ষণীয় ও সাদৃশ্যসূচক। মেদিনীপুর জেলার

পাঁশকুড়া থানার শ্যামসুন্দরপুর পাটনা গ্রামে গোরক্ষনাথযোগী মহন্তদের সমাধিতেও দেখা যাচ্ছে, মাটি দিয়ে তৈরী মনুষ্য-মূর্তির এক প্রতীক এবং তার বক্ষস্থলে সিজমনসা গাছ।

এ ছাড়াও আরও এক দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে আসছি। গ্রামাঞ্চলে সন্তান প্রসবের পর গর্ভিণীর সূতিকা গৃহে যে 'সেঁটেরা পূজা'র মেয়েলী অনুষ্ঠান হয়, সেখানেও দেওয়ালের গায়ে গোবর দিয়ে একটি মনুষ্যমূর্তির প্রতীক নির্মাণ করা হয় এবং তার গায়েও কড়ি বসানো হয়। এটিও উর্বরতাবাদ্ সম্পর্কিত আচার-অনুষ্ঠানের একটি দৃষ্টান্ত।

এখন দেখা যাচ্ছে, বিরিঞ্চি পুজোয় গৌরীপটের আকারের ঐ প্রতীকের সঙ্গে হাওড়া জেলার মনসার প্রতীকী মূর্তির এক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে এবং আঁতুরঘরের 'সেঁটেরা' পুজোয় ঐ মনুষ্যমূর্তির সঙ্গে বিরিঞ্চির কুমীরের সাদৃশ্যযুক্ত প্রতীকের বেশ মিল আছে। এখানে কড়িও যেমন ব্যবহার করা হয়েছে তেমনি টকটকে লালরঙের কুঁচফল দিয়ে নারী জননাঙ্গের রূপটিকে যেন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাহলে বিষয়টি দাঁড়াল এই যে, একটি হোল নারী জননাঙ্গের এবং অপরটি হোল এরই পরিপূরক সেই ভাবী সন্তানের ভ্রূণেরই যেন প্রতীক।

সূর্যও প্রচ্ছন্নভাবে লৌকিক সমাজে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে পরিচিত। সূর্য-পূজার এই আদিম রূপটি এখনও গ্রামাঞ্চলে বহু আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়ে গেছে। অন্যদিকে **Fertility cult**-এর সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক বহুদিন থেকেই। অতএব বাড়-উত্তরহিংলীর এই বিরিঞ্চি পুজো একদা উর্বরতাবাদের প্রতীক হিসেবে গ্রাম-গ্রামান্তরে অনুষ্ঠিত হোত। পরবর্তীকালে এর লৌকিক রূপটি হারিয়ে গেছে এবং এর বদলে একান্তই কেন্দ্রীভূত হয়েছে বর্তমান পৃষ্ঠপোষক এই ব্রাহ্মণ্যসমাজের আওতায়। কিন্তু তা হলেও তার আদিম রূপটির অস্তিত্ব এখনও যে নিশ্চিহ্ন হয়নি তার প্রমাণ এই প্রতীকী পূজানুষ্ঠান। বিরিঞ্চি তাই লৌকিক দেবতা হিসেবে **Fertility cult**-এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অনুযায়ী এখনও বর্তমান রয়েছে। এইসব **Fertility cult**-এর গ্রামদেবতাদের সম্পর্কে আরও বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন আছে বলেই মনে করি।
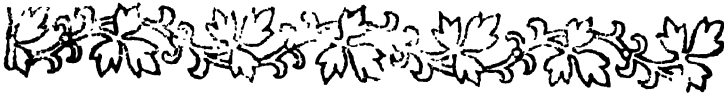
৩৪. অস্থল সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদা বলেছিলেন, 'যত মত তত পথ'। কথাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় এ জেলার নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় আখড়াগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে। বস্তুতঃ এ জেলাটি সর্বধর্মের উপাসকদের সাধনক্ষেত্র বললেও অত্যুক্তি হয় না। সত্যি কথা বলতে কি, কোন ধর্মই বাদ নেই এখানে, প্রায় সব ধর্মের আরাধকরাই এখানে এসেছেন। শুধুমাত্র পদধূলি নয়, ধনী ভূস্বামীদের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্রমে ক্রমে তাঁরা স্থায়ীভাবে সাধনভজনের মঠ-মন্দিরও বানিয়েছিলেন যেগুলি স্থানীয়ভাবে চিহ্নিত হয়েছিল 'অস্থল' নামে। আজও এ জেলায় এমন সব অস্থলের বহু উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

অস্থলের প্রসঙ্গ উঠলেই একটি প্রশ্ন থেকে যায়, কিসের টানে নানান ধর্মীয় উপাসকরা এখানে এসেছিলেন? অবশ্য অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না যে, এ জেলায় চাল, চিনি, গুড়, মাখন, লবণ, পিতল-কাঁসা এবং সুতী ও রেশম-বস্ত্র প্রভৃতির উৎপাদন ও ব্যবসাবানিজ্যের দৌলতে যে এলাকাগত শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল, তারই টানে প্রলুব্ধ হয়ে একদা এসেছিলেন এসব ধর্মপ্রচারকের দল। তারপর নিজ নিজ ধর্মের মাহাত্ম্য বা নিজস্ব অলৌকিক প্রভাব বিস্তার করে স্থানীয় রাজা-মহারাজাদের স্ব স্ব ধর্মে অবশেষে দীক্ষিত করতেও তারা সমর্থ হয়েছিলেন। প্রতিদানে রাজ-অনুগ্রহে বেশ কিছু ভূসম্পত্তিও দান হিসেবে পেয়েছেন, যার ফলে উপাসকদের সাধনভজনে কোন অসুবিধে হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় এইসব উপাসকদের মধ্যে কেউ কেউ নানাবিধ ব্যবসা-বাণিজ্যের ভিতরেও নিজেদের শেষ অবধি জড়িয়ে ফেলেছিলেন এমন উদাহরণও দুর্লভ নয়।

এছাড়া দেখা যায়, সব ধর্মের উপাসকরাই যে সহজ সরলভাবে তাদের সাধনভজনে ও ধর্মীয় অলৌকিকতায় মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন এমন নয়। কেননা মেদিনীপুর জেলার উপর দিয়ে পুরী গমনাগমনের পথ হওয়ার বেশ কিছু বহিরাগত সন্ন্যাসী সহজেই এ জেলায় পৌঁছে ঘোরতর বিশৃঙ্খলাও

যে সৃষ্টি করেছে তেমন নজিরও রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। দেখা যাচ্ছে আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে সুতী ও রেশমবস্ত্র প্রভৃতি শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিতে, বিশেষ করে ক্ষীরপাই এলাকায় এইসব সন্ন্যাসীরা লুঠতরাজ চালিয়ে দেশের মধ্যে বেশ একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করে তুলেছে, যা ইতিহাসের পাতায় এটি 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' নামে চিহ্নিত।

অন্যদিকে এ জেলায় বসতকারী ভূস্বামী বা রাজা মহারাজাদের অনেকেই এসেছিলেন ওড়িশা, বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে। দুর্গম অরণ্যের মধ্যে বা কোথাও ছোটখাটো নদীনালা ঘেরা সুরক্ষিত স্থানে তারা যেসব গড় বা দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন, সে সবের জীর্ণ অবশেষ আজও এ জেলার নানাস্থানে দেখা যায়। সেকালের সুলতানী বা মোগলশক্তির কাছে মামুলি অধীনতাস্বরূপ নজরাণা পাঠিয়ে কার্যত তারা স্বাধীনই ছিলেন। তাই এইসব ক্ষুদ্রে ভূস্বামীরা নিজেদের রাজ্যশাসনের সঙ্গে ধর্মীয় উপাসকদের ধর্মচিন্তা যুক্ত করে প্রজাদের সহজেই বশে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেজন্য স্থানে স্থানে এইসব নানান ধর্মের আখড়া যাতে গড়ে ওঠে সে বিষয়ে স্থানীয়ভাবে রাজ অনুগ্রহের ঘাটতি দেখা যায় নি। এক্ষেত্রে আলোচ্য বিভিন্ন ধর্মীয় মঠ ও মঠাধিকারী মহন্তের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির বহু বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যেতে পারে বলেই ধারণা।

তবে মঠ ও মহন্ত সংস্কৃতির বিস্তারিত আলোচনা এক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য নয়। শুধুমাত্র এ জেলায় কোন্ কোন্ ধর্মের উপাসকরা এসেছিলেন তারই ফিরিস্তি রচনার এটি হল এক গৌরচন্দ্রিকা মাত্র। তবে হাল আমলের মঠ বা আখড়াগুলি এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, একশো বছর আগের প্রাচীন সেসব অস্থলের বিবরণই এর মধ্যে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে প্রথমেই আসা যাক, শৈব সম্প্রদায় প্রসঙ্গে। এ জেলার অধিকাংশ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দিরগুলি দেখলে বোঝা যায় শৈব সাধনার প্রভাব কত বিস্তৃত। চৈত্রমাসে শিবের গাজন ও চড়ক এ জেলার এক অন্যতম লৌকিক অনুষ্ঠান। দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত শৈব ধর্মের এই প্রাধান্যের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, বাইরে থেকে দশনামী শৈব সন্ন্যাসীরা এসে এ জেলায় নানাস্থানে মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করে মহন্ত বৃত্তি চালু করে দিয়েছেন। বাংলার ধর্মাচরণ ক্ষেত্রে এই 'মহন্ত' প্রথা যে বাইরে থেকে অবাঙ্গালীরা আমদানী করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। আঠার শতকের মধ্যভাগে তারকেশ্বরে এই

সন্ন্যাসীরা প্রথম মঠ তৈরী করেন এবং পরে এরা অন্যান্য জেলায় ছড়িয়ে পড়েন।

১৯২১ সালে প্রকাশিত তারকেশ্বরের প্রাক্তন মহন্ত সতীশচন্দ্র গিরি মহারাজের লিখিত 'তারকেশ্বর শিবতত্ত্ব' নামে এক গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে, মেদিনীপুর জেলায় চাঁইপাট, রেয়াপাড়া, চেতুয়া, মারীচদা, গড়বেতা এবং কাঁথি মহকুমায় কোন এক বালুযুক্ত গ্রামে এই সম্প্রদায়ের মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রকাশিত এ বিবরণ থেকে দেখা যায়, এ জেলায় দাসপুর থানার চাঁইপাটে দশনামী গিরির বদলে ভারতী সম্প্রদায়ের মঠ এখনও বর্তমান রয়েছে, যেটি আজও উত্তর ভারতের শৃঙ্গেরী মঠের শাখা। নন্দীগ্রাম থানার রেয়াপাড়া গ্রামে সিদ্ধিনাথ শিবের মন্দিরটি নাকি প্রতিষ্ঠা করেন তারকেশ্বরের দশনামী গিরি সম্প্রদায়ের মহন্ত মায়াগিরি এবং এ সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তী হল, মায়াগিরির শিষ্য ভারামল্ল সন্ন্যাস গ্রহণ করে এখানে চলে আসায় তার পত্নী স্বামীর সন্ধানে এখানে এসে দুঃখে ও ক্ষোভে রেয়াপাড়ার কাছাকাছি গোপালপুর গ্রামের এক দিঘিতে আত্মবিসর্জন দেন। কিংবদন্তী যাই হোক, সিদ্ধিনাথের শিবমন্দিরটি আজও আছে তবে বর্তমানে দশনামীদের কোন কর্তৃত্ব নেই।

অন্যদিকে প্রদত্ত তালিকা অনুযায়ী এ জেলার চেতুয়া অর্থাৎ দাসপুর থানার ভিহিচেতুয়া গ্রামে এ সম্প্রদায়ের কোন মঠ খুঁজে পাওয়া না গেলেও, কাছাকাছি সুরতপুর গ্রামে এ সম্প্রদায়ের এক শৈবমঠ ছিল, যা পরে সেখানকার মঠাধ্যক্ষ সুরথগিরির নামে গ্রামের নামকরণ হয় সুরতপুর। দশনামী মহন্তদের লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায়, বর্ধমান রাজার সঙ্গে এই দশনামীদের একদা বিরোধ হওয়ায় বর্ধমানরাজ এ সম্প্রদায়ের শৈব প্রভাব খর্ব করার জন্য কোন এক হাজারী পরিবারকে এখানে পাঠান। বিবরণটির মধ্যে যে যথার্থতা নেই এমন নয়; বর্তমানে এ গ্রামে বসবাসকারী হাজারী পরিবারের কাছে অনুসন্ধানে জানা যায়, তাঁদের পূর্বপুরুষ এসেছিলেন বিহার থেকে এবং কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণ হলেও তারা লোহার বর্মজালে দেহ আবৃত করে যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে এখানে অধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হন। পরে বর্ধমানরাজ প্রদত্ত ভূসম্পত্তি ভোগ করে স্বীয় গৃহদেবতা রঘুনাথের মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন।

তবে সুরতপুরে দশনামীদের বর্তমানে কোন অস্তিত্ব না থাকলেও কাছাকাছি

দাসপুর থানার লাওদা গ্রামের ভুতেশ্বর শিবমন্দির ও মঠের মহন্ত ছিলেন এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা এবং লোকনাথ গিরি হলেন এখানকার শেষ মহন্ত।

মহন্তদের বিবরণ অনুযায়ী মারীচদা-কেওড়ামালে হটেশ্বর শিব এবং কাঁথি মহকুমার পঞ্চবদন গ্রামের কোন সঠিক হদিশ পাওয়া যায় না। গড়বেতায় দশনামীদের আশ্রম হয়ত ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেসম্পর্কে কোন খোঁজখবর পাওয়া যায় না। তবে দাঁতন থানার এলাকাধীন কেদার গ্রামে কেদার পাবকেশ্বর শিবের সেবাইত হিসাবে গিরি মহন্তদের নাম পাওয়া যায়। তবে এরা দশনামী গিরি সম্প্রদায়ভুক্ত কিনা তা জানা যায় না। সুতরাং বেশ বোঝা যায়, দশনামী সন্ন্যাসীরা এইভাবে স্থানীয় ভূস্বামীদের সহযোগিতায় নানাস্থানে মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নিজেদের অধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছেন, যার ইতিহাস আজও অনুল্লেখিত থেকে গেছে।

দশনামী ছাড়াও এ জেলায় শৈব উপাসকদের মধ্যে আছেন নাথ যোগী সম্প্রদায়। এদের প্রধান গুরু গোরক্ষনাথ অবধূত যোগী, পিতার নাম মহেন্দ্র-নাথ ও পিতামহ হলেন আদিনাথ। তাছাড়া এ সম্প্রদায় 'কনফট' যোগী নামেও পরিচিত। এদের সাধন ভজনের প্রাচীন আশ্রম ছিল হুগলীর মহানাদে এবং পরে কলকাতার দমদমের কাছে অর্জুনপুরে প্রতিষ্ঠিত শাখা আশ্রমই বর্তমানে প্রধান আশ্রমে পরিণত হয়। সম্ভবতঃ আঠার শতকের প্রথম দিকে এদের একটি শাখা আশ্রম হয় পাঁশকুড়া থানার শ্যামসুন্দরপুর-পাটনা গ্রামে। কাশীজোড়া পরগণার ভূস্বামীদের আনুকূল্যে এরা যেমন বহু জমিজিরেত ভোগ করেছেন তেমনি ঐ রাজপরিবারের সাহায্যে শ্যামসুন্দরপুর-পাটনা গ্রামের আশ্রমে বেশ কিছু মন্দির-দেবালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানকার প্রধান মহন্ত সিদ্ধিনাথের সমাধির উপর যে পঞ্চরত্ন মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে, সেটির লিপিফলকে প্রতিষ্ঠাকাল উল্লিখিত হয়েছে ১৬৮৯ শকাব্দ, অর্থাৎ ১৭৬৭

উগ্র ও কলহপ্রিয় বলে কথিত নাগা সন্ন্যাসীরাও এসেছেন চন্দ্রকোণায়। সম্ভবতঃ সতর শতকে চন্দ্রকোণার অধিপতি ভান রাজাদের আমলে বা তারও আগে এদের পদার্পণ ঘটেছিল। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' পুস্তকের রচয়িতা অক্ষয়চন্দ্র দত্তের মতে, 'যে সমস্ত সন্ন্যাসী মস্তকের জটাগুলি রজ্জুর ন্যায় পাক দিয়া উষ্ণীষের মত বদ্ধ করিয়া রাখে তাহারাই নাগা।' চন্দ্রকোণা থানার এলাকাধীন বাঁশদহ গ্রামে নাগা সন্ন্যাসীদের প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন ঝামা-

পাথরের ভগ্ন মন্দির এবং 'নাগা পুকুর' নামে কথিত এক জলাশয়ের পাড়ে এই সম্প্রদায়ের মহন্ত-সন্ন্যাসীদের সমাধি-মন্দিরগুলিই সেই সাধকদের স্মৃতিচিহ্ন আজও বহন করে চলেছে। এ ছাড়া আঠার শতকের মধ্যভাগে হরিদাস নাগা নামে জনৈক পশ্চিমদেশীয় সাধক কাশীজোড়া পরগণার ভূস্বামী রাজনারায়ণের আনুকূল্যে পাঁশকুড়া থানার রঘুনাথবাড়িতে রঘুনাথজীউর এক অস্থল প্রতিষ্ঠা করেন। কাঁথি থানার বাহিরী ও দরিয়াপুরেও নাগা সম্প্রদায়ের প্রাচীন অস্থল দুটি এখনও বর্তমান।

শিব উপাসক হিসাবে জেলায় আর এক গৃহী যোগী সম্প্রদায় আছেন। ভিক্ষাকালে মৌনী অবস্থায় এঁদের একহাতে থাকে লাউখোলা থেকে তৈরী এক ভিক্ষাপাত্র ও অন্যহাতে একটি ডমরু বাদ্য। ভিক্ষা প্রার্থনায় গৃহস্থের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দ্বিপ্রহর পর্যন্ত ঐ ডমরুটি বাজানোর নিয়ম এবং পরবর্তী সময়ে ঐ বাদ্যটির পরিবর্তে বাজানো হয় একটি ক্ষুদ্রাকার শিঙ্গা। জনশ্রুতি যে, কাশীজোড়া পরগণার ভূস্বামীদের আনুকূল্যে এই সম্প্রদায় প্রথম যে গ্রামে বসতি স্থাপন করেন, পরবর্তীকালে সেই গ্রামের নামকরণ হয় যুগীবেড়।

পঞ্চোপাসকদের মধ্যে শৈব ছাড়া বাংলায় শাক্তধর্ম সর্বাপেক্ষা যে প্রবল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ জেলায় শাক্ত সম্প্রদায়ের প্রাচীন মঠ বা অস্থল সম্পর্কে তেমন কিছু জানা না গেলেও, বিভিন্ন পুঁথিপত্রে এ জেলায় অবস্থিত দুটি শাক্ত-উপপীঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার রচিত এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (দ্রঃ লেটার্স ১৪, খণ্ড ১, ১৯৪৮) প্রকাশিত এক প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, এ জেলার তমলুক এবং কাছাকাছি বিভাস গ্রাম খ্যাত হয়েছিল দুটি শাক্ত-উপপীঠ প্রতিষ্ঠার জন্যে। তবে এ দুটি উপপীঠের উল্লেখ পাওয়া গেলেও, স্থান দুটির সনাক্তকরণে বেশ অসুবিধে দেখা যায়। তমলুকে প্রতিষ্ঠিত বর্গভীমা দেবী যদি ঐ শাক্ত-উপপীঠের একটি হয়, তবে অবশিষ্ট বিভাস গ্রামটির কোন হদিশ পাওয়া যায় না। বর্তমানে এ জেলায় শাক্তদের তেমন কোন আখড়া না থাকলেও, একদা এ জেলার নানাস্থানে যে শক্তি উপাসনার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু মন্দির-দেবালয় নির্মিত হয়েছিল, তা আজও বর্তমান। এ বিষয়ে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষোল শতকে প্রতিষ্ঠিত গড়বেতার ও সতের শতকে প্রতিষ্ঠিত কেশিয়াড়ীর দুটি সর্বমঙ্গলার মন্দির উল্লেখযোগ্য। তবে জেলার নানাস্থান থেকে শক্তিমূর্তি হিসাবে গৌরী, চামুণ্ডা, মহিষমর্দিনী, সপ্তমাতৃকা প্রভৃতি পাথরের যেসব ভাস্কর্য-মূর্তি পাওয়া গেছে, তা থেকে বেশ

বোঝা যায় শাক্ত উপাসনার ক্ষেত্রেও এ জেলায় এক ঐতিহ্য বর্তমান। বৈষ্ণবধর্মের স্রোতে শাক্ত উপাসনা পরবর্তীকালে যে ম্লান হয়ে এসেছিল তাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

পঞ্চোপাসকদের মধ্যে আর একটি হল সৌর সম্প্রদায়। সূর্য যাদের ইষ্ট দেবতা, তারাই হলেন সৌর। ব্রাহ্মপুরাণে জানা যায়, উৎকলে এক সময় সূর্যোপাসনার সামধিক প্রচলন ছিল। ওড়িশার লাগোয়া এ জেলার নানা স্থানে খ্রীষ্টীয় দশ শতক থেকে তের শতক পর্যন্ত সময়ের বহু সূর্যমূর্তিও পাওয়া গেছে। সূর্য উপাসনার এ সব প্রাচীন ঐতিহ্য ছাড়াও এ জেলায় সৌরব্রহ্ম সম্প্রদায়ের আগমন ঘটেছিল। দাসপুর থানার রাজনগরের কাছাকাছি ঝুমঝুমি গ্রামে এবং চন্দ্রকোণা থানার পলাশচাবড়ী গ্রামে একদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই সৌরব্রহ্ম সম্প্রদায়ের আশ্রম, যা ছিল ওড়িশার বাকলদাস বাবাজীর আখড়ার অধীন।

সৌরব্রহ্ম ছাড়া গাণপত্য সম্প্রদায়ের মঠও এ জেলায় একদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গণপতির অর্থাৎ গণেশের উপাসকরাই হলেন গাণপত্য। এ জেলার ঘাটাল থানার এলাকাধীন নিমতলায় এই সম্প্রদায়ের একটি মঠের অস্তিত্ব ছিল, যেখানে স্থাপিত হয়েছিল বৃহৎ একটি গণেশ মূর্তি। তবে বর্তমানে এ মঠের তেমন কোন অস্তিত্ব না থাকলেও মঠের শেষ মহন্ত ভৈরবেন্দ্র পুরীর সমাধি-মন্দিরটি বর্তমান। মঠে উপাসিত ঐ গণেশ মূর্তিটি যে কোথায় স্থানান্তরিত হয়েছে তা জানা যায়নি।

পঞ্চোপাসকদের মধ্যে আর একটি প্রধান সম্প্রদায় হলেন বৈষ্ণব। এ জেলার বিভিন্ন স্থানে একদা খ্রীষ্টীয় দশ থেকে তের শতক পর্যন্ত সময়ে নির্মিত যেসব বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে তা থেকে এ জেলার বৈষ্ণব সাধনার ধারাবাহিকতা সম্পর্কে বেশ কিছুটা উপলব্ধি করা যায়। তবে পরবর্তীকালে বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে এ জেলায় নানাবিধ মঠ-মন্দির ও অস্থল স্থাপন করেছিলেন তেমন নজিরও বর্তমান।

পদ্মপুরাণে বৈষ্ণবের যে চার সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা হলেন রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য এবং নিম্বাদিত্য। এ জেলায় দেখা যাচ্ছে, বিষ্ণুস্বামী ছাড়া অপর তিন সম্প্রদায়ই তাদের আখড়া স্থাপন করেছিলেন। রামানুজ সম্প্রদায়ের পণ্ডিত স্বরূপরামানুজ আনুমানিক ষোল শতকে দাক্ষিণাত্যের প্রধান গদী শ্রীরঙ্গধাম থেকে চন্দ্রকোণায় এসেছিলেন নিজ ধর্ম প্রচারার্থে।

তদানীন্তন চন্দ্রকোণারাজ তাঁর সাধনভজনের জন্য অস্থল নির্মাণে বেশ কিছু ভূসম্পত্তিও দান করেছিলেন। স্বরূপরামানুজ জঙ্গল কেটে যে স্থানটিতে অস্থল নির্মাণ করেন, পরে তারই নাম হয় নয়াগঞ্জ। এ সম্প্রদায়ের রঘুনাথ ও গোপীনাথজীউর মন্দির ও অস্থলবাড়ি আজও বর্তমান। পরবর্তী সময়ে কেশপুর থানার শ্যামচাঁদপুর, দাসপুর থানার সামাট ও বৈকুণ্ঠপুর, চন্দ্রকোণা থানার ক্ষীরপাই ও হরিনারায়ণপুরে এ সম্প্রদায়ের শাখামঠ প্রতিষ্ঠিত হয়।

রামানুজ আশ্রমের মহন্ত লছমন দাস মহারাজের শিষ্য দামোদর দাস চন্দ্রকোণার দক্ষিণবাজারে আর এক শাখা অস্থল নির্মাণ করেন এবং কালক্রমে সেখানকার অস্থলটি উঠে গেলে নির্ভয়পুরে একটি শাখা অস্থল প্রতিষ্ঠা করা হয়।

রামানুজ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত আর একটি অস্থলের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, অধরচন্দ্র ঘটক রচিত 'নন্দীগ্রাম ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে। রামানুজ সম্প্রদায়ের মস্তারাম আউলিয়ার স্থাপিত মুর্শিদাবাদের সাধকবাগ আখড়ার মহন্ত ভরতদাস আউলিয়া খ্রীষ্টীয় আঠার শতকে একটি শাখা কেন্দ্র স্থাপন করেন নন্দীগ্রাম থানার কালিচরণপুর গ্রামে। গঙ্গাসাগর তীর্থ তখন এই সম্প্রদায়ের হাতে থাকায়, ঐ মহন্তের শিষ্য গৌরীরামদাস আউলিয়া পৌষ সংক্রান্তির একমাস আগে এখানে অবস্থান করে পরে এখান থেকেই গঙ্গাসাগর তীর্থে গমন করতেন। সম্ভবতঃ মহিষাদলের ভূস্বামী উপাধ্যায় ও গর্গ পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতাও এ সম্প্রদায় লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কেননা এ অস্থলের কাঠের রথটি ভগ্ন হয়ে যাওয়ায় তা সংস্কার করে দেন মহিষাদলের গর্গ পরিবার। অন্যদিকে মহিষাদলের রাণী জানকী যে চিত্রিত তুলসীদাসী রামায়ণটি পাঠ করতেন সেটি এই আশ্রম থেকেই সংগৃহীত হয়ে বর্তমানে কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়মে স্থান পেয়েছে।

রামানুজ সম্প্রদায়ের মত উত্তর ভারত থেকে রামানন্দী সম্প্রদায়ও এখানে এসেছেন এবং চন্দ্রকোণার নরহরিপুরে একটি অস্থলও প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিংবদন্তী যে, সতের শতকের গোড়ার দিকে এ গোষ্ঠীর হাবড়া দাস নামে এক মহন্ত মহারাজ রাজস্থানের গলতাগাদী থেকে এখানে আসেন এবং চন্দ্রকোণার ভূস্বামীদের আনুকূল্যে ভূসম্পত্তি লাভ করে এই রামানন্দী মঠটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ঘাটাল থানার রাণীরবাজার ও দন্দিপুরেও এদের শাখা মঠ স্থাপিত হয়।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ও এ জেলার দাসপুর থানার বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে এক অস্থল স্থাপন করেছিলেন। আঠার শতকের প্রথম দিকে বর্ধমান রাজগঞ্জের নিম্বার্কমঠের শ্রীসুখদেবশরণ দেবাচার্য ছিলেন এই মঠটির প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে এ গ্রামে রামানুজদের অস্থলটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও এ গোষ্ঠীর মঠটি এখনও বর্তমান।

বৈষ্ণব সমাজের আর এক প্রধান সম্প্রদায় হলেন মধ্বাচারী। চন্দ্রকোণা থানা এলাকায় ক্ষীরপাইয়ের কাছাকাছি কাশীগঞ্জে খ্রীষ্টীয় সতের শতকের প্রথম দিকে যে মধ্বাচার্য মঠটি স্থাপিত হয় তার মহন্ত ছিলেন জয়গোপাল দাস। পরে আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে বর্গী আক্রমণের দরুণ এ অস্থলটি উঠে আসে চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত জয়ন্তিপুর গ্রামের মুড়াকাটা এলাকায়। বর্ধমান-মহারাজ এ সম্প্রদায়ের সাধনভজনের জন্য একদা বহু ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন। বর্তমানে দাসপুর থানার খুকুড়দা ও কৈগেড়িয়া-কুলপুখুর, পাঁশকুড়া থানা এলাকার দক্ষিণ ময়নাডাল, নারায়ণগড় থানার পুরুষোত্তমপুর, নন্দীগ্রাম থানার বাড়সিঁদুরটিকা এবং পিঙলা থানার এলাকাধীন কাঁটাপুকু ও মীরুপুর গ্রামে এ সম্প্রদায়ের মঠ-মন্দির প্রভৃতি আজও লক্ষ্য করা যায়।

এ জেলায় আর একটি প্রাচীন বৈষ্ণবমঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঘাটালেরর নিমতলায়, যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বৃন্দাবনের পরশুরাম ব্রজবাসী। কিংবদন্তী যে, চেতুয়া-বরদার ভূস্বামী শোভা সিংহ এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্প্রদায়ের অস্থলটির পুজার্চনার জন্য ভূসম্পত্তিও দান করেছিলেন।

এছাড়া এ জেলায় নানাস্থানে চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের যেসব মঠ বা আখড়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্যে চন্দ্রকোণার গোঁসাইবাজারে প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব মঠটি উল্লেখযোগ্য। শ্রীজীব গোস্বামী কর্তৃক বৃন্দাবন থেকে প্রেরিত হয়ে আনুমানিক সতর শতকের গোড়ার দিকে প্রেমসখী গোস্বামী বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে এখানে আসেন। আজও এখানে তার ভগ্ন সমাধিমন্দিরটি সেই প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন বহন করে চলেছে।

এ জেলার গোপীবল্লভপুরে প্রভু শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দ সতক শতকের প্রথম দিকে যে বৈষ্ণব মঠটি প্রতিষ্ঠা করেন, সেটির দুটি শাখা আশ্রম স্থাপিত হয় কেশিয়াড়ীতে, যার একটির পরিচালক ছিলেন কিশোর পুরুষোত্তম এবং অন্যটির উদ্ধব দামোদর। এছাড়া গোপীবল্লভপুর মঠের অধীনে যে শাখা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্যে দাসপুর থানার কিসমৎ নাড়াজোল,

আজুড়িয়া ও কিশোরপুর, খড়্গপুর থানার ধারেন্দা ও সাঁকোয়া, সবং থানার আদাসিমলা গ্রাম এবং তমলুক, নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা, ময়না, ভেবরা, ভগবানপুর, পটাশপুর ও নারায়ণগড় থানা এলাকার বিভিন্ন গ্রামে প্রতিষ্ঠিত সেসব বৈষ্ণব মঠগুলি অন্যতম।

বৈষ্ণব সাধক নিত্যানন্দের পৌত্র গোপীবল্লভের প্রতিষ্ঠিত আউলিয়া গোস্বামীর শ্রীপাট স্থাপিত হয়েছিল চন্দ্রকোণা থানার বসনছোড়া গ্রামে, যার একটি শাখা আশ্রম ছিল ঐ থানার রঘুনাথপুরে।

শুধুমাত্র চন্দ্রকোণার আশপাশে সেকালে যেসব বৈষ্ণব শ্রীপাট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্যে বাঁশদহ গ্রামে প্রভু অভিরাম গোস্বামীর শ্রীপাট, গোপীনাথপুরে সরস্বতীবংশীয় গোস্বামীগণের শ্রীপাট, লালবাজার গ্রামে শ্রীনরোত্তমের শ্রীপাট, প্রভু নিত্যানন্দের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ শ্রীবলরাম গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত খড়দহ শ্রীপাটের অধীন দলমাদল গ্রামে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবলরাম শ্রীপাট, যার শাখা আশ্রম ছিল কাছাকাছি নিত্যানন্দপুর গ্রামে, জয়ন্তিপুরে শ্রীরাধারসিকনাগরজীউর শ্রীপাট, বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে চৈতন্য পার্ষদ বক্রেশ্বর প্রভুর শিষ্য শঙ্করারণ্যের পৌত্র শ্রীহরিদেবাচার্য প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপীমোহনজীউর শ্রীপাট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পাশাপাশি ঘাটাল থানা এলাকার নানাস্থানে একদা স্থাপিত হয়েছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আশ্রম, যার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আজও বেশ কিছু প্রাচীনমন্দির-দেবালয় লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, কোন্নগর, শ্যামপুর, কিসমৎ কোতলপুর প্রভৃতি গ্রামে স্থাপিত বৈষ্ণব আখড়া ও আশ্রম।

অনুরূপ দাসপুর থানার চতুর্দিকে যেসব গৌড়ীয় বৈষ্ণবমঠ স্থাপিত হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ডিহি বলিহারপুর গ্রামে শ্রীচৈতন্য পার্ষদ বক্রেশ্বর গোস্বামীর সুযোগ্য শিষ্য শ্রীগোপাল গুরুর ভক্ত শ্রীগোবিন্দরাম পাঠক গোস্বামীর শ্রীপাট। এই থানা এলাকার দাসপুর, হরেকৃষ্ণপুর, রামকৃষ্ণপুর, বাসুদেবপুর, রামদেবপুর, ফকিরবাজার, গৌরা, কিশোরপুর, কোটালপুর, সোনামুই, চেঁচুয়া-গোবিন্দনগর, রঘুনাথপুর, সৌলান, বৃন্দাবনপুর, কাদিলপুর, জোতবাণী, শ্রীরামপুর, হোসেনপুর, বৃন্দাবনচক প্রভৃতি গ্রামেও একদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বৈষ্ণব মঠ ও ঠাকুরবাড়ি। পিংলা থানার আগড়আড়া গ্রামেও দেখা যায় এক প্রাচীন বৈষ্ণব আশ্রম।

পাঁশকুড়া থানার অন্তর্ভুক্ত মেড়েচক গ্রামের গিরিগোবর্ধনজীউর আশ্রম

এবং গোপীমোহনপুর গ্রামের রাধাবল্লভজীউ আশ্রম প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন কাশীজোড়া পরগণার তদানীন্তন ভূস্বামী।

দাঁতন থানা এলাকায় সাউরি গ্রামে একদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মায়াপুর গোদ্রুম আশ্রমের শাখা বৈষ্ণব মঠ প্রপন্নাশ্রম এবং কেশিয়াড়ীতে এই আশ্রমের একটি শাখা হল শুদ্ধভক্তি নিকেতন।

এছাড়া এ জেলার বিভিন্ন গ্রামে শতাধিক বৎসরের প্রাচীন আরও যেসব বৈষ্ণব আশ্রম ও মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলির তালিকা যে অসমাপ্ত থেকে গেল, তা বলাই বাহুল্য।

এতক্ষণ পঞ্চোপাসকদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আরও যেসব উপাসক-সম্প্রদায় এ জেলায় অস্থল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাদের মধ্যে সহজিয়া পন্থীরা অন্যতম। সে সময়ে এ জেলায় সে সম্প্রদায়ের যেসব আখড়া স্থাপিত হয়েছিল তার কেন্দ্র ছিল পটাসপুর, নৈপুর, সৌলান, জ্যোতঘনশ্যাম ও তমলুক এলাকায়। এ গোষ্ঠীও বৈষ্ণবদের মত তিলক ও মালা ধারণ করেন বটে, তবে এরা ভীষণভাবে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব মতবাদের বিরোধী। এদের ধর্মীয় মূলতত্ত্ব হলো : 'যাহা নাই ভাণ্ডে তাহা নাহি ব্রহ্মাণ্ডে', অর্থাৎ অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল পদার্থই মানুষের শরীরে বিদ্যমান আছে এবং জীবের যে ধর্ম স্বভাবিক তাহাই সহজ ধর্ম বা সহজিয়ার ধর্ম। সুতরাং রস আস্বাদনই যখন জীবের স্বাভাবিক ধর্ম তখন মদ্য, মাংস ও মৈথুন দ্বারাই দেহস্থিত রস প্রকাশিত করাই হলো সহজিয়া ধর্ম।

এ জেলায় আর এক অন্যতম ধর্ম প্রচারক হলেন নানকপন্থীরা। পাঞ্জাব থেকে আগত উদাসীন সম্প্রদায় একদা চন্দ্রকোণা থানার রামগড় মৌজায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এক নানক-সঙ্গত। এছাড়া মেদিনীপুর শহরেও নানক-পন্থীদের যে একটি অস্থল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার সাক্ষ্যস্বরূপ 'সঙ্গত বাজার' এলাকার নামটি সেই স্মৃতি বহন করে চলেছে। আঠার শতকের প্রথম দিকে কাশীজোড়া পরগণার রাজাদের আনুকূল্যে নানকপন্থী আর একটি সঙ্গত প্রতিষ্ঠা হয় পাঁশকুড়া থানার চাঁচিয়াড়া গ্রামে।

পরিশেষে, এ জেলার অস্থলের কথা 'অধিক কহিব কত পুঁথি বেড়ে যায়।' একদিকে তো তালিকা সম্পূর্ণ করা গেল না, অন্যদিকে বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত আলোচ্য এসব অস্থল বা মঠের অনেকগুলিরই অস্তিত্ব হয়ত আজ আর নেই। তবুও যে কটি আশ্রম কোনক্রমে টিকে ছিল, সেগুলি

জমিদারীপ্রথা উচ্ছেদের ফলে ভূমিস্বত্ব থেকে আয়ের পথ রুদ্ধ হওয়ার কারণে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়েছে বা হতে চলেছে। তাই সে সব বিভিন্ন উপাসকদের এক বিস্তারিত তালিকা প্রণয়নের প্রয়োজন আজ জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ প্রশ্ন থেকে যায়, কিসের টানে এসেছিলেন এসব ধর্মপ্রচারকরা? শুধুই কি ধর্মের টানে, না অন্য ধর্মের বিপক্ষে নিজ ধর্ম প্রসারে, অথবা ধর্মীয় আবরণে এলাকাগতভাবে আধিপত্য বিস্তারে বা কোন, অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের টানে? এখন আগামীকালের গবেষকদের দরবারে এ আর্থ-সামাজিক প্রশ্নটি মীমাংসার জন্য তোলা রইল।

৩৫. কুরুমবেড়াঃ দুর্গ না দেবায়তন?

পথ চলতে চলতে এ জেলায় কত যে ধ্বংসস্তূপ নজরে পড়ে তার ইয়ত্তা নেই। পাথর দিয়ে তৈরী এমন অনেক সৌধ বা মন্দির-দেবালয়ের ভগ্নাবশেষ আমাদের যখন কৌতূহলী করে তোলে তখন সেগুলির প্রকৃত ইতিহাস জানার জন্যে একান্তই ব্যগ্র হয়ে পড়তে হয়। কিন্তু কিংবদন্তী ছাড়া সেক্ষেত্রে আর কোন তথ্যই জানা যায় না। তবে ভগ্নস্তূপে পরিণত না হয়েও এমন দু'একটি স্থাপত্যসৌধ যে আজও কালের করাল গ্রাস এড়িয়ে কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে তেমন উদাহরণেরও অভাব নেই। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হ'ল কেশিয়াড়ী থানার অন্তর্গত গগনেশ্বর গ্রামে ঝামাপাথরের কুরুমবেড়া দুর্গ, যাকে কেউ কেউ করমবেড়াও বলে থাকেন। ইংরেজ সাহেবরা জেলার গেজেটিয়ার রচনার সময় এটিকে দুর্গ বলেই আখ্যাত করেছেন। সেজন্য এখানের এই কেল্লাটি সম্পর্কে আমাদের আগ্রহের অন্ত নেই।

এখানে যেতে হলে খড়্গপুর-বেলদার যে বাস কেশিয়াড়ী হয়ে যায় সেই বাসে কুকাই নেমে পশ্চিমে প্রায় চার কিলোমিটার দূরত্বে গগনেশ্বর গ্রামে আসতে হবে। অবশ্য কেশিয়াড়ী থেকে হাঁটাপথেও এ গ্রামে আসা যায়, তবে দূরত্ব একটু বেশি। কথিত এই গগনেশ্বর গ্রামের (জে. এল. নং ১৫৪) এক প্রান্তে অবস্থিত প্রসিদ্ধ কুরুমবেড়া দুর্গটি আজ ভগ্নদশায় পৌঁছোলেও এখনও কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে। স্থানীয়ভাবে জানা যায়, 'কুড়ুম' শব্দটি একান্তই

দেশী শব্দ, যার অর্থ করা হয়েছে পাথর ; সুতরাং পাথরের বেড়া দিয়ে ঘেরা স্থাপত্যকর্মটির নাম শেষ পর্যন্ত যে কুরুমবেড়া হয়ে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি !

দুর্গের বর্তমান প্রবেশপথ উত্তর দিকে। আর তারই লাগোয়া মজে যাওয়া এক বিরাট পুষ্করিণী যার নাম ছিল নাকি যজ্ঞেশ্বর কুণ্ড। কিংবদন্তী যে, এখানের এই সুগভীর পুষ্করিণীটিতে একদা বেশ কিছু কুমীর চরে বেড়াতো। কিন্তু এ জলাশয়ের সে ভরা যৌবন কবেই যেন হারিয়ে গেছে, পুকুরের চারপাশের ঘেরা উঁচু বাঁধ আর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নেই, বরং সেটি আজ এক শুষ্ক সরোবর মাত্র।

যজ্ঞেশ্বর কুণ্ডের দক্ষিণ গায়ে আলোচ্য এ দুর্গপ্রাকারের প্রবেশপথটি, বলতে গেলে সেটি ঝামাপাথরের এক বিরাট তোরণ। প্রায় বার ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা এ সৌধটি। বাইরের প্রাচীর দেওয়ালের মাথায় 'ছাজা' হিসাবে ব্যবহৃত প্রায় দেড়ফুট আকারের যে পাথরটিকে উল্টাতভাবে বসানো হয়েছে, তার গায়েও খোদিত হয়েছে পীঢ়া রীতির ধাপযুক্ত নকশা। অন্যদিকে ফটকে সংযুক্ত কপাটটি আজ নিশ্চিহ্ন। কিন্তু তা হলেও বিরাট সে দরজাটি যে খোলা ও বন্ধ করা হ'ত তার টানাপোড়েনের দাগ আজও রয়ে গেছে পাথরের মেঝেতে। ভিতরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে আয়তাকার এ সৌধপ্রাকারটির চারদিকেই প্রায় আটফুট প্রশস্ত খোলা বারান্দা, যার ছাদ তৈরী হয়েছে ধাপযুক্ত 'লহরা'পদ্ধতি অনুসরণ করে। বারান্দায় ছ' ফুট ন' ইঞ্চি ছাড়া ছাড়া একটি করে স্তম্ভ সংযোজিত হয়েছে উপরের ছাদটিকে ধরে রাখবার জন্য। দুটি স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানটি নির্মিত হয়েছে চারদিক থেকে বর্গাকারভাবে 'লহরা' পদ্ধতি অনুযায়ী ধাপে ধাপে পাথর বসিয়ে ছাদ নির্মাণে এবং তার শেষ কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করা হয়েছে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের নকশাযুক্ত প্রস্তরফলক। ফলে বারান্দায় পাশাপাশি দুটি থামের মধ্যবর্তী স্থানে ছাদের মধ্যবিন্দুতে এই পদ্মনকশা সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। অনুরূপ উত্তরের প্রবেশপথটির ছাদের মধ্যস্থলেও পদ্ম-নকশাযুক্ত পাথরের এক ফলক সংযোজিত হয়েছে, তবে তা যে তুলনায় বেশ বড়ো আকারের তা বলাই বাহুল্য। এবড়ো-খেবড়ো ঝামাপাথরের খোদাই পদ্ম-নকশাগুলির ফলকের উপর চুনবালির পলস্তারা দিয়ে যে সেটির যথার্থ রূপ দেবার চেষ্টা হয়েছিল তার নিদর্শন আজও বর্তমান।

কুরুমবেড়ার দালানে নিবদ্ধ থামগুলির ভাস্কর্যের মধ্যেও বেশ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। পুব-উত্তর দিকের থামগুলির গড়ন ঠিক সতের শতকে বাংলার চালা-মন্দিরে ব্যবহৃত থামের অনুকৃতি, কিন্তু পশ্চিম দিকের থামগুলি শিখর-দেউলের 'পাভাগ' অংশের মত 'খুরা' ও কুম্ভাকৃতি করে নির্মিত। দক্ষিণ অংশের বারান্দার ছাদ ভেঙ্গে পড়েছে সেজন্য সেখানের অলিন্দে কি ধরনের ভাস্কর্য খোদিত ছিল তা জানা যায় না। সেকালের বাস্তুশাস্ত্রমতে পুব দিকের দেওয়ালে ছিল একটি গবাক্ষ পথ, যার নিদর্শন আজও রয়ে গেছে। বলতে গেলে, গোটা চত্বর জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা ছোটবড় পাথরের টুকরো যেন এক বিষণ্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করে তুলেছে।

নির্জন পরিবেশে দাঁড়িয়ে থাকা তিনশো ফুট লম্বা আর দু'শো পঁচিশ ফুট চওড়া আয়তনবিশিষ্ট এ স্থাপত্যসৌধ প্রাকারের পুব গা লাগোয়া দেখা যাবে একটি দেবালয়ের ধ্বংসস্তূপ। এখনও স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে সে মন্দিরের ভিত্তিভূমি, যেটি ছিল পশ্চিমমুখী এক দেবালয়। ভাল করে নিরীক্ষণ করলে বোঝা যায় এটি ছিল ওড়িশি মন্দিররীতির জগমোহনসহ সপ্তরথ এক শিখর-দেউল। দেবালয়টির ভগ্নস্তূপের মধ্যে মাপজোক করে জানা যায় মূল মন্দিরটি উদ্গাত অংশ বাদে দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ছিল আঠারো ফুট ছ' ইঞ্চি এবং মন্দিরটির দেওয়াল ছিল চার ফুট ছ' ইঞ্চি চওড়া। সুতরাং এ হিসেবে অনুমান করা যেতে পারে যে, অতীতে হয়ত এ মন্দিরটির উচ্চতা ছিল প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট ফুটের মত। অন্যদিকে মূল মন্দিরের সঙ্গে লাগোয়া জগমোহনটির আকৃতি প্রথাগত সমান মাপের না হয়ে বেশ একটু বড়ো আকারের, যার তুল্য নিদর্শন দেখা যায় পশ্চিম ওড়িশায় বিভিন্ন স্থানের মন্দিরে ব্যবহৃত 'মুখশালা' নামক স্থাপত্যে। জগমোহনটি যে তিরিশ ফুট বর্গাকার ছিল তা মোটামুটি পরিমাপ করে জানা যায়। মন্দিরের চারদিকে ঢাকা পড়ে যাওয়া পাথরগুলিকে সরিয়ে দিলে অতীতের সে মন্দিরটির ভিত্তিভূমি ও আকৃতি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে পারা যায়।

প্রাঙ্গণের পুবদিক লাগোয়া যেমন এই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ তেমনি পশ্চিম-দিকে রয়েছে একটি পুবমুখী তিন গম্বুজ মসজিদ। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এ মসজিদটিরও অবস্থা শোচনীয়, সর্ব দক্ষিণের গম্বুজটি বর্তমানে ভেঙ্গে পড়েছে। এটির পশ্চিমের দেওয়ালে নিবদ্ধ এক ক্ষয়িত শিলালিপি অবশ্য আমাদের জ্ঞাত করায় এই মসজিদের নির্মাণকাহিনী।

মোটামুটি এই হল এখানকার স্থাপত্যকীর্তিটির বর্তমান অবস্থা। এখন প্রশ্ন হ'ল এটি কোন্ আমলের বা নির্মাণকর্তা কে? জেলা গেজেটিয়ারে এ সম্পর্কে আলোকপাত করে লেখা হয়েছে যে, ওড়িশা নৃপতি কপিলেশ্বর দেবের আমলের একটি ক্ষয়িত শিলালিপি এই দুর্গ ও মন্দিরের সময়কাল সূচিত করে। এ বিষয়ে 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' প্রণেতা যোগেশচন্দ্র বসুর বক্তব্য হ'ল, "...মন্দির গাত্রে উড়িয়া ভাষায় লিখিত যে প্রস্তর ফলকখানি আছে, তাহার প্রায় সকল অক্ষরই ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, কেবল দু' একটি স্থান অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট আছে, উহা হইতে 'বুধবার' ও 'মহাদেবঙ্ক মন্দির' এই দুইটি কথা মাত্র পাওয়া যায়।"

যোগেশবাবুর কথিত এই ধরনের কোন শিলালিপির সন্ধান পাওয়া না গেলেও, পশ্চিম দেওয়ালে যে ক্ষয়িত শিলালিপিটি দেখা যায়, সেটি অবশ্য এখানকার মসজিদটির নির্মাণ সম্পর্কিত। সে যাই হোক্, যোগেশবাবু কথিত শিলালিপির যেটুকু পাঠোদ্ধার করেছেন তাতে কপিলেশ্বর দেবের নাম নেই। তাহলে জেলা গেজেটিয়ারে কপিলেশ্বর দেবের প্রসঙ্গটি এলো কিভাবে? এ-ক্ষেত্রে যোগেশবাবু স্থানীয় জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে যে অনুমানভিত্তিক সিদ্ধান্তে এসেছেন সে সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হ'ল, "...উড়িষ্যাধিপতি রাজা কপিলেশ্বর দেব কর্তৃক এই মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল এবং সেই কথাই উক্ত প্রস্তর ফলকটিতে খোদিত ছিল। কপিলেশ্বর বা কপিলেন্দ্র দেব খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উড়িষ্যার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ...এইরূপ কিংবদন্তী যে, রাজা কপিলেশ্বর দেব কর্তৃক শিব মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বহুকাল যাবৎ উহা হিন্দুদিগের একটি পূণ্যস্থানরূপে পরিগণিত ছিল।' আসলে জনপ্রবাদটির মূল উৎসটি হ'ল, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের নাম কপিলেশ্বর মহাদেব থেকেই। এককালে রাজা-মহারাজাদের নামেই যে শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হ'ত তেমন উদাহরণেরও অভাব নেই। সেক্ষেত্রে যোগেশ-বাবুর অনুমানও যে তাই, তা তাঁর মন্তব্যেও জানা যায়। তাঁর মতে, '...পূর্বোক্ত কপিলেশ্বর নামক মহাদেবই ঐ শিবলিঙ্গ এবং কপিলেশ্বর দেবের প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই উহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে।"

ওড়িশার ইতিহাসে দেখা যায়, গজপতি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কপিলেশ্বর বা কপিলেন্দ্র দেবের রাজত্বকাল হল, ১৪৩৫ থেকে ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, তাঁর রাজত্ব বিস্তৃত ছিল

বর্তমান হুগলী জেলার দক্ষিণ অংশ মান্দারণ থেকে দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ পর্যন্ত, যার মধ্যে যুক্ত ছিল পূর্বঘাট পর্বতমালা ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্তী সমতল ভূভাগ। রাজত্ব বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সুনামের স্বাক্ষর রয়ে গেছে অসংখ্য মন্দির নির্মাণে আর দেব-দ্বিজের মধ্যে ভূমিদানে। সেদিক থেকে গগনেশ্বরে এই প্রাচীর ঘেরা মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা, হয়ত তার রাজত্বের বহু কীর্তিরাজির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

তাছাড়া গগনেশ্বর কোনদিনই আজকের মত নিঃশব্দ ও জনহীন গ্রাম ছিল না। সেকালে কেশিয়াড়ী ও পাশাপাশি গগনেশ্বর ছিল তসর-সিল্ক উৎপাদনের এক বড়ো কেন্দ্র। ফলে স্বভাবতই ব্যবসা-বাণিজ্যের দৌলতে এটিকে ঘিরে একদা গড়ে উঠেছিল এক সমৃদ্ধ জনপদ। জেলা গেজেটিয়ারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উনিশ শতকের গোড়ার দিকেও এই এলাকায় ছিল আট-নশো তন্তুবায় পরিবার, যারা তখনও ছিলেন এ শিল্পটির প্রতি নির্ভরশীল। সুতরাং আদিতে এই এলাকার কি সমৃদ্ধি ছিল তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। সেজন্য এমন এক শিল্পসমৃদ্ধপূর্ণ স্থানের সঙ্গে সংযোগকারী কোন বাণিজ্যপথের ধারেই যে রাজ অনুগ্রহে একটি দেবায়তন স্থাপিত হবে এমন ধারণা করা অস্বাভাবিক নয়। তাই যদি হয় তাহলে এখানকার মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল দাঁড়ায় পনের শতকের শেষ দিকে, অর্থাৎ কিনা যার শতাধিক বৎসর পরে নির্মিত হয়েছিল কেশিয়াড়ীর সর্বমঙ্গলাদেবীর মন্দির। তবে যিনিই এর প্রতিষ্ঠাতা হন না কেন, সেকালের এই স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য ও আকার-প্রকার এ অনুমানের স্বপক্ষেই মত প্রকাশ করে।

প্রাকার মধ্যস্থিত ভগ্ন মন্দিরটির সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা গেল, এবার এখানের মসজিদটির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক্। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মসজিদটির পশ্চিমে প্রাচীর দেওয়ালে ওড়িয়া ভাষায় উৎকীর্ণ এক শিলা-লিপি খুঁজে পাওয়া যায়। তবে সেটি এতই অস্পষ্ট যে, তার পাঠোদ্ধার করা খুবই দুঃসাধ্য। তা সত্ত্বেও এ লিপিটির মর্মোদ্ঘাটন করে একদা জেলা গেজেটিয়ারে লেখা হয়েছিল যে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১১০২ হিজরীতে অর্থাৎ ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক মহম্মদ তাহির এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। কথিত মহম্মদ তাহির যে কে, সে সম্পর্কে কোন হদিশ পাওয়া যায়

না, তবে একথা স্পষ্ট যে, এখানের এই হিন্দু মন্দির-স্থাপত্যটির বহু পরে এই মসজিদটির প্রতিষ্ঠা। 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে লেখা হয়েছে, '…মসজিদটির প্রস্তরগুলি দেখিলে মনে হয় যে, কোন হিন্দু মন্দিরের উপকরণ লইয়াই ইহা নির্মিত হইয়াছিল।' এ বিষয়ে জেলা গেজেটিয়ারের বক্তব্যও তাই। কিন্তু ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বেশ বোঝা যায়, মসজিদটি নির্মাণে বাইরে থেকে আলাদাভাবে বহু পাথর আনা হয়েছিল এবং গাঁথনিতেও চুনবালির পলস্তারা ব্যবহৃত হয়েছিল। মন্দিরে ব্যবহৃত পাথর দিয়ে যদি ঐ মসজিদটি নির্মিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়, তাহলে বর্তমানে দাঁড়িয়ে থাকা পাথরের এ সৌধপ্রাকারটির আর কোন অস্তিত্বই আজ আর খুঁজে পাওয়া যেত না। সুতরাং মন্দিরে ব্যবহৃত পাথরগুলি দিয়ে যে এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছে এ ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন।

তবে এটি নির্মাণের সময় এখানকার পশ্চিমের প্রবেশদ্বারটিকে সম্পূর্ণভাবে যে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বলতে গেলে এটিই ছিল এ স্থাপত্যসৌধটির প্রধান প্রবেশদ্বার, অর্থাৎ সে সময়ে যাকে বলা হ'ত সিংহদ্বার। বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে প্রকৃতই বোঝা যায় প্রধান এই প্রবেশপথে নিবদ্ধ অবশিষ্ট কিছু স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিদর্শনই সেই সিংহদ্বারের স্মারকচিহ্ন হয়ে আছে। অনুমান করা যায়, পরবর্তী সময়ে মসজিদ নির্মাণের পর এই প্রবেশদ্বারটি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সেইসঙ্গে পশ্চিম দেওয়ালে সিঁড়ি সংযুক্ত করে একটি চিল্লাখানা নির্মাণ করে সিঁড়ির বাঁদিকে লাগানো হয় ওড়িয়া ভাষায় রচিত মসজিদ নির্মাণের ঐ প্রতিষ্ঠাফলক।

মসজিদ প্রতিষ্ঠার এই যদি ইতিহাস হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে, ওড়িশার হিন্দু নরপতির পতনের পর এ মন্দির-প্রাকার মুসলমান অধিকৃত হয়। বিধর্মীদের দখলে আসায় স্বাভাবিকভাবেই মন্দির বিধ্বস্ত হয়, কিন্তু রেখে দেওয়া হয় সৈনিকদের বিশ্রাম লাভের জন্য মন্দির-প্রাকার সংলগ্ন অলিন্দটি। এইভাবেই বিজেতা ও বিজিতের যে সব সাক্ষ্য থেকে যায় এই স্থাপত্যরীতিতে, তাই পরে হয়ে ওঠে ইতিহাস। কিন্তু সে ইতিহাসের রথচক্র এখানেই থেমে থাকেনি। আঠার শতকের গোড়ার দিকে দুর্ধর্ষ মারাঠারা মোগলদের হটিয়ে দিয়ে এখানকার স্থাপত্যসৌধটি দখল নেয়। যুদ্ধই যখন তাদের ধ্যানজ্ঞান, তখন তারাও এটিকে নিজেদের প্রয়োজনে সেনাবাহিনীর ছাউনিতে পরিণত করে। সেনা-নিবাসের সৈন্যরা শিবভক্ত, তাই ভগ্ন মন্দিরে একদা স্থাপিত শিবলিঙ্গটির নতুন

করে পূজার্চনা সুরু হয়, কিন্তু মসজিদটি থেকে যায় অক্ষত। তবে এটি কি মারাঠাদের সহনশীলতার এক দৃষ্টান্ত, না তাদের ধর্মাধর্ম পালনে মসজিদ ভাঙ্গার উদ্যোগ গ্রহণ বিষয়ে চিন্তায় অবকাশই হয়ে ওঠেনি সেজন্য? ভাগ্যচক্রের নিয়মটাই এই! কোথায় স্থাপিত হয়েছিল এক মন্দির যার চারপাশ ঘেরা বারান্দায় ছিল যাত্রীনিবাস আর তাই শেষে কিনা হয়ে উঠলো বিজেতাদের সেনানিবাস, যা পরবর্তীকালে স্বতস্ফূর্তভাবেই পরিচিত হয়ে উঠলো 'দুর্গ' বা 'ছাউনি' আখ্যায়। পশ্চিমের সিংহদ্বার বিনষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু রয়ে গেছে উত্তরের দরজা, সেখান দিয়ে একদা তীর্থযাত্রীরা 'যজ্ঞকুণ্ড' নামক জলাশয়ে সহজেই পৌছুতে পারতো।

এখন লক্ষ্য করার বিষয়, সেনানিবাস বা ছাউনী হলে তার তো একটা পাহারা দেবার উঁচু স্তম্ভ বা বুরুজ থাকতো যা এখানে অনুপস্থিত। এবার যদি আমরা দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চিপুরমের কৈলাসনাথ মন্দির বা বৈকুণ্ঠপেরুমলের মন্দিরের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে গগনেশ্বরের এই মন্দির চত্বরের মতই চারদিক ঘেরা অলিন্দযুক্ত মন্দিরের নিদর্শন খুঁজে পাবো। দূরের উদাহরণের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক। এই মেদিনীপুর জেলার নয়াগ্রাম থানা এলাকার দেউলবাড়ের রামেশ্বরনাথের মন্দির-স্থাপত্য প্রসঙ্গে আসা যাক্। সেখানের মন্দিরের এই বাস্তু-নকসার সঙ্গে গগনেশ্বরের বেশ সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। রামেশ্বরনাথের মন্দিরটি পাথরের পীঢ়া জগমোহনসহ শিখর মন্দির, যার চার-পাশেই ছিল ঘেরা প্রাচীর সংলগ্ন বারান্দা। যদিও এ অলিন্দটি বর্তমানে ধ্বংস-প্রাপ্ত, কিন্তু পর পর নিবদ্ধ স্তম্ভের সারি সে বিশেষ স্থাপত্যটির পরিচয় আজও বহন করে চলেছে। সুতরাং দূরদূরান্তের যাত্রীরা যাতে মন্দিরচত্বরে বিশ্রামলাভ করতে পারে, সেজন্যই হয়ত এ ধরনের স্থাপত্যবিশিষ্ট মন্দির-দেবালয় নির্মাণ করা হয়েছিল। আলোচ্য এ প্রথাগত রীতির দেবালয়, যে আঞ্চলিকভাবেও প্রচলিত ছিল তার কিছু নিদর্শনও দেখা যায়। ইট বা পাথরের না হলেও, নারায়ণগড় থানার ব্রহ্মাণী দেবীর এবং পাশাপাশি সবং থানা এলাকার বেলকী গ্রামের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির দুটিও এই স্থাপত্যের অনুসারী। সুতরাং আজকের এই কুরুমবেড়ার দুর্গ আদিতে কোনদিনই সেনানিবাস বা ছাউনি হিসেবে যে নির্মিত হয়নি, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল। অর্থাৎ, অতীতে যা ছিল মন্দির সংলগ্ন যাত্রীনিবাস, তাই পরে বিজয়ী শক্তির হাত বদল হয়ে রূপান্তরিত হয় দুর্গে, পরিণতিতে মন্দির ভেঙ্গে হয় মসজিদ, আরও কত কি?

গগনেশ্বরের এই কুরুমবেড়ার প্রস্তর-স্থাপত্য সেই অতীত দিনের উত্থান-পতনের কাহিনী নিয়ে আজও এই নির্জন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের দায়িত্বে এসেও তার হৃতরূপ আজও ফিরে আসেনি। জানা গেল, বর্তমানে সর্বেক্ষণও তার কর্তব্যভার সঁপে দিয়েছেন রাজ্য পুরাতত্ত্ব অধিকারকে। সুতরাং অবিলম্বে এটির সংস্কার না হলে প্রায় পাঁচশো বছর ধরে কালের সঙ্গে লড়াই করা পশ্চিমবাংলার এই অমূল্য স্থাপত্য-কীর্তিটির বিনাশ যে অতি অবশ্যম্ভাবী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে কি এটি আদৌ সংস্কারযোগ্য হয়ে উঠবে না, বা ভ্রমণরসিকদের কাছে কি এটি কোনদিন আকর্ষণীয় হতে পারবে না, এ আক্ষেপ কি চিরদিনই থেকে যাবে ?

৩৬. জমিদারী সেলামী মাহাত্ম্য

ইংরেজ কোম্পানীর শাসনে একদা কৃষকদের কাছ থেকে জমির মালিকানা কেড়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারকে করে দেওয়া হ'ল জমির মালিক। সুতরাং ফল যা হবার তাই হ'লো। বাংলার সমাজজীবনে এই জমিদারীপ্রথা হয়ে উঠলো এক সামাজিক অভিশাপ, যার বহু নজির থেকে গেছে এমন অনেক ঘটনায় বা কাগজপত্রে অথবা সাহিত্য-নাটকের বিষয়বস্তুতে। বস্তুতঃ দীর্ঘকাল ধরেই সে অভিশাপের পীড়ন ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে বাংলার অন্নদাতা কৃষকসমাজকে।

জমিদারীপ্রথার মূল কথাই হ'লো কৃষকের কাছ থেকে খাজনা বাবত আদায়, তা সে প্রজার জমিতে ফসল হোক বা না হোক। শুধু খাজনা দিয়েই নিস্তার ছিলনা প্রজাদের। খাজনার উপরে ছিল জমিদারী নানান আবওয়াব, যার অর্থ নির্ধারিত খাজনার অতিরিক্ত দেয় কর। তদুপরি আবার দিতে হত নানাবিধ সেলামী। খাজনা বাকী পড়লে তো সুদ লাগতোই, সেইসঙ্গে জমিদারের নায়েব-গোমস্তা ও পাইক-পেয়াদাদের দিতে হত উপযুক্ত তহরি, পালপার্বণে ও পুণ্যাহে জমিদারী বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাবত দিতে হত হরেক

রকমের মাথট। এইভাবে দীর্ঘকাল ধরে শোষণের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে জমিদার শ্রেণী হয়ে উঠেছিল গ্রাম-জীবনের সর্বময় কর্তা।

জমিদারী আবওয়াব অর্থাৎ চলতি কথায় 'বাব' যে কিভাবে প্রজা-শোষণের এক ফন্দি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে সম্পর্কে আজ থেকে শতাধিক বৎসর পূর্বে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল, "প্রজারা যেরূপ মূর্খ তাহাতে তাহারা বরং পাঁচটা বাহিরের 'বাব' দিতে পারে, কিন্তু বর্ধিত কর দিতে সহজে সম্মত হয় না ; এই কারণেই এই সকল বাবের সৃষ্টি হইয়াছে। ·· এই-সকল বাব আদায় না করিলে জমিদারদিগের লাভ হয় না, কিন্তু আদায় জন্য রাজদ্বারে যাইবার উপায় নাই, সুতরাং বলপ্রয়োগ কিম্বা ভয় প্রদর্শন দ্বারা আদায় করিয়া লইতে হয়। ···অত্যাচার করিলে জমিদারের নামে অভিযোগ করিয়া কৃতকার্য হওয়া দরিদ্র প্রজাদের পক্ষে সহজ নয়, সুতরাং তাহারা সহ্য করিয়া থাকে এবং এই সুবিধা অবলম্বন করিয়া অনেক হৃদয়শূন্য জমিদার সহস্র প্রকারে প্রজাদিগকে শোষণ করিয়া থাকেন। সকল বাব যে চিরক্রমাগত তাহাও নয়, বৎসর বৎসর নতুন বাবের সৃষ্টি হয়। জমিদারের বাটীতে পূজা প্রভৃতির সকল ব্যয় অবশেষে প্রজার স্কন্দেই পড়িয়া যায়, বাস্তবিক বিষয়টী বড় জটিল। বর্তমান সময়ে যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে ত প্রজারই সমূহ কষ্ট। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারের দেয় কর চিরকালের জন্য নির্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু প্রজাদিগের দেয় করের সীমা নাই। তন্নিবন্ধন জমিদার-দিগের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে (২৪ ভাদ্র, ১২৮০)।"

জমিদারের পক্ষ থেকে বাজে আদায়ের চাপে কৃষকের অসহায় অবস্থার এই চিত্রটি 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় যথার্থভাবেই তুলে ধরা হয়েছে। তবু কৌতূহল থেকে যায় কি কি দফা এবং কারণের অজুহাতে সেসব আবওয়াব বা সেলামী আদায় করা হ'ত তা বিস্তারিতভাবে জানার জন্যে। এই ঔৎসুক্য-বশতঃ খোঁজসন্ধান করতে গিয়ে অবশেষে জমির খাজনা ছাড়া এই ধরনের জমিদারী বাজে আদায়ের এক লিখিত বিবরণ পাওয়া গেল। সুতরাং বিষয়টি সম্পর্কে যথার্থভাবে অবগত হতে হ'লে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে এ জেলার সেসময়ের মাজনামুঠা জমিদারীর দিকে। আলোচ্য এ জমিদারী কেন্দ্রটি ছিল কাঁথি থানা এলাকার কিশোরপুর গ্রামে।

সেকালের স্থানীয় ইতিহাসে এই মাজনামুঠা জমিদারীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভূস্বামী হিসাবে রাজা যাদবরাম চৌধুরীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মেদিনীপুরের

অন্যান্য কীর্তিমান ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁকে নিয়েও গুণগ্রহীরা একদা যে ছড়াটি রচনা করেছিলেন, তাতেও তিনি ব্যাখ্যাত হয়েছিলেন জেলার এক বিখ্যাত রাজা হিসাবে। ছড়াটি এই :

'দানে চন্দ্র, অন্নে মান্ন, রঙ্গে রাজনারায়ণ
বিত্তে ছকু, কীর্তে নরু, রাজা যাদবরাম।'

ছড়ায় বর্ণিত 'চন্দু' হলেন দানশীল চন্দ্রশেখর ঘোষ, অন্নদানে আপ্যায়নের জন্য বিখ্যাত 'মান্নু' অর্থাৎ পুঁয়াপাট গ্রামের মানগোবিন্দ ভঞ্জ, রাজনারায়ণ হলেন জকপুরের কানুনগো রাজনারায়ণ রায়, 'ছকু' ছিলেন মলিঘাটির বিত্তবান ছকুরাম চৌধুরী, জলামুঠা বংশের 'নরু' অর্থাৎ নরনারায়ণ চৌধুরী এবং রাজা যাদবরাম হলেন আলোচ্য মাজনামুঠার যাদবরাম চৌধুরী, যাঁর খ্যাতি ছিল দেবতা ও ব্রাহ্মণদের প্রতি নিস্কর ভূমিদানে (এই ছড়াটির বিস্তৃত বিবরণের জন্য বর্তমান লেখকের রচিত 'ছড়াপ্রবাদে গ্রাম-বাংলার সমাজ' গ্রন্থ দ্রঃ)। এহেন রাজা যাদবরাম পুণ্যশ্লোক হিসাবে চিত্রিত হলেও তাঁর জমিদারীতে জমিদারী খাজনা ছাড়া প্রজাদের যে বিভিন্ন প্রকারের সালামী ও আবওয়াব দিতে হ'ত, তার বিবরণ পড়ে আমাদের রীতিমত শিউরে উঠতে হয়। আলোচ্য এই জমিদারী থেকে ১৮১৫ সাল নাগাদ বাজে দফা বাবত যে আদায় হয়েছে তার এক বিবরণ রেখে গেছেন সে সময়ের জেলার ইংরেজ কালেক্টর বেইলী সাহেব তাঁর 'মেমোরাণ্ডা অব্ মিড্নাপোর' গ্রন্থে। তাঁর দেওয়া প্রতিবেদন থেকেই জানতে পারা যায় কতরকমের জমিদারী আবওয়াব চালু ছিলো সেসময়ে এবং কি কি খাতে সেলামী আদায় করা হ'ত প্রজাদের কাছ থেকে, যা অগ্রাহ্য করলে প্রজার ভাগ্যে জুটতো জমিদারী পাইক-বরকন্দাজের নানাবিধ নির্যাতনের উপহার।

এবার বাজেআদায় দফাগুলি সম্পর্কে আলোচনায় আসা যাক্। এ জমিদারীতে বিয়েসাদী উপলক্ষে প্রজাদের যেসব অতিরিক্ত কর দিতে হ'তো তার একটি হল 'বরপূর্বকা কন্যা সালামী'। অর্থাৎ কিনা বিয়ের পাকা দেখা শেষ হলে কন্যাপক্ষের তরফে জমিদারের হুকুম-অনুমতির জন্য এই সেলামী প্রজাদের বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হ'ত। এবার প্রজাদের পুত্র-কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য মাজনামুঠা জমিদারকে দিতে হ'ত 'বিভা তরফী' নামের আবওয়াব। এর মধ্যে মজকুরী রায়তকে দিতে হত নির্দিষ্ট এক সিক্কা টাকা এবং নানকর রায়তের বেলায় দু' সিক্কা টাকা। 'সিক্কা' টাকা অর্থে বোঝায়

বাংলায় প্রচলিত অন্যান্য স্থানের ভিন্ন ভিন্ন মানের এক টাকার মুদ্রা ছাড়াও মোগল বা পরবর্তী কোম্পানি আমলের রূপোর টাকা, যার মূল্যমান ছিল ৮০ট্রিতে এক সের ওজন। সেদিক থেকে আজকের দিনে দু' টাকা এক টাকার তেমন মূল্য হয়ত আমরা দিতে চাইনা, কিন্তু ঐ সময়ে কাছাকাছি হিজলী এলাকাতে যে টাকায় চার মণ চব্বিশ সের ধান পাওয়া যেত, সে বিষয়ে আগের প্রবন্ধ 'শতবর্ষের এক অবহেলিত জলপথ' প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। শুধু 'বিভাতরফী' বাবত জমিদারের প্রাপ্য টাকাটি আদায় দিয়ে প্রজার রেহাই নেই, এর উপরে প্রজাদের একটি করে নতুন বস্ত্রও দিতে হত জমিদারদের সম্মানার্থে। তবে কত দামের বস্ত্র দিতে হ'ত সে সম্পর্কে অবশ্য কিছু জানা যায়নি।

কায়স্থ সমাজের জাতিগত নিচু স্তরে কোন বিবাহাদি সংঘটিত হলে জমিদারকে রক্ষাকর্তা হিসাবে দিতে হ'ত 'সংগোত্র দেশ বিবাহ সালামী', যা ধার্য ছিল সাড়ে চার সিক্কা টাকা। এ ছাড়া প্রজাদের মধ্যে বিবাহ উপলক্ষে স্থানীয়-ভাবে প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানে বরের মাথায় যে চিত্রিত ছাতা ধরার রেওয়াজ ছিল, সে ছাতা ব্যবহারের অনুমতি বাবত বরপক্ষকে দিতে হ'ত 'ছাত্তা হুকুমী সালামী'। যদি অন্য জমিদারী এলাকার বর এ জমিদারীতে বাদ্যি-বাজনা করে বিয়ে করতে আসে, তাহলে জমিদারী প্রাপ্য হিসারে বরপক্ষকে দিতে হবে 'ভিঙ্গানী সালামী', যা ধার্য ছিল এক সিক্কা টাকা। তারপর বিয়ে হয়ে যাবার পর বরক'নের জোড়ে আগমন উপলক্ষে জমিদারকে দিতে হবে 'গোনো বিরাহ সালামী'। তাছাড়া যদি কোন প্রজার দু' ছেলের একই বছরে বিয়ে হয় তাহলে জমিদারের প্রাপ্য হবে 'বিভার' নামের এক স্বতন্ত্র সেলামী। এছাড়া বিয়ে-থা উপলক্ষে আছে 'অকাল বিবাহ সালামী', যা ধার্য শুভদিনে বিবাহ অনুষ্ঠিত না হয়ে অন্য সময়ে হলে জমিদারকে দিতে হ'ত। এছাড়া জমিদারী হুকুম অনুমতি না নিয়ে বিবাহাদি অনুষ্ঠিত হলে সে সব পক্ষদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল 'বেহুকুম বিবাহ' নামের সেলামী প্রদান। এসব ছাড়াও, 'ভোজন সেলামী' বাবত এক সিক্কা টাকা আদায় দিতে হত সেইসব প্রজাদের, যারা নিজ জাত ছাড়া অপর নিচু জাতের ঘরে ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতেন।

সে সময় দেখা যাচ্ছে, মাজনামুঠা জমিদারতে বিধবা বিবাহের চলন ছিল। মনে হয় গরীব নিচু জাতের প্রজাদের মধ্যে এসব বাধানিষেধ তেমন ছিল না। তবে এ ধরনের বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হ'লে জমিদারকে দিতে হত 'সাঙ্গা সালামী' বাবত এক সিক্কা টাকা। আবার যদি কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক

স্বেচ্ছায় বিবাহ বিচ্ছেদ করে, সেক্ষেত্রে তাদের জমিদারকে দিতে হ'ত নির্দিষ্ট 'স্বামীত্যাগী সালামী'।

বিয়ে-সাদী উপলক্ষে ধার্য এসব সেলামীর পর প্রজাদের নিজ নিজ সম্পত্তি রক্ষার প্রয়োজনে যেসব আবওয়াব দিতে হ'ত তার মধ্যে একটি হ'ল, 'হুকুমা সালামী', অর্থাৎ প্রজার সম্পত্তি নিয়ে কোন গোলমাল দেখা দিলে তা সালিশ-নিষ্পত্তির জন্য জমিদারকে দেয় প্রদত্ত কর। অন্যের জমি জোরপূর্বক নিজ দখলে নিলে তার দরুণ জমিদারকে দণ্ডস্বরূপ দিতে হ'ত 'সিমাপুরি সালামী'। একান্নবর্তী সংসার থেকে ভাইয়ে ভাইয়ে ভিন্ন হওয়ায় সম্পত্তি বিভাগ-বন্টনের জন্য দিতে হ'ত 'ভাই ভাটি সালামী', যার 'রেট' ধার্য ছিল এক সিক্কা টাকা হিসাবে। যদি কোন ব্যবসায়ী জমিদারী এলাকায় জলপথে নৌকো নিয়ে প্রবেশ করে তার জন্যে নির্দিষ্ট 'খেলনা নৌকা সালামী' বাবত আদায় দিতে হ'ত এক সিক্কা টাকা।

জাতপাত নিয়ে যে সব জমিদারী বিধান ছিল, সে সম্পর্কে বিয়ের অনুষ্ঠানে দেয় জমিদারী সেলামীর কথা আগেই কিছু কিছু উল্লেখ করেছি। এখন কোন প্রজা যদি জাত হারিয়ে পুনরায় স্বজাতিভুক্ত হতে চায় তার জন্যে জমিদারকে দেয় নজরানা হ'ল 'সমন্বয়ী সালামী'। এছাড়া কোন প্রজার সমুদ্রপথে মাদ্রাজ, মসলীপট্টম প্রভৃতি স্থানে গমনের, ছোট জাতের কোন ব্যক্তির সঙ্গে একই নৌকায় আরোহণের অথবা সিউনি দিয়ে সেই নৌকায় জলসেচনের জন্যে তার জাত শুদ্ধিকরণ বাবত জমিদারকে দিতে হ'ত 'জাত মাল্লা সালামী'। কোন কারণবশতঃ কুলগুরু কর্তৃক পরিত্যাজ্য হলে পুনরায় সেই প্রজার সমাজ-ভুক্তির জন্য জমিদারকে প্রদত্ত সেলামীর নাম ছিল 'গুরুত্যাগী ছোড়ন'। এছাড়া, এমন কোন নীচু জাতির বাড়িতে কাজ করা নিষিদ্ধ সত্ত্বেও যে মজুর সেখানে কাজ করার দরুণ জাতিচ্যুত হয় সেক্ষেত্রে পুনরায় স্বজাতিভুক্ত হতে হ'লে তাকে দিতে হবে 'মজুর ছোড়ন সালামী'।

সমাজে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াচার ইত্যাদির নিয়মভঙ্গের কারণে জমিদারে যেসব নজরাণা দিতে হত, তার মধ্যে একটি হ'ল 'যাত্রীত্যাগী সালামী'। এটি দিতে হ'ত প্রথাগত ক্রিয়াচারের নির্দিষ্ট দিন হ্রাস করার জন্য। অন্যদিকে অশৌচ পালনের কারণে নির্দিষ্ট দিন কমানোর জন্যে অথবা মৃতের শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে ভোজসভা অনুষ্ঠানের জন্যে দিতে হ'ত 'অশৌচত্যাগী সালামী'। এছাড়া মৎস্যজীবী পরিবারের কোন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে নাপিত

যাতে মশাল ধরার অনুমতি পায় তার হুকুম আদায়ের জন্য জমিদারকে দিতে হ'ত 'জৌলি' নামের সেলামী। সর্বোপরি সমাজে প্রচলিত শাস্ত্রসম্মত বিধির বিরুদ্ধাচরণ করলে সেই বেয়াড়া প্রজাকে অবশ্যই দিতে হ'ত 'অশাস্ত্রী' নামের সেলামী। এছাড়া কোন অবৈধ সন্তানের বিধমা মাতার পক্ষে ধোপা-নাপিতের সাহায্য পাওয়ার অথবা কোন বিধবা তার পুরুষ উপপতির সঙ্গে বনবাসের জন্য জমিদারী হুকুম আদায়ের কারণে দিতে হ'ত 'বেদো ছাড় স্যলামী'।

জমিদারীতে প্রচলিত নিয়মভঙ্গের জন্য প্রজাদের যে নজরানা দিতে হ'ত তার একটির নাম ছিল 'বাহুর মিতি সালামী'। অনুচিতভাবে কাউকে অপদস্থ করার বা ইচ্ছাপূর্বকভাবে কোন অনুষ্ঠানে অতিথির যোগদানে বাধা দেওয়া বা চলে যেতে বাধা করার দরুণ এই সেলামী দিতে হ'ত। তাছাড়া জমিদারের বিনা হুকুম-অনুমতিতে যে রজক ও নাপিত অপরের কোন আনুষ্ঠানিক কাজে অংশগ্রহণ করে অথবা অসদাচরণের জন্য যিনি নির্দিষ্ট পেশাগত কাজ করা থেকে অধিকারচ্যুত হন, সেক্ষেত্রে জমিদারে 'বেহুকুমী সালামী' আদায় দিলেই সমস্যার সমাধান। কোন প্রজার খামারে ধান ঝাড়ার সময় সেই ধান কেউ মাড়িয়ে গেলে তাদের নিস্তার পেতে হলে জরিমানা হিসেবে দিতে হ'ত 'খামার মাড়া সালামী'।

এত সত্ত্বেও জমিদারীতে প্রচলিত ছিল 'আক্কেল সালামী', যেকথা আমরা প্রায়ই কথায় কথায় উচ্চারণ করে থাকি। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ কারণে মাজনামুঠা জমিদারীর প্রজাদের দণ্ডস্বরূপ সত্যিই এ সেলামী দিতেই হত, যা শুধু কথার কথা ছিল না। পিতা বা ব্রাহ্মণকে কটু কথা বলার বা মারধোর করার অপরাধে, বা কোন ব্যক্তির নামে মিথ্যে বদনাম রটনার দায়ে, অথবা নীচজাতির কোন ব্যক্তির সঙ্গে কলহ বা দাঙ্গা করার অপরাধে, কিংবা কোন কারণ ছাড়াই জমির পরিবর্তন ঘটানোর দায়ে প্রজাদের দণ্ডস্বরূপ জমিদারকে দিতে হত এই 'আক্কেল সালামী'।

সেকালে জমিদারীতে 'বারবণিতা' বসানোর যে রেওয়াজ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'কোসবিয়ান ছাড় সালামী' থেকে। গণিকাবৃত্তি গ্রহণের পূর্বেই জমিদারী সেরেস্তা থেকে অনুমতি গ্রহণের জন্য হবু বারবধূদের অবশ্যই দিতে হ'ত এই নামের নজরানা। এবার এই বৃত্তি গ্রহণ বাবত সেসব বারাঙ্গনাদের বাৎসরিক কর আদায় দিতে হ'ত তার নাম ছিল 'কোসবিয়ান কুড়ারী'। অন্যদিকে নর্তকী ধরনের গণিকাদের মধ্যে কেউ যদি তার পুরুষ পরিচারক-

ভৃত্যের সঙ্গে সহবাস করে অথবা কোন গণিকা যদি মুসলমানী ঈদ পর্বে কোন আগন্তুকের কাছে দেহদান করে, তার জন্য জমিদারকে দিতে হবে দণ্ডস্বরূপ 'বেহুকুমী সালামী'।

তবে এখানেই শেষ নয়। মাজনামুঠা জমিদারীর আরও অনেক বাজে আদায়ের ফিরিস্তি দেওয়া যেতে পারে। এ জমিদারীতে কোন অনুষ্ঠান বা পূজাপার্বণ উপলক্ষে যেমন প্রজাদের কাছ থেকে নানাবিধ সেলামী আদায়ের প্রথা ছিল, তেমনি বিভিন্ন পেশায়রত প্রজাদের রুজিরোজগার বাবতও দিতে হ'ত বাধ্যতামূলক কর। যেমন নববর্ষে বিভিন্ন ব্যক্তি ও জমিদারী আমলাদের অবশ্যই দিতে হত 'শুনিয়া সালামী' ও 'শুনিয়া কুরচা' নামের কর। 'দশহরা' উপলক্ষে নির্দিষ্ট ছিল 'দশেরা সালামী'। সেই সঙ্গে ভাদ্র মাসে কোন বিশেষ পর্ব উপলক্ষে প্রজাদের দিতে হ'ত 'ভাদুই মাগন'। জমিদার মহোদয়ের স্নান-পর্ব উপলক্ষে প্রজার দেয় ছিল 'অভিষেক সালামী'। আবার শীতকালে বিভিন্ন জমিদারী এলাকায় প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের জন্য যে শীতবস্ত্রের প্রয়োজন হ'ত তার দায় মেটাবার জন্য, প্রজাদের আদায় দিতে হ'ত 'রাজশিস্তোরী' নামের সেলামী।

পালপার্বণ ছাড়া বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত প্রজাদের উপর চাপানো ছিল নানা ধরনের সেলামীর বোঝা। গ্রামের প্রধান মোড়লদের দিতে হ'ত 'প্রামাণিক সালামী'। মুদিখানা দোকানদারদের কাছ থেকে 'দোকান মাগন' বাবত সেলামী আদায় ছাড়া, ব্যক্তিগত ব্যবসায়, অর্থাৎ মহাজনী বা সুদে টাকা খাটানোয় নিযুক্ত ব্যবসায়ীদের দিতে হ'ত 'হুজুর পান্না' সেলামী। জমিদারী কাজে নিযুক্ত পাইকদের প্রত্যেককে দিতে হ'ত এক আনা হিসেবে 'পাইকান আনী' সেলামী এবং জমিদারী পরিচারক বা ভৃত্যদের মধ্যে যারা নিষ্কর জমি ভোগ করতেন তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল 'নোকীরান দুআনি সালামী', যা ধার্য হ'ত বিঘেভূঁই দু'আনা হিসেবে। হাত পাল্লায় মাপা পণ্যদ্রব্যের ওজনদার হিসারে জমিদার যাকে মনোনীত করতেন তার কারণে তাঁকে 'কয়াল সালামী' দেওয়া ছাড়াও, পরে ওজনদার হিসাবে কর্মরত থাকাকালে তাকে দিতে হ'ত 'ঘাটকয়ালী সালামী'। জমিদারের নিজস্ব গোমস্তাদের বেলায় ধার্য ছিল 'থানা গোমস্তা সালামী'; জমিদারীতে বসবাসকারী পাল্কী বা ডুলি বাহকদের দিতে হ'ত 'বেহারা সালামী' এবং জমিদারীতে বসবাসের দরুণ সমাজের নীচু-

তলার অধঃপতিতদের জন্য বরাদ্দ ছিল 'খাদাল বাহমিন সালামী' নামের অতিরিক্ত কর।

মাজনামুঠা জমিদারের বাজে আদায়ের এখানেই অবশ্য শেষ নয়। প্রজাদের মধ্যে কৃষির উদ্দেশ্যে যারা নির্দিষ্ট খাজনায় জমি বন্দোবস্ত নিয়েছেন তাদের দিতে হ'ত 'বাজে ইজারাদারী সালামী'; নদীর ঘাট ব্যবহারের জন্য প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করা হ'ত 'ঘাট সালামী'; পুকুর বা দিঘিতে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে জাল ফেললে জমিদারের প্রাপ্য হিসেবে দিতে হ'ত 'দিঘি সালামী'; জমিদারী এলাকার ফেরিঘাট থেকে আদায় করা হ'ত 'খেয়ারো' নামের সেলামী। বিশেষ করে সেখানকার জমিদারী এলাকায় মির্জাপুর খালে ফেরি বাবত আদায়ের নাম ছিল 'খাল মির্জাপুর সালামী'। এছাড়া সেসময়ে জমিদারী এলাকায় দেশীপ্রথায় নোনাজল জাল দিয়ে নুন তৈরীর কেন্দ্রকে বলা হ'ত নিমক খালাড়ি এবং এই ধরনের খালাড়ি পিছু জমিদারী প্রাপ্য হিসাবে দিতে হ'ত 'নিমক চিয়ানী সালামী' বাবত ছ' আনা। দুধ সরবরাহকারী এবং অন্যান্য শাকসব্জী উৎপাদনকারীকে দিতে হ'ত 'দুধশাগ সালামী'; মাছ ধরার জন্য যে মৎস্যজীবী পাঁচকুটিয়া নামের জাল ব্যবহার করে তাকে আদায় দিতে হ'ত 'পাঁচকুটিয়া সালামী'। জমিদারীতে প্রজারা চাষ করবে মোটা ধান, কিন্তু মিহি ধান চাষের বেলায় চাষীকে দিতে হবে 'মিহি চাল' বাবত সেলামী। জমিদারের নিজ জোতে চাষ আবাদের জন্য সেই চাষীকে দিতে হ'ত 'গ্রাম নিজ জোত' নামের সেলামী এবং চাষীর উৎপন্ন ফসল ধান কাটার সময় প্রতি ধানের আঁটি পিছু এক হালা ধান-খড় প্রাপ্য ছিল জমিদারের, যা আদায় হ'ত 'হালা মাগনি সালামী' নামে।

মাজনামুঠা জমিদারীর 'বাজে দফা' বাবত আদায় তালিকার এখানেই শেষ। এ নিয়ে অধিক মন্তব্যও নিষ্প্রয়োজন। এরপর জমিদারী শাসন নিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। এই শতকের তিন দশক নাগাদ, ইংরেজ শাসকরা যে 'ল্যাণ্ড রেভেনিউ কমিশন' বসিয়ে ছিলেন, তাতেও জেলার জমিদাররা এসব আবওয়াব-মাথট আদায়ের কথা একেবারেই স্বীকার করেননি। যদিও জেলার আর এক বিদেশী জমিদার 'মেসার্স মিডনাপোর জমিনদারী কোম্পানি' ঐ কমিশনের কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, এই ধরনের বাজে আদায় প্রচলিত ছিল বটে, তবে কোম্পানি বরাবরই প্রজাদের নোটিশ দিয়ে এসব আদায় দিতে নিষেধ করে এসেছে [দ্রঃ 'দি ল্যাণ্ড রেভেনিউ কমিশন, বেঙ্গল (ভল্যুম ফোর),

১৯৪০']। যদিও সাহেব জমিদার কোম্পানি মোটেই সত্য কথাটি কবুল করেননি। কেননা কোম্পানির রাজশাহী, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের জমিদারী থেকে এইভাবে যে জোরজুলুম করে আবওয়াব আদায় করা হয়েছে, তার বিবরণ রেখে গেছেন সোমেশ্বরপ্রসাদ চৌধুরী, তাঁর ''নীলকর বিদ্রোহ' পুস্তকে। যাই হোক, শেষ অবধি বিদেশী শাসনে সে সময়ে জেলার জমিদাররা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে শত-সহস্র ওকালতি করলেও, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে জমিদারী প্রথার অবসান ঘটেছে। কিন্তু থেকে গেছে সেদিনের জমিদারী শাসনে গরীব খেটে খাওয়া প্রজার জীবনযন্ত্রণার এই দলিলটি, যার বৃত্তান্ত আমাদের একান্তই মর্মস্পর্শী করে তোলে।

৩৭. জেলার ঐতিহাসিক কৃষক সম্মেলন

জমিদারী শাসন ও শোষণের এক জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত আগের নিবন্ধে তুলে ধরেছি। বেশ বোঝা যায়, গ্রামের অবহেলিত কৃষকসমাজ কিভাবে দীর্ঘদিন ধরে নিপীড়িত হয়েছে বিদেশী শাসনপুষ্ট এই জমিদারী প্রভুত্বে। অবশেষে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক সমাজের মধ্যেও দাবী উঠতে থাকে জমিদারী শোষণ বন্ধ হোক, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হোক। দিকে দিকে কৃষক সমাজের মধ্যে তারই প্রস্তুতি চলতে থাকে।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় এ জেলায় যেসব গণতান্ত্রিক আন্দোলন স্থরু হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯২১-২২ সালে ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলন এবং পরবর্তী ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলন, যা সেসময়ে ব্রিটিশ শাসকদের রীতিমত আতঙ্কিত করে তুলেছিল। মেদিনীপুরের মত জেলার পুব অংশে হুগলী জেলার আরামবাগেও জমিদার ও মহাজন বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ১৯২১ সাল থেকে দানা বাঁধতে স্থরু করে। সেই সঙ্গে জেলায় জেলায় সংগঠিত হয় কৃষকদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে কৃষকসভা। ফলে পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত হয় এইসব কৃষকসভার সম্মেলন। ১৯৩৩ সালে ঘাটালের হরিশপুর গ্রামেও সেসময়ের স্থানীয় কৃষক আন্দোলনের উৎসাহী কর্মীদের উদ্যোগে এক কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যার বিবরণ আজ স্মৃতিপটে

ম্লান হয়ে এসেছে। কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার মধ্যেও বিস্তারিতভাবে এ সম্মেলনের তেমন কোন উল্লেখ নেই। অথচ এ সম্মেলনটি ছিল প্রায় বিশ হাজার কৃষক সমাবেশে কৃষকসভা গঠনের ও জমিদারী উচ্ছেদের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা আবদুল্লাহ রসুল তাঁর 'কৃষক সভার ইতিহাস' গ্রন্থে ১৯২৫ সালের বগুড়ায় এবং ১৯২৬ সালের কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত কৃষক সম্মেলনের উল্লেখ প্রসঙ্গে শুধুমাত্র লিখেছেন যে, 'মেদিনীপুর জেলার দাসপুর অঞ্চলে (ঘাটাল মহকুমা) এক কৃষক সম্মেলন হয় (পৃঃ ৫১)।' সে সম্মেলনের কোন বিস্তারিত বিবরণ এ থেকে অবশ্য জানা যায় না।

উল্লেখযোগ্য যে, এ সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধি হিসাবে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন বর্তমানের বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা সরোজ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু তিনিও তাঁর লেখা 'ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ও আমরা' গ্রন্থে ঘাটালের এ ঐতিহাসিক সম্মেলনটির সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেন নি। সে সময়ের কৃষক সম্মেলন সম্পর্কে প্রসঙ্গত লিখেছেন, ...'মেদিনীপুর ও ময়মনসিংহ জেলাতেও কৃষক সম্মেলনের প্রচেষ্টা হয়েছিল তবে সেখানে সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়নি। এই দুটি জেলায় আব্দুল হালিম যাঁদের সাহায্য নিয়েছিলেন তারা হলেন যথাক্রমে স্বদেশরঞ্জন দাস ও ডাঃ জ্যোতিষ ঘোষ এবং আলতাব আলি ও মনি সিংহ (পৃঃ ৭২)।'

দেখা যাচ্ছে, ১৯৩৩ সালে ঘাটালে অনুষ্ঠিত এই কৃষক সম্মেলনটির কথা সমসাময়িক কৃষক আন্দোলনের দুই নেতার লিখিত ইতিহাস ও স্মৃতিকথায় স্থান পায়নি। বহুদিনের কথা বিস্মরণের ফলেই কি এটি অনুল্লেখিত থেকে গেছে, অথবা সম্মেলনের নেতৃত্ব যাঁদের হাতে ছিল তাঁরা ভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় এই অনীহার কারণ কিনা কে জানে?

সেজন্য ঘাটালের এই সম্মেলনটি সম্পর্কে সেসময়ের বিভিন্ন সংবাদপত্রে যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি উদ্ধার ও নথিবদ্ধ করে রাখার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ঘাটালের এই সম্মেলন উপলক্ষে লিখিত যেসব তথ্য পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রথম হ'ল সম্মেলন সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি। সে বিজ্ঞাপিত নিবেদনটি নিম্নরূপ:

'প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন। আগামী ৫ই চৈত্র রবিবার মেদিনীপুর জিলার

ঘাটাল সহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের ৫ম বাৎসরিক অধিবেশন হইবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, মৌলনা আলি আহমেদ ইসলামবাদী, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার সরকার, মৌলবী আফতাবউদ্দীন চৌধুরী, বাংলার নমঃশূদ্র নেতা শ্রীযুক্ত গুরুচরণ ঠাকুর প্রমুখাৎ বহু নেতা ও কর্মীগণ সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবেন।

সম্মেলনে আলোচ্য প্রস্তাবগুলি ১৬ই তারিখের মধ্যে কৃষকসভার সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

সকলে দলে দলে সম্মেলনে যোগ দিন এবং এই ঘোর দুর্দ্দিনে বাংলার কৃষককে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিবার উপায় নির্ধারণে সহায়তা করুন— ইহাই বিনীত অনুরোধ। বাংলার বিভিন্ন জেলার কৃষক সমিতিগুলি হইতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। প্রতিনিধি ফিঃ চারি আনা, দর্শক ফিঃ দুই আনা, আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা বিনামূল্যে করা হইবে। সরোজকুমার মিত্র, সম্পাদক কৃষক সভা, স্বদেশরঞ্জন দাস, অভ্যর্থনা সমিতি, ঘাটাল' [বঙ্গবাণী ১৫.৩.৩৩]।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত এ বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার্থে সেসময় বিভিন্ন জেলায় যেসব নেতা ও কর্মীরা অগ্রণী হয়েছিলেন তাদের পরিচয়। তাছাড়া ঐ সময়ে প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা' নামের একটি সংগঠনের পক্ষে যে তার পঞ্চম বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সেটিও এই প্রসঙ্গে অবগত হওয়া যায়।

এছাড়া সম্মেলন উপলক্ষে ১৯৩৩ সালের বিভিন্ন সংবাদপত্রে যেসব বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তার সংক্ষিপ্তসার হ'ল, ১৮ই ও ১৯শে মার্চ, ১৯৩৩ তারিখে নিখিলবঙ্গ কৃষক সম্মিলনীর অধিবেশন হয়েছিল বর্তমান ঘাটাল শহরের পুবে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বে রূপনারায়ণ তীরবর্তী হরিশপুর গ্রামে। সম্মেলনের সাধারণ প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রায় ত্রিশহাজার কৃষকের যোগদান থেকেই বোঝা যায় আঞ্চলিক কর্মী ও উদ্যোক্তারা এই সম্মেলনকে সফল করে তোলার জন্য অত্যন্ত সচেষ্ট ছিলেন। সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে যে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় তা থেকেই সে সময়ের কৃষক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। প্রতিবেদনটি হুবহু নিম্নরূপ :

"...সম্মেলনে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধি, কৃষককর্মী ও কৃষক উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিনে ও পরদিন সকালবেলায় বহুক্ষণ ধরিয়া বিষয় নির্বাচন সমিতিতে সম্মেলনের প্রস্তাবসমূহ ভালভাবে আলোচিত হইয়াছিল। পরদিন বেলা তিনটায় সময় সাধারণ অধিবেশন আরম্ভ হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বদেশরঞ্জন দাস প্রায় বিশ হাজার চাষীর বিপুল সভায় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি দীর্ঘ অভিভাষণে মোটামুটি বলেন—'বাঙ্গলার চাষীর আজ নানাদিক দিয়া দুর্দিন আসিয়াছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক অবনতির হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে চাষীদের কৃষি ব্যবসায় বৈজ্ঞানিক উপায়সমূহ প্রয়োগ করিয়া, প্রাচীন প্রথায় কৃষিকার্য বন্ধ করিয়া, কৃষক সম্প্রদায়ের ক্ষতিজনক জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করিয়া চাষীদের ন্যায্য অধিকার আদায় করিতে হইবে। রোগ, শোক, জরা মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য সমবায় প্রণালীতে কৃষিকার্য চালাইবার ও আর্থিক স্বচ্ছলতা আনিবার ব্যবসা চাষিদিগকে স্বয়ং করিতে হইবে। এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া চাষীদের প্রকৃত পথ দেখাইবার জন্য ও বঙ্গের বিভিন্ন জেলার কৃষকদের একতাবদ্ধ হইয়া কার্য করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছি। সকলে আমাদের উদ্দেশ্যকে সফল করিয়া তুলুন।'

পরে অভ্যর্থনা সমিতি কর্তৃক নির্বাচিত সভাপতি শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় অনুপস্থিত থাকায় স্থানীয় কৃষক শ্রীভুজঙ্গভূষণ বাগ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তারপর কয়েকজন কৃষক কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থন করিলে সেগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কতকগুলি প্রস্তাবের মর্ম নিম্নে দেওয়া হইল :—(১) শস্যমূল্য হ্রাসের অনুপাতে খাজনা শতকরা ৬০ ভাগ কমাইতে হইবে। (২) আর্থিক দুর্গতির জন্য আসল ও সুদের টাকা মহাজনদের হ্রাস করিয়া দিতে হইবে। (৩) সুদ প্রথা তুলিয়া দেওয়া উচিত, অন্তত হার কমাইয়া শতকরা ৬ টাকা করিতে হইবে। (৪) পূর্বে চৌকিদারদের যেমন জমিবিলি ব্যবস্থা ছিল সেই ব্যবস্থার পুনঃপ্রণয়ন করিয়া চৌকিদারী ট্যাক্স উঠাইয়া দিতে হইবে। (৫) জমিদার ও নায়েবদের বেআইনী আদায় (শুহুরী মাথট ইত্যাদি) বন্ধ করিবার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। (৬) যে জমিতে উৎপাদন নাই তাহার খাজনা মকুব করিতে হইবে। (৭) বাকী খাজনার নালিশ বন্ধ করিতে হইবে। (৮) জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট) উঠাইয়া দিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

এই প্রস্তাবগুলি উত্থাপন ও সমর্থন করিতে উঠিয়া হীরালাল পাত্র ও আরো অনেক চাষী বক্তৃতা করেন।

সমস্ত প্রস্তাবগুলিকে সমর্থন করিতে উঠিয়া হেমন্তকুমার সরকার চাষীদিগকে কৃষক সমিতির ভিতর দিয়া কিরূপ লড়িতে হইবে সরলভাবে বুঝাইয়া দেন। পরে বর্ধমান জেলা কৃষক সমিতির প্রতিনিধি রমেন্দ্রসুন্দর চৌধুরী চাষীদের সংগ্রামে তাঁহাদের একমাত্র সাহায্যকারী সংগ্রামশীল মজুরশ্রেণীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিবার ও স্বাধীনতাযুদ্ধে মজুর ও চাষীর মিলন স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব আনেন। সরোজ মুখার্জি এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। পরে হীরালাল দে মীরাট মামলায় ভারতের চাষীমজুরদের পূর্ণ ও প্রকৃত স্বাধীনতাকামী নেতাদের কারাদণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ ও তাঁহাদের অবিলম্বে বিনাসর্তে মুক্তির দাবী করিয়া এই প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে উঠিয়া শ্রমিক নেতা অবনী চৌধুরী একটি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন ও চাষীদের প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য নিজেদের সকলপ্রকার স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য বর্তমান প্রতিষ্ঠান হইতে পৃথকভাবে কৃষক সমিতির ভিতর দিয়া লড়িতে বলেন।

তারপর স্বদেশরঞ্জন দাস একটি প্রস্তাব করেন, তাহাতে তিনি বলেন, বঙ্গদেশে কৃষকদের মধ্যে কার্য করিবার সুবিধার জন্য বিভিন্ন জেলা কৃষক সমিতির সমবায়ে চাষীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সকলপ্রকার উন্নতির জন্য কৃষকদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে একটি বঙ্গীয় কৃষকসভা গঠন করা হউক। এই সভাটি ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন আইন অনুযায়ী রেজেষ্ট্রী করা হউক। পরে তিনি এই প্রস্তাবের অঙ্গ হিসাবে এই নবগঠিত কৃষকসভার কি কি নিয়ম ও উদ্দেশ্য হইবে তাহাও পাঠ করেন। সরোজ মুখার্জি এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

হেমন্তকুমার সরকার সমর্থন করিতে উঠিয়া সভার উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। এই প্রস্তাবটি সকলে সমর্থন করেন ও ইহা গৃহীত হয়। সরোজকুমার মিত্র, হেমন্তকুমার সরকার প্রমুখ যাঁহারা বঙ্গদেশে কৃষক আন্দোলন চালাইবার জন্য কলিকাতায় একটি অস্থায়ী বঙ্গীয় কৃষকসভা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সমস্ত জেলা কৃষক সমিতিদের লইয়া এই প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য করিতে ইচ্ছুক হন ও ইহাতে পরিচালক হিসাবে যোগ দেন। এই

প্রস্তাবেই এই বৎসরের জন্য এ সভার কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয় ও রেজেষ্টারী করার ভার হেমন্ত সরকারকে দেওয়া হয়।" [বঙ্গবাণী, ২৩.৩.১৯৩৩]

সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, সম্মেলনটি সফল করার পূর্বোক্ত আবেদনে আহ্বায়ক হিসাবে উল্লিখিত 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের' নাম পরিবর্তিত হয়েছে 'নিখিলবঙ্গ কৃষক সম্মিলনী' এই নামে। নাম পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। অন্যদিকে সম্মেলনে যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'য়েছিল তা যে একান্তই সময়োপযোগী ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কৃষকসমাজের বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে বৃহত্তর এক আন্দোলনে শামিল হওয়ার যে আহ্বান জানানো হয়েছিল তা শুধুমাত্র কৃষকের স্বার্থ সংরক্ষণের অনুকূলেই ছিল না, অন্যদিকে সেটি ছিল শোষক মহাজন, নায়েব ও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষক ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ আন্দোলনের পক্ষে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এছাড়া সমসাময়িক কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন অন্যতম। যদিও তিনি আলোচ্য এ সম্মেলনে পূর্ব ঘোষণা সত্ত্বেও যোগদান করতে পারেনি, তাহলেও পরবর্তী সময়ে জেলায় জেলায় যেসব কৃষক সম্মেলন হ'য়েছিল তার উদ্যোক্তা হিসাবে অধিকাংশ সম্মেলনেই তিনি যোগদান করেছেন। বলতে গেলে, সে সময় কৃষক সংগঠন গড়ার কাজে এবং যুবক ও ছাত্র সমাজের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচারে তিনি ছিলেন একান্তই প্রেরণাস্বরূপ। প্রসঙ্গত অভ্যর্থনা সমিতির নির্বাচিত সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবী অতুলচন্দ্র গুপ্তেরও সম্মেলনে যোগদানের কথা ঘোষিত হলেও তিনি অনুপস্থিত থাকেন বটে, তবে তিনি ও হেমন্তকুমার সরকার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যে কৃষক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন সে সম্পর্কে সরোজ মুখোপাধ্যায় রচিত পূর্বোক্ত স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে, ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত কৃষক-শ্রমিক দলে ছিলেন ডঃ ভূপেন দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, হেমন্তকুমার সরকার প্রমুখ। ১৯৩২ সালে অবশ্য এই কৃষক-শ্রমিক দল উঠে যায় এবং পরিবর্তে যে ওয়াকার্স পার্টি অফ্ ইণ্ডিয়া গঠিত হয় সেই পার্টির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন কুতুবুউদ্দীন আহমদ, আইন-জীবী অতুল গুপ্ত, সাহিত্যিক ডঃ নরেশ সেনগুপ্ত ও হেমন্ত সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ঘাটাল সম্মেলনের স্থানীয় উদ্যোক্তা হিসাবে স্বদেশরঞ্জন দাসের নাম উল্লিখিত হয়েছে। তিনি ছিলেন তদানীন্তন ঘাটাল মহকুমা কংগ্রেসের

সভাপতি মোহিনীমোহন দাসের (উকিল) পুত্র এবং প্রথমদিকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকলেও পরে তিনি কৃষক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন ও সেইসঙ্গে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্যপদ অর্জন করেন। অবশ্য তিনি শেষদিকে বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়পন্থীদের দলে যোগদান করেন এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জীবন ও দর্শন নিয়ে বাংলায় একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করে খ্যাত হন।

এছাড়া সম্মেলন সম্পর্কে প্রকাশিত প্রতিবেদনে আর যে দু'জন আঞ্চলিক কৃষককর্মীর নাম পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে ভুজঙ্গভূষণ বাগ সম্পর্কে কিছু জানা না গেলেও স্থানীয় কৃষককর্মী হীরালাল পাত্র সম্পর্কে অনুসন্ধানে জানা যায়, তিনি ছিলেন কাছাকাছি বন্দর গ্রামের অধিবাসী এবং রায়পন্থীদের দলভুক্ত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৩০-৩৩ সালে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে রায়পন্থী সংগঠনেরও যে অস্তিত্ব ছিল, সে বিষয়ে আবদুল্লাহ রসুল পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থে লিখেছেন যে, 'এই সমস্ত প্রগতিশীল ও বামপন্থী পার্টি ও ব্যক্তি ছাড়া সে সময় ছিল আর এক পার্টি, যা সাধারণত রায়বাদী পার্টি—এন. এম. রায়ের অনুগামী পার্টি ব'লে পরিচিত ছিল' (পৃষ্ঠা ৫৪)।

সম্মেলনে অন্যান্য যোগদানকারীদের মধ্যে রমেন্দ্রসুন্দর চৌধুরী, সরোজ মুখোপাধ্যায় ও অবনী চৌধুরীর তদানীন্তন রাজনৈতিক সক্রিয়তা সম্পর্কে পূর্বোক্ত 'ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ও আমরা' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে। বর্ধমান জেলা কৃষক সমিতির প্রতিনিধি রমেন্দ্রসুন্দর চৌধুরী ছিলেন ১৯৩১ সালে গঠিত বর্ধমান জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদক এবং ব্যক্তিগতভাবে সে সময়ের বর্ধমানের বিখ্যাত কৃষক নেতা বিনয় চৌধুরীর (বর্তমানে বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার সুযোগ্য মন্ত্রী) মধ্যম ভ্রাতা। বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা ও বর্তমানে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির (মার্কসবাদী) সম্পাদক সরোজ মুখোপাপাধ্যায় সে সময়ে ছিলেন বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র এবং প্রথমদিকে তিনি বর্ধমানে কৃষক সমিতির সংগঠন করার কাজে যুক্ত থাকলেও পরে রেলশ্রমিক ও ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দীমুক্তি প্রস্তাবের সমর্থক অবনী চৌধুরী ছিলেন সে সময়ে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম দিকের সভ্য, ট্রেড ইউনিয়ন তথা মোটর ট্রান্সপোর্ট ওয়াকার্স ইউনিয়নের সংগঠক ও ১৯৩২ সালে প্রকাশিত 'মার্কসবাদী' পত্রিকার সম্পাদক এবং ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন বিনয় চৌধুরীর পিসতুতো ভাই।

আক্ষেপের কথা, সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই রিপোর্ট থেকে আমরা শেষ অবধি জানতে পারলাম না, ঐ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নবগঠিত বঙ্গীয় কৃষকসভার কার্যনির্বাহক সদস্যদের নাম। লক্ষ্য করার বিষয়, আলোচ্য সম্মেলনটি সফল করে তোলার বিষয়ে স্থানীয়ভাবে স্বদেশরঞ্জন দাস অগ্রণী হলেও সে সময়ে ঘাটালের আর এক বিশিষ্ট জননেতা ডাঃ জ্যোতিষ ঘোষের নাম সম্মেলনের রিপোর্টে উল্লিখিত হয়নি। যদিও পূর্বোক্ত 'ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ও আমরা' গ্রন্থে লেখক মেদিনীপুরে কৃষক সম্মেলনের উদ্যোক্তা হিসাবে স্বদেশবাবুর সঙ্গে জ্যোতিষবাবুর নামও উল্লেখ করেছিলেন। এ বিষয়ে বলা যেতে পারে, জোতিষবাবু সে সময়ে ছিলেন ঘাটাল মহকুমা কংগ্রেসের সম্পাদক এবং তিরিশ সালে দাসপুর থানার রূপনারায়ণ তীরবর্তী শ্যামগঞ্জে লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে কারাবরণ করেছিলেন। সেজন্য ঐ সময় তিনি এই সম্মেলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না বটে তবে পরবর্তী সময়ে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং পার্টির প্রার্থী হিসাবে এম. এল. এ.ও নির্বাচিত হন। যাই হোক, কৃষকসভা সংগঠনের ইতিহাসে মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের হরিশপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত ১৯৩৩ সালের এই কৃষক সম্মেলন যে পরবর্তী আন্দোলনের পদক্ষেপ রচনার সহায়ক হিসাবে নামাঙ্কিত হয়ে থাকবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৩৮. সূর্যের সংসার

জেলার গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরতে ঘুরতে এখানে ওখানে বেশ কিছু পাথর-খোদাই মূর্তি পড়ে থাকতে দেখা যায়। এসব মূর্তির মধ্যে কালো কষ্টিপাথর ও সবুজ আভাযুক্ত মুগনী পাথরের তৈরি প্রতিকৃতি যেমন দেখা যায়, তেমনি আবার বাদামী রঙের ঝামাপাথরের মূর্তিও রয়েছে। তবে শেষোক্ত ধরনের মূর্তিটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার জন্য পঙ্খ-পলস্তারার প্রলেপ দিয়ে যে রূপবৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা হ'ত, তেমন প্রমাণ বিদ্যমান। কিন্তু সে যাই হোক্, এসব মূর্তির মধ্যে এমন বেশ কিছু মূর্তি স্থান পেয়েছে গাছতলায়, কোথাও

বা কাছাকাছি কোন মন্দির-দেবালয়ে। তবে সেসব মূর্তি যেখানেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, তখন সে দেবতার আসল পরিচয় হারিয়ে যায় সেখানকার মানুষ-জনের কাছে ; পরিবর্তে তাদের পছন্দ অনুযায়ী সে দেবতার নতুন করে নাম-করণে বিভূষিত করা হয়। তাই কোন জৈন দিগম্বরমূর্তি গ্রামবাসীর কাছে হয়ে যায় ষষ্ঠিমূর্তি, আবার কোথাও কোন বিষ্ণুমূর্তি পরিণত হয় পঞ্চানন্দ দেবতায়।

এ জেলায় পাথরের এহেন যেসব মূর্তি আপাততঃ নজরে পড়েছে, সেগুলির অধিকাংশই মনে হয় পাল-সেন আমলের। মূর্তির গড়ন ও ভাস্কর্যশৈলী দেখে অনুমান, এসব মূর্তি মূল বিগ্রহ হিসাবে স্ব স্ব উপাসকদের নির্মিত কোন পাকা-পোক্ত মন্দিরে একদা পূজিত হ'ত। পরে নানা কারণে মন্দির ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু মূর্তিগুলি কোনরকমে ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে গেছে। পাথরের মূর্তি বলে তাই আজ জঙ্গল পরিষ্কার করার বা মাটি খোঁড়ার সময় সেগুলিকে পাওয়া যাচ্ছে। এইভাবে নানাস্থান থেকে যেসব মূর্তি পাওয়া গেছে তা থেকে মেদিনীপুর জেলায় বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসকদের আধ্যাত্মিক চিন্তার চিত্রটি মোটামুটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

তবে এসব মূর্তি-ভাস্কর্যের মধ্যে এ জেলায় সৌর-সম্প্রদায়ের উপাসিত যেসব সপ্তাশ্ববাহিত সূর্যমূর্তি পাওয়া গেছে তা বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং এ বিষয়ে নতুন করে আলোচনার অপেক্ষা রাখে। ভবিষ্যতে মূর্তিবিদ্যা গবেষকরা জেলার আদিত্য উপাসনার ঐতিহ্য সম্পর্কে সহজেই যাতে অবহিত হতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে সেসব সূর্যমূর্তির বর্তমান অবস্থানগত গ্রামের একটা তালিকা দেওয়া গেল ; যথা, আমনপুর, গঙ্গাদাসপুর, বেহারাসাই, সিঙ্কা, অনন্তপুর প্রভৃতি।

সূর্য যে রোগবিনাশক দেবতা এমন লৌকিক বিশ্বাস ছাড়াও সূর্যমূর্তিতে উৎকীর্ণ লিপিতে যে এ ধারণার সমর্থন পাওয়া যায় তার প্রমাণ, পশ্চিম-দিনাজপুর জেলার বৈরহাটা গ্রামের এক সূর্যমূর্তির পাদপীঠে নিবদ্ধ লিপি, যাতে খোদিত হয়েছে 'সমস্ত রোগানাং হর্তা'। অধিকাংশ সূর্যমূর্তিই দেখা যায় 'বা-রিলিফ' অর্থাৎ নতোন্নত পদ্ধতিতে খোদাই এবং সে দেবতা দণ্ডায়মান অবস্থায় দু'হাতে ধরে আছেন ডাঁটাসহ প্রস্ফুটিত পদ্মফুল। মূল মূর্তির দুপাশে রয়েছে দণ্ডী ও পিঙ্গল নামে দুই অনুচর অথবা কোথাও আবার একই সঙ্গে রয়েছে অন্ধকার বিনাশকারী ধনুর্ধারী দুই দেবী উষা ও প্রত্যুষের মূর্তি।

মূর্তির পদতলে সাত ঘোড়ার রথ চালনারত অরুণ, কখনও বা তিনি উপবিষ্ট আবার কখনও দণ্ডায়মান অবস্থায়।

সাধারণতঃ সূর্যের এই প্রথাগত দণ্ডায়মান রীতির বিগ্রহ ছাড়া উপবিষ্ট আর এক ধরনের সূর্যমূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে এ জেলার মাটিতে, যা পশ্চিম-বাংলায় দুর্লভ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এর আগে এই আকৃতির সূর্যমূর্তি যে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বৈরহাটা (থানাঃ কুশমণ্ডি) এবং পশ্চিমবাংলার সীমান্ত সংলগ্ন ময়ূরভঞ্জে পাওয়া গেছে, সে সম্পর্কে বিশিষ্ট মূর্তিতত্ত্ববিদ জিতেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখা 'দি ডেভেল্যাপমেন্ট অফ্ হিন্দু আইকোনোগ্রাফি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অতএব এ যাবৎকাল আমরা উপবিষ্ট রীতির ঐ দুই সূর্যমূর্তির কথাই জানি। তবে ওড়িশা সীমান্ত লাগোয়া পশ্চিমবাংলার দাঁতন থানার রাণীপুর গ্রামের এক গ্রাম্য দেবদেবীর থানে বহুবিধ ভগ্নমূর্তির সমাবেশে এই রীতির এক উপবিষ্ট সূর্যমূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। বলা যেতে পারে, উত্তরবঙ্গের পর দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় প্রথম এই বিরল সূর্য-মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেল। এখন যে এলাকায় এই অমূল্য মূর্তিটি পাওয়া গেল সেটি যে এককালের 'দণ্ডভুক্তি' তেমন অনুমান কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়। কারণ প্রাচীন দাঁতনকে কেন্দ্র করে সংলগ্ন ময়ূরভঞ্জসহ এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়েই একদা গঠিত হয়েছিল প্রাচীনকালের সেই দণ্ডভুক্তি। সেজন্যই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, প্রাচীন এই বিভাগের মধ্যেই আমরা ময়ূরভঞ্জ এলাকায় যে রীতির সূর্যোপাসনার মূর্তি দেখি, তারই হুবহু আকৃতি দেখা যায় দক্ষিণ-পশ্চিমবাংলার এই সীমান্ত অঞ্চলে। অন্যদিকে ময়ূরভঞ্জ তথা জেলার এই দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে যে এক সময়ে আদিত্য উপাসনা প্রাধান্যলাভ করেছিল, তা এইসব এলাকায় প্রাপ্ত সূর্যমূর্তিগুলির অস্তিত্বই তার প্রমাণ।

আলোচ্য রাণীপুর গ্রামের সূর্যমূর্তিটি প্রস্ফুটিত সনাল পদ্ম হাতে পদ্মাসনে উপবিষ্ট বটে, তবে ময়ূরভঞ্জের খিচিং-এর উপবিষ্ট সূর্যমূর্তিটির মত পাদপীঠে উৎকীর্ণ সপ্তাশ্ব বা সারথি অরুণের কোন ভাস্কর্য এ মূর্তির পাদপীঠে লক্ষ্য করা যায় না। এখানকার এ মূর্তিটির মাথায় কিরিট মুকুট, কানে কুণ্ডল, গলায় কণ্ঠাভরণ, বেশভূষায় উদীচ্যবেশ ও মুখমণ্ডলে প্রশান্তি। সর্বোপরি এ মূর্তিটির আর এক বৈশিষ্ট্য হল, পিছনের প্রভামণ্ডলে উৎকীর্ণ হয়েছে প্রজ্জ্বলিত এক অগ্নিশিখা। সেদিক থেকে মেদিনীপুরের এই উপবিষ্ট সূর্যমূর্তিটির বেশ গুরুত্ব

রয়েছে। ভাস্কর্যশৈলী দেখে অনুমান করা যায়, এটি খ্রীষ্টীয় দশ-এগারো শতকে নির্মিত হয়ে থাকবে।

এ জেলায় এই গুরুত্বপূর্ণ উপবিষ্ট সূর্যমূর্তির আবিষ্কার যেমন মূর্তি-ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন, তেমনি তাঁর পুত্র রেবন্তের যোগদানও বেশ চমকপ্রদ। সূর্যের চার পুত্রের মধ্যে রেবন্ত অন্যতম এবং এই রেবন্তের মূর্তি-ভাস্কর্য বাংলায় বেশ বিরল বলা চলে। ১৯৩৬ সালে অবিভক্ত বাংলার দিনাজপুর জেলায় পরিভ্রমণকালে অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতী ইটাহারের কাছে সোনাপুর গ্রামে দশম শতকের এমন এক রেবন্তমূর্তির সন্ধান পেয়েছিলেন বলে রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় উল্লেখ করেছিলেন। সেখানে সে মূর্তিটির বর্ণনায় দেখা যায়, এক সজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে আসীন রেবন্ত যার পিছনে আর এক ছত্রধারীর মূর্তি এবং তার সঙ্গে নানাবিধ অস্ত্রে সজ্জিত চার অনুচরের প্রতিকৃতি। পুব বাংলায় (বর্তমানে বাংলাদেশ) ঢাকা মিউজিয়মে যে একটিমাত্র রেবন্ত মূর্তি সংগৃহীত হয়েছে সেটিও পূর্বোক্ত মূর্তিটির অনুরূপ অশ্বারোহী আকৃতি।

সম্প্রতি এই জেলার নানাস্থানে অনুসন্ধানকালে পাওয়া গেল এমন দুটি পৃথক বৈশিষ্ট্যযুক্ত রেবন্তমূর্তি, যার যথার্থ বর্ণনা পাওয়া যায় ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ গ্রন্থে। প্রথম ধরনের মূর্তিটির সন্ধান পাওয়া যায়, এ জেলার দাঁতন থানার কাকড়াজিৎ গ্রামে। সেখানে প্রাচীন এক দিঘির দক্ষিণপুব কোণের এক গাছতলায় রাখা নানাবিধ ভগ্নমূর্তির মধ্যে যে দুর্লভ রেবন্ত মূর্তিটির সন্ধান পাই, তা প্রথম দর্শনে আমাকে বিস্ময়াবিষ্ট করে তোলে। এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ মূর্তি পশ্চিমবাংলার আর কোথাও পাওয়া গেছে বলে জানা যায় না। ভারতের অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত রেবন্তমূর্তির যে আলোকচিত্র বিভিন্ন মূর্তিতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে দেখেছি সেগুলির সঙ্গেও এর মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

সেজন্য প্রথম দর্শনে এই অভিনব মূর্তিটিকে সূর্যের মূর্তি বলেই সনাক্ত করেছিলাম। কারণ সূর্যমূর্তির ভাস্কর্য অলংকরণে আরোপিত যাবতীয় লক্ষণ এ মূর্তিতে পরিস্ফুট, কেবলমাত্র তফাৎ এই যে, বিগ্রহটি অশ্বপৃষ্ঠে আসীন। সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ জাগে, তবে কি এটি রেবন্তের মূর্তি? অবশেষে আমার এ অনুসন্ধিৎসু প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল, বিখ্যাত পুরাণগ্রন্থ 'বিষ্ণুধর্মোত্তরম'-এ। রেবন্তমূর্তির সম্পর্কে সে গ্রন্থে বলা হয়েছে প্রভু রেবন্তের মূর্তি হবে সূর্যের মতই এবং তা হবে ঘোটকপৃষ্ঠে আসীন। অন্যত্র কালিকাপুরাণেও বলা হয়েছে,

সূর্যপূজায় যেমত অনুষ্ঠান হয় সেভাবেই হবে রেবন্তের অর্চনা, যা হবে ঘটে অথবা মূর্তিতে। শাস্ত্রগ্রন্থের এসব ভাষ্য অনুযায়ী অবশেষে আমার ভ্রম নিরসন হয় এবং এটিকে তখন সূর্যপুত্র রেবন্তের মূর্তি বলেই সনাক্ত করতে পারি।

এবার এ মূর্তিটির বর্ণনায় আসা যাক। মূর্তিটি কালো পাথরে 'বা-রিলিফ' অর্থাৎ নতোন্নত পদ্ধতিতে খোদাই। ত্রিরথ পাদপীঠের উপর অশ্বপৃষ্ঠে আসীন রেবন্ত, সূর্যের মতই দু'হাতে প্রস্ফুটিত সনাল পদ্ম। যদিও অশ্বের সম্মুখ-ভাগ বিধ্বস্ত, তাহলেও অবশিষ্ট অংশের ভাস্কর্য-খোদাই দেখে ঘোড়াটির অবয়ব সম্পর্কে বোধগম্য হতে অসুবিধা হয় না। সূর্যের মতই এ মূর্তির পাশে দুই বামনাকৃতি অনুচর, সম্ভবতঃ দণ্ডী ও পিঙ্গল। মূর্তির পৃষ্ঠপটের উপরিভাগে ধার ঘেঁসে কীর্তিমুখ ভাস্কর্যের দু'পাশে উৎকীর্ণ হয়েছে শূন্যে সঞ্চরণশীল বিদ্যাধর কিন্নর ও মালা হাতে গন্ধর্বের মূর্তি। মূল মূর্তির মাথার উপর ত্রিপত্রাকৃতি চৈত্য গবাক্ষের আকৃতিযুক্ত খিলানের অলংকরণ, যা ওড়িশার মূর্তির পটবিন্যাসের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। পাদপীঠের দুধারে উৎকীর্ণ দুটি মূর্তির মধ্যে এক-জনের হাতে তরবারি এবং অন্যজনের হাতে ঢাল। বাংলাদেশের রাজশাহী মিউজিয়মে সংরক্ষিত এমন একটি রেবন্ত মূর্তির পাদপীঠে অন্যান্য মূর্তির সঙ্গে যে ঢাল-তলোয়ারধারীর মূর্তিও উৎকীর্ণ, সে সম্পর্কে জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থটিতেও উল্লেখ করেছেন। মোট কথা, আলোচ্য এ রেবন্ত মূর্তিটির অশ্বপৃষ্ঠে আসীন ছাড়া, সবটাই সূর্যমূর্তির আদলে নির্মিত। মূর্তির মাথায় কিরীট মুকুট, দুই কানে দুটি ভারি কর্ণাভরণ এবং কটিদেশ অপেক্ষা-কৃত ক্ষীণ। তবে মুখমণ্ডলটি ক্ষয়িত হওয়ায় সেটির কমনীয়তা সম্পর্কে কোন ধারণা করা যায় না। বেশ বোঝা যায়, মূর্তিটি এখানে কোন এক ঝামা-পাথরের শিখররীতির মন্দিরে মূল বিগ্রহ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার নিদর্শন মূর্তির আশেপাশে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে ভগ্ন আমলকশিলা ও শিখর মন্দিরের অঙ্গভূষণে ব্যবহৃত লম্ফমান সিংহের মূর্তি। মূর্তিটির ভাস্কর্যশৈলী দেখে অনুমান, এটি খ্রীষ্টীয় দশ-এগারো শতকে নির্মিত হয়ে থাকবে। তাই বলা যেতে পারে, এই ধরনের বিচিত্র মূর্তিটি বাংলা ভাস্কর্য জগতে বিরল বললেও অত্যুক্তি হয় না।

রেবন্তের এই রীতির মূর্তি ছাড়া, অশ্বপৃষ্ঠে আসীন দ্বিতীয় আর এক বিশিষ্ট মূর্তির দর্শন পাওয়া গেল এ জেলার নয়াগ্রাম থানার এলাকাধীন দোলগ্রামে। সেখানকার স্থানীয় দোলগ্রাম বালকেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ের চত্বরে বর্তমানে

আলোচ্য এ মূর্তিটি রাখা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে জানা যায়, পাথরের অশ্বারোহী এ মূর্তিটি কাছাকাছি মাঠ থেকে খোঁড়াখুড়ির ফলে আবিষ্কৃত হয়। শুধু এ মূর্তিটি নয়, অনুরূপ আর একটি ঘোটকপৃষ্ঠে আসীন মূর্তিও ঐ সঙ্গে পাওয়া যায়, তবে সে মূর্তির মস্তকটি এবং তৎসহ অশ্বের মুখাবয়বটিও মূল মূর্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিখোঁজ। মূর্তিটির এই ভাঙ্গাচোরা অবস্থার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনাগ্রহের কারণে নয়াগ্রামের বীণাপাণি গ্রন্থাগারের কর্মীরা অবশেষে তাদের গ্রন্থাগারে এটি সংরক্ষণের জন্য নিয়ে যান। পরে অবশ্য স্থানীয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিযুক্ত মুণ্ডটির সন্ধান পেয়ে সেটিকে সংগ্রহ করেন। কিন্তু দুঃখের কথা, বর্তমানে এ বিদ্যালয় নির্মাণে ব্যবহৃত জমানো সিমেন্ট গুঁড়ো করার সাধিত্র হিসাবে সেটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

দোলগ্রামের বিদ্যালয়টি যে স্থানটিতে অবস্থিত সেখানেও বেশ কিছু প্রাচীনত্বের নিদর্শন বর্তমান। বিদ্যালয় এলাকার গোটা চত্বরটির চতুর্দিকে এক সময়ে ঝামাপাথরের চওড়া দেওয়াল দিয়ে যে ঘেরা ছিল তার অবশেষ এখনও লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে উত্তর দিকের সে প্রশস্ত পাথরের দেওয়াল আজও বর্তমান। পূর্বতন সে প্রাচীন দেওয়ালে ব্যবহৃত পাথরগুলি খুলে এনে নতুন করে বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণের কাজে লাগানো হয়েছে। সেইসঙ্গে বেশ কিছু পাথরের খণ্ডাংশ ও আমলক শিলার অংশও ইতস্ততঃ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। অনুমান করা যায়, ঘেরা প্রাকারযুক্ত এই স্থানে হয়ত কোনকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এক প্রাচীন মন্দির, যেখানে মূল বিগ্রহ হিসাবে স্থাপিত হয়েছিল পূর্বোক্ত ঐ দুটি অশ্বারোহী মূর্তি।

বিদ্যালয় চত্বরে রক্ষিত এ মূর্তিটির ভাস্কর্যবৈশিষ্ট্য একান্তই লক্ষণীয়। পূর্বোক্ত কাঁকড়াজিৎ গ্রামের মূর্তিটি খোদাই প্রথাগত অন্যান্য প্রাচীন মূর্তির মত 'বা-রিলিফে' হলেও এ মূর্তিটির তক্ষণ কাজে বেশ অভিনবত্ব দেখা যায়। অর্থাৎ এ মূর্তিটি কেবলমাত্র স্বল্প গভীরে খোদাই না হয়ে ত্রিমাত্রিক পদ্ধতিতে উৎকীর্ণ। সবুজ আভাযুক্ত এক নিরেট পাথর থেকে খোদাই করা এ মূর্তিটি এক সুসজ্জিত লম্ফমান অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট এবং সে ঘোড়ার পিছনের পা দুটি এক সপ্তরথ পাদপীঠের উপর স্থাপিত। মূর্তির অবশ্য খালি গা, কিন্তু পরণের বস্ত্র মালকোঁচা দিয়ে পরা এবং কোমরের একদিকে নিবদ্ধ তরবারির খাপ ও তীর রাখার তূণীর, অন্যদিকে খাপসহ ছুরিকা। মূর্তির ছুঁচালো দাঁড়ি, মাথার লম্বা চুল মেয়েদের মত খোঁপা বাঁধা এবং সেটিকে ধরে রাখার জন্য কপালের সঙ্গে

একটি পটি বাঁধা। হাত দুটি কাঁধের কাছ থেকে ভগ্ন বলে বোঝা যায় না মূর্তির দু'হাতে কি প্রতীক ছিল। তবে অনুমান করা যায়, সম্ভবতঃ একহাতে ছিল লাগাম এবং অন্যহাতে চাবুক। বীরত্বব্যঞ্জক এ মূর্তিটি যে একান্তই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভাস্কর্য বিচারে এ মূর্তিটি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় এগার-বার শতকের বলেই মনে হয়।

পূর্বে আলোচিত রেবন্ত মূর্তির বর্ণনা থেকে জানা গেছে, শাস্ত্রীয় পুরাণ অনুসারে সূর্যমূর্তির মতই নির্মিত হয়েছে রেবন্ত মূর্তি। কিন্তু অশ্বপৃষ্ঠে আসীন এ মূর্তিটিতে তো সূর্যমূর্তির কোন লক্ষণ উপস্থিত নেই। যদিও 'অগ্নিপুরাণ' মতে রেবন্ত হবেন একজন অশ্বারোহী, তাহলেও এ মূর্তিটিকে রেবন্ত মূর্তি বলে সনাক্ত করায় অসুবিধে দেখা যায়। তবে সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় আর এক শাস্ত্রগ্রন্থে। 'কালিকাপুরাণে' রেবন্ত মূর্তির যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। সে পুরাণ গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী নগরের বহির্দ্বারে স্থাপিত হবে সাদা ঘোটকপৃষ্ঠে আসীন নানাবিধ অস্ত্র শোভিত, দুই বলিষ্ঠ বাহুযুক্ত রেবন্তের মূর্তি। তার মাথার চুলগুলি হবে কবরীদ্বারা সংযত, অথবা তা ঢাকা থাকবে কোন পাগড়ি দিয়ে; এছাড়া মূর্তির বাঁ হাতে থাকবে একটি চাবুক, ডানহাতে তরবারি এবং সূর্যপূজায় পালনীয় বিধির মতই হবে তার পূজার্চনা।

অতএব কালিকাপুরাণের বর্ণনামত এ মূর্তিটিকে রেবন্ত বলে সনাক্ত করতে কোন অসুবিধা হয় না। এ মূর্তিটির হাত দুটো অক্ষত থাকলে কালিকাপুরাণের ভাষ্য অনুযায়ী মূর্তির হস্তধৃত নিদর্শনগুলির সঙ্গে হয়ত মিল খুঁজে পাওয়া যেত। অন্যদিকে দোলগ্রামে আর যে একটি অশ্বারোহী মূর্তি পাওয়া গেছে সেটির খণ্ডিত মস্তকটির ভাস্কর্য পূর্বোক্ত মূর্তির মস্তকের মত নয়। পাথরের এ মুণ্ডটিতে কবরী নেই, সাধারণ বাবরি চুল এবং সূঁচালো দাড়ির পরিবর্তে গালপাট্টা দাড়ি। তাহলে এটিও কি রেবন্তের মূর্তি? বরাহমিহির রচিত 'বৃহৎসংহিতা'য় বলা হয়েছে, শিকারযাত্রায় সঙ্গীসাথীদের নিয়ে সহগমনরত অশ্বপৃষ্ঠে আসীন মূর্তিই হবে রেবন্তের কল্পমূর্তি। তাই যদি হয় তাহলে এটি কি রেবন্তের কোন সহযোগীর মূর্তি? অবশ্য এ প্রশ্নের মীমাংসা করা খুবই কঠিন। কেননা অন্যস্থানে প্রাপ্ত রেবন্তমূর্তির মত একই সঙ্গে তার সহযোগিদের মূর্তি উৎকীর্ণ করা হয়নি, বরং এখানে পৃথক পৃথক দুটি অশ্বারোহী মূর্তি, যা বিভিন্ন পুরাণগ্রন্থ অনুযায়ী বিচার বিবেচনায় রেবন্ত মূর্তির দ্যোতক।

অন্যদিকে রেবন্ত উপাসনা ও ফলপ্রাপ্তি সম্পর্কে 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে' উল্লিখিত হয়েছে যে, রেবন্তের দেহ হবে বর্ম আবৃত, তরবারি ও তীরসহ ধনুক থাকবে তার হাতে। এছাড়া তিনি হবেন বনের ভিতর অগ্নিকাণ্ড নিবারণের, শত্রু ও ডাকাত নিধনের এবং সর্বপ্রকারের গুরুতর বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার দেবতা, যার উপাসনায় স্বাস্থ্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, গরিমা ও বুদ্ধিমত্ততা বৃদ্ধি পায়।

আলোচ্য এ দু'টি মূর্তি সেদিক থেকে মনে হয় বন্যসমাজের সংরক্ষক হিসাবে দোলগ্রামের মত বনাঞ্চলে কোন ভূস্বামী কর্তৃক নির্মিত আবাসবাটীর বর্হিদ্বারে এক প্রাকারবেষ্টিত স্থানে একদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কালের প্রভাবে সে স্থাপত্যপ্রাকার কবেই বিনষ্ট হয়েছে, কিন্তু কোনক্রমে এখানকার বিগ্রহ দুটি উদ্ধার পেয়েছে বলেই এই অনুমানের স্বপক্ষে এ ধরনের চিন্তাভাবনা করার যুক্তি রয়েছে। জঙ্গলপূর্ণ স্থানে অনুরূপ রেবন্ত পূজার নিদর্শন সম্পর্কে সন্ধান দিয়েছেন মনোমোহন গাঙ্গুলী তাঁর লেখা 'ওড়িশ্যা এ্যাণ্ড হার রিমেনস্' গ্রন্থে। সেখানেও তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আসীন সে মূর্তিটিকে রেবন্ত বলেই উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, ওড়িশার পুব লাগোয়া মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত জঙ্গলমহল এলাকায় একদা সূর্য ও তার পুত্র রেবন্তের আরাধনা যে প্রসার লাভ করেছিল, তার স্বপক্ষে এই অনাবিষ্কৃত মূর্তিগুলিই এক জাজ্বল্য প্রমাণ।

৩৯. বিলুপ্ত পথের রূপরেখা

'পথের সন্ধানে' শীর্ষক অধ্যায়ে জেলার বহু পুরাতন রাস্তাঘাটের কথা আলোচনা করেছি। সরজমিনে ঘুরে বেড়িয়ে যেসব অব্যবহার্য ও বিধ্বস্ত রাস্তা দেখেছি তারই অনুমানমূলক এক বিবরণ সে নিবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু দু' তিনশো বছরের পুরাতন সাহেবদের তৈরী মানচিত্রে এ জেলায় যেসব রাস্তাঘাট দেখানো হয়েছে সেগুলির বহুক্ষেত্রে আজ অস্তিত্ব না থাকলেও সেকালে জেলার প্রাচীন জনপদ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রগুলি গড়ে ওঠার

পিছনে যে ঐসব পথগুলির এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তা বেশ বোঝা যায়। সেজন্য জেলার এই প্রাচীন পথঘাট সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলার জন্যে কিছুটা বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। বিদেশীদের তৈরী মানচিত্রে সে সময়ের রাস্তাঘাটের নকশায় যেসব স্থাননাম উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলির ইংরেজি ভাবাপন্ন উচ্চারণ বিকৃতির দরুণ বর্তমান স্থাননামের সঙ্গে সাযুজ্য না থাকায় স্থানগুলির সনাক্তকরণে বেশ অসুবিধে আছে। ঐতিহাসিক ও গবেষকগণও বিদেশীদের মানচিত্রে দর্শিত এ জেলার সেসব স্থানগুলির পরিচিতি ও নির্দেশকরণেও তেমন উৎসাহ দেখাননি। জেলার আঞ্চলিক ইতিহাস রচয়িতারা এমন দু'একটি সাবেকী মানচিত্র অনুসরণে যেসব নকশা প্রণয়ন করেছেন সেগুলি শুধু বিকৃত ধরনেরই নয়, উপরন্তু সেগুলিতে প্রধান ও পরিচিত স্থাননাম ছাড়া অন্যান্য স্থানগুলিকে সনাক্ত করার অসুবিধের কারণে সেগুলির ইংরেজি ভাবাপন্ন নামগুলিকে যথাযথ বহাল রেখে পাঠক সমাজকে অন্ধকারের দিকেই ঠেলে দিয়েছেন। ফলে ঐসব গবেষকদের লেখায় সাতপাটি নামটি হয়েছে শতপথি এবং জাহানপুর হয়েছে জানপুর, যা ইংরেজী বিকৃত নাম। অথচ যাঁরা ঘুরে বেড়িয়ে জেলার সব রাস্তাঘাট ও অলিঘলির সন্ধান রাখেন, তাদের কাছে এসব বিকৃত স্থাননামের সনাক্তকরণে তেমন কোন অসুবিধের কথা নয় বলেই আমরা জানি।

সামান্য একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে। এ জেলার চুয়াড় বিদ্রোহ সম্পর্কে বেশ কিছু ছোটবড় পুস্তক ও প্রবন্ধমালা রচিত হয়েছে। এ বিষয়ের অধিকাংশ লেখকই বিদেশীদের প্রতিবেদনমত এবং পুরাতন নথি-পত্রের নিরিখে এই বিদ্রোহটির পটভূমিকায় সে সময়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে করে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তাঁদের লেখায় উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু সে সময় এই লড়াইয়ের রণকৌশলের দিক থেকে পক্ষে বা বিপক্ষে পথের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল সে বিষয়ে তাঁদের লেখায় কোন উচ্চবাচ্য নেই। অবশ্য এই না থাকার কারণটাও স্পষ্ট। কারণ সে সময়ে এই সাবেকী পথের হদিশ করতে না পারায় বা পুরাতন মানচিত্রে দর্শিত বিকৃত ইংরেজিয়ানা নামগুলির সনাক্তকরণে অসুবিধে হওয়ায় যে এই নীরবতা তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

সুতরাং পুরাতন মানচিত্রের পথগুলি ও পথিপার্শ্বের গ্রাম-জনপদগুলি সম্পর্কে সাধারণ পাঠকদের একটা স্পষ্ট ধারণা দেওয়ার জন্যই এই নিবন্ধের অবতারণা।

সেজন্য যেসব স্থাননাম বিদেশীদের মানচিত্র থেকে সনাক্ত করা গেছে সেগুলির সঙ্গে সে মানচিত্রে বর্ণিত ইংরেজি নামটিও বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হল। বলা বাহুল্য, পুরাতন সে সব বহু পথই আজ বিলুপ্ত ; কোথাও বা অতীতের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ প্রাচীন গাছপালাসহ বাঁধ রাস্তার অস্তিত্ব রয়েছে, আবার কোথাও বা নতুন কোন পথ সে পুরাতন পথকে গ্রাস করে ক্রমে স্ফীত হয়েছে।

বিদেশীদের রচিত যেসব মানচিত্রে এ জেলার পরিচয় স্পষ্টরূপে বিধৃত হয়েছে, তার মধ্যে একটি হ'ল ওলন্দাজ গভর্ণর ফান্‌-ড্রেন-ব্রোকের ১৬৬০ সালের মানচিত্র। এ মানচিত্রটি প্রাচীন হলে কি হবে, সেটিতে যেসব স্থান নির্দেশ করা হয়েছে তা কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে মিলতে চায় না। তাহলেও সে মানচিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে, বর্ধমান থেকে সোজা দক্ষিণে একটি পথ চলে এসেছে মেদিনীপুর **(Medinapoer)** হয়ে নারায়ণগড়ের **(Nareinger)** উপর দিয়ে দাঁতনে **(Danthon)**। অনুমান করা যায়, এটিই সেই বাদশাহী সড়ক, যা 'হুসেন শাহে'র আমলে গৌড় থেকে সপ্তগ্রাম হয়ে ওড়িশা পর্যন্ত নতুন করে নির্মিত হয়েছিল। মানচিত্রে মেদিনীপুরের কাছাকাছি 'গিডেঙ্কটিকেন' **(Gedenk-teeken)** নামে যে স্থানটি নির্দেশ করা হয়েছে, তা সনাক্তকরণে বেশ অসুবিধে হলেও, এ স্থানটির সামান্য উপরে 'বরদা'র উল্লেখ থাকায় অনুমান করা যায় এটি বর্তমান ঘাটালেরই ওলন্দাজী বিকৃত রূপ। তাছাড়া ঘাটালে একটি ওলন্দাজদের রেশমকুঠিও ছিল, সে সম্পর্কে আমার রচিত 'পশ্চিমবাংলার পুরা-সম্পদ : উত্তর মেদিনীপুর' গ্রন্থে আলোচনা করেছি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এ মানচিত্রটির স্থানমামে কোন সঙ্গতি নেই। ম্যাপে দর্শিত এক নদীর পশ্চিম তীরে মেদিনীপুরের অবস্থিতি দেখানো হয়েছে, যা নির্ভুল নয়। রূপনারায়ণের সঙ্গে হুগলী নদের যেখানে সঙ্গম হয়েছে, হাওড়া জেলার সে স্থানটির নাম একদা মাকড়াপাথর হওয়ায় বিদেশীরা রূপনারায়ণকে পাথরঘাটা নদী নামেই চিহ্নিত করতো। সেই হিসেবে ফান-ড্রেন ব্রোকের মানচিত্রে এটি হয়েছে পাত্রঘাটা নদী **(Patragatta Riv.)**। মেদিনীপুরটি যেখানে দেখানো হয়েছে তার প্রায় সামান্য পুবে যে সব স্থানের নাম উল্লিখিত হয়েছে তা আমার সনাক্তমতে, বরদা **(Barda)**; উত্তরে উদয়গঞ্জ **(Oedagyns)**, খানাকুল **(Carnacoal)** ও জাহানাবাদ **(Sjanabath)**। চন্দ্রকোণাকে **(Sjander-cona)** দেখানো হয়েছে মেদিনীপুরের উত্তরপশ্চিমে নদীতীরবর্তী এক ভিন্ন স্থানে। এছাড়া এ মানচিত্রে আর যেসব স্থান দেখানো হয়েছে তার মধ্যে

নারায়ণগড়ের সামান্য দক্ষিণপশ্চিমে কেশিয়াড়ী (**Casseiri**), পাথরঘাটা (রূপনারায়ণ) নদের তীরে তমলুক (**Tamboli**), তার দক্ষিণে বাঁশজা (**Bansja** ; এটি সনাক্ত করা যায়নি), কাঁথি (**Kindua**) প্রভৃতি। মানচিত্রে দর্শিত এ স্থানগুলির অবস্থানে অসঙ্গতি দেখা গেলেও একটি বিষয় বেশ ভাল-ভাবেই উপলব্ধি করা যায় যে, সতের শতকে মেদিনীপুর জেলার এসব স্থানগুলি একসময়ে শিল্পসম্পদে, বিশেষ করে বস্ত্রশিল্পে প্রসিদ্ধি অর্জন করে বিদেশীদের যে ব্যবসা-বাণিজ্যে আকৃষ্ট করেছিল, তারই ফলশ্রুতিতে এ স্থানগুলি উল্লিখিত হয়েছে।

এরপর ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জি. হার্কলটস নামে ইংরেজ সাহেবের তৈরী একটি ম্যাপে মেদিনীপুর জেলার যেসব পথঘাট দর্শিত হয়েছে তা সংক্ষিপ্ত হলেও পরবর্তী রেনেল সাহেবের কৃত ম্যাপের সঙ্গে বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। তবে আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ জেলা সম্পর্কিত অন্য যেসব মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল তার মধ্যে নির্ভরযোগ্য হল, ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জেমস রেনেল অঙ্কিত ৭নং নক্সায় **'The Provinces of Bengal, Situated on the West of the Hoogly River'** শিরোনামের মানচিত্র। সে মানচিত্রে প্রায় দু'শো বছর আগে এ জেলার প্রাচীন রাস্তাঘাট, নদীনালা ও স্থাননাম সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে। বলা যেতে পারে, ইংরেজ শাসন ঐ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও এ ম্যাপে দর্শিত পথঘাটগুলি বিদেশীদের তো নয়ই, বরং এগুলি পাঠান ও মোগল আমলে ব্যবহৃত ছোট বড় রাস্তা। হিন্দু-যুগের প্রাচীন জাঙ্গালগুলি অবলম্বন করে এবং সেটিকেই বাড়িয়ে-বুড়িয়ে গৌড়ের বাদশাহরা নানা দিকে যে পথ তৈরী করেছিলেন, তার পিছনের উদ্দেশ্য ছিল মূলতঃ সৈন্যচালনা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার। পরবর্তী রেনেল সাহেব তাঁর ঐ মানচিত্রে সেইসব পুরাতন পথই দেখিয়েছেন যেগুলির বহুলাংশই আজ অবলুপ্ত। পরে অবশ্য ইংরেজ আমলে শাসন কাজের সুবিধের জন্য সে পুরাতন রাস্তাগুলি বাদ দিয়ে সুবিধেমত বহু রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয়েছে যার সাক্ষ্য আজও রয়ে গেছে জেলার নানা পথঘাটের মধ্যে। সুতরাং রেনেলের মানচিত্রে প্রদর্শিত রাস্তা এবং তার পার্শ্ববর্তী স্থানগুলির নাম সনাক্ত করে একটি বিবরণ দিলে সে সময়ে জেলার ভৌগোলিক চিত্রটি যেমন সহজবোধ্য হয়, তেমনি জানা যায় এ জেলায় মুসলমান শাসন বিস্তারে এবং বাণিজ্যিক যোগাযোগের প্রয়োজনে এসব পথঘাটের ভূমিকা সম্পর্কে এক বিস্তৃত

রূপরেখা। তাই এই নিরস আলোচনাটি যাতে সহজভাবে উপলব্ধি করা যায় সেজন্য সেসব প্রাচীন পথগুলিকে ২১টি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

১. গোপালনগর-মেদিনীপুর-নারায়ণগড়-জলেশ্বর রাজপথ :

রেনেল সাহেবের মানচিত্রের নকশায় জোড়া রেখা দিয়ে এ রাস্তাটিকে দেখানো হয়েছে যাতে বেশ বোঝা যায়, এটি এক সময়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ এক রাজপথ ছিল। কলকাতার পশ্চিমে হুগলী-ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী হাওড়া জেলার থানা মাকুয়ার কাছ থেকে এটি স্থরু হয়ে সাঁকরেল ও বড়গাছিয়া হয়ে আমতার উপর দিয়ে মানকুরের কাছে রূপনারায়ণ পার হয়ে মেদিনীপুর জেলার গোপালনগর (Gopalnagur) পর্যন্ত প্রসারিত। তারপর সেখান থেকে সোজা পশ্চিমে এসেছে বর্তমানে পাঁশকুড়া থানায় খন্যাডিহি (Couneadee) হয়ে পাঁচবেড়্যা (Pansbarya), যা আজকের উত্তর পাঁচবেড়্যা মৌজা। এরপর এখান থেকে ডেবরা থানার নবাবগঞ্জ (Nabobgunge) হয়ে পশ্চিমে গোলগ্রাম (Goal-gong) এসে পৌঁছেছে। সেখান থেকে পশ্চিমে কাঁসাইয়ের যে শাখা উত্তর-বাহিনী তা পেরিয়ে রাস্তাটি কেশপুর থানার কাপাসটিকরি (Caipastagry) এসে দক্ষিণপশ্চিমে বাগরোই (Bagroi) হয়ে দোগাছির (Dogoichy) উপর দিয়ে অলিগঞ্জ (Allygunge) হয়ে মেদিনীপুর (Midnapour) পৌঁছেছে। তারপর মেদিনীপুর হয়ে এই রাজপথটি দক্ষিণে খড়্গপুরের (Currackpour) উপর দিয়ে মাদারচক (Mudarchoky) হয়ে মকরামপুর (Mokerampour) পৌঁছে দক্ষিণে চলে এসেছে নারায়ণগড় (Narangur), এরপর দক্ষিণে বাখরাবাদ (Buckerabad), খটনগর (Cautnagar), রাণীসরাই (Rannyserai) হয়ে দাঁতনের (Dantoun) উপর দিয়ে চলে গেছে দক্ষিণপশ্চিমে জলেশ্বর (Jellasore) ও বস্তার (Bustar) হয়ে বালেশ্বর।

রেনেলের এ মানচিত্রে জোড়া রেখা দিয়ে দেখানোর জন্য রাস্তাটি বিশেষ করে মোগল-পাঠান আমলে যে গুরুত্বপূর্ণ পথ ছিল, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, ওড়িশার সঙ্গে ক'লকাতার যোগাযোগের এটি ছিল সেসময়ের এক প্রধান সড়ক। কিন্তু শুধু কি যোগাযোগের উদ্দেশ্যই এই রাস্তাটিকে এমন বৃহৎ আকারে দেখানো হয়েছে—এ প্রশ্ন থেকে যায়। সেই সঙ্গে অবশ্য অনুধাবন করা যায়, এ রাজপথটি সেসময়ে যেসব এলাকার উপর দিয়ে প্রসারিত হয়েছে, আসলে সেসব স্থানগুলি ছিল রেশমবস্ত্র উৎপাদনের

জন্য বিখ্যাত। এক কথায় বলা যেতে পারে এটি ছিল সে-সময়ের রেশম পথ, অর্থাৎ 'সিল্ক রুট'। দেখা যাচ্ছে, জেলার অন্যান্য বিখ্যাত রেশমবস্ত্র উৎপাদনের স্থানগুলির সঙ্গে নানান পথঘাট দিয়ে এ রাজপথের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছে। আর এই পথ দিয়েই সূতী ও রেশমজাত বস্ত্র একদা আমদানি হয়েছে হুগলী-ভাগীরথীর অপর পারে কলকাতায়, অর্থাৎ কলকাতার বাজারকে যোগান দেবার জন্যেই যেন এই পথের সৃষ্টি। তাই যদি হয়, তাহলে এই পথের অস্তিত্বই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ইংরেজরা ক'লকাতাকে সৃষ্টি করেনি, বরং সেকালের কলকাতায় নানাবিধ বস্ত্রশিল্পের রমরমা ব্যবসা-বাণিজ্যের লোভে সাহেবরাই শেষ পর্যন্ত এর মাটি কামড়ে পড়ে থাকে, আর বণিকের মানদণ্ড যখন শেষ অবধি রাজদণ্ডে পরিণত হয় তখন তারাই কলকাতার সৃষ্টিকর্তা বলে নিজেদের জাহির করতে কসুর করে না।

সরজমিনে তদন্ত করে দেখা গেছে, গোপালনগর থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত এ রাস্তাটির তেমন অস্তিত্ব আজ আর খুঁজে পাওয়া যায়না বটে, তবে এখন মেদিনীপুর শহরের অলিগঞ্জের উপর দিয়ে বর্তমান কেশপুর যাবার সড়কপথে পাঁচখুরি থেকে কমলাপুর হয়ে বাগরোই ও কাপাসটিকরি যাবার যে ক্ষীণ সড়কপথটি আজও বিদ্যমান, মনে হয় এটাই সেই পুরাতন রাস্তার অবশেষ। অন্যদিকে, কাপাসটিকরি থেকে পুবে গোলগ্রাম হয়ে পাঁচবেড়ে পর্যন্ত এ রাস্তাটির পুরাতন চেহারা হদিশ করতে না পারলেও বর্তমানের খন্যাদিহি থেকে গোপাল-নগর পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তাটি যে সেই পুরাতন রাজপথটির এক কঙ্কাল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

২. মেদিনীপুর-কেশিয়াড়ী-রাজঘাট:

মেদিনীপুর থেকে আর একটি রাস্তা মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে যেটি খড়্গপুর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রসারিত হয়েছে। খড়্গপুর থানার অযোধ্যাগড় **(Adjudagur)** হয়ে সে রাস্তাটি দক্ষিণ-পুবে বলরামগড়ির **(Bularamgarry)** উপর দিয়ে নারায়ণগড় থানা এলাকায় শীটলি **(Sitillee)** থেকে মাকোণ্ডা **(Makondeah)** এসেছে। তারপর সেখান থেকে রাস্তাটি দু'ভাগ হয়ে মূল রাস্তাটি চলে গেছে একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিমে কেশিয়াড়ী **(Cossaree)** এবং অন্যটি দক্ষিণ-পুবে পূর্বোক্ত ১নং রাস্তায় নারায়ণগড় থানার বাখরাবাদে **(Buckerabad)** এসে মিশেছে। এখন খড়্গপুর থেকে কেশিয়াড়ী যাবার যে-রাস্তাটি আছে সেটির সঙ্গে এর মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে সাবেকের

এ রাস্তাটি তখন অযোধ্যাগড়, বলরামগড় (বর্তমানে বলরামপুর), শিটলি, মারকোণ্ডা প্রভৃতি গ্রামগুলির উপর দিয়ে প্রসারিত হওয়ায় সেগুলি একসময়ে বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। এসব গ্রামগুলি আজকের নতুন রাস্তার দূরে দূরে অবস্থিত হওয়ায় বর্তমানে লোকচক্ষুর আড়াল হয়ে গেলেও সেখানে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন পরিবারের নির্মিত ভগ্ন মন্দির-দেবালয় ও অট্টালিকাগুলি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ঐসব পুরাতন পথের সংযোগের দরুণ সেসব অঞ্চলের সমৃদ্ধির কথা।

কেশিয়াড়ীতে পূর্বে উল্লিখিত রাস্তাটি দু'ভাগ হয়ে একটি দক্ষিণে ও অন্যটি পশ্চিমে জাহানপুর চলে এসেছে। দক্ষিণের রাস্তাটি দলকা (Dalcah) থেকে বালিয়া (Balleah) হয়ে সুবর্ণরেখা পেরিয়ে রায়বানিয়া (Roybannea) হয়ে সুবর্ণরেখার পশ্চিমতীরে রাজঘাটে এসে জলেশ্বর-বালেশ্বর রাস্তায় সংযোগ হয়েছে।

৩. কেশিয়াড়ী-জাহানপুর :

পূর্বকথিত কেশিয়াড়ী থেকে পশ্চিমের রাস্তাটি চলে গেছে কেশিয়াড়ী থানার দীপা (Depah) হয়ে উত্তর-পশ্চিমে নবকিশোরপুর (Nubkiss rpour); তারপর ডুলং নদ পেরিয়ে কাটমাপুর (Cutmapour) হয়ে সুবর্ণরেখার পুব তীরবর্তী গোপীবল্লভপুর থানা এলাকার জাহানপুর (Janpour)। পরবর্তী সময়ে গোপীবল্লভপুরে থানা হওয়ায় এবং ঝাড়গ্রাম বা মেদিনীপুরের সঙ্গে নব-নির্মিত রাস্তার সংযোগ হওয়ায় জাহানপুরের গুরুত্ব কমে যায়। তবে চুয়াড় বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ শাসকরা জাহানপুরেই থানার কেন্দ্র করে, যার অধীনে থাকে বেলবেড়্যা, চিয়াড়া, বরাজিত, কিয়ারচাঁদ ও দিগপারুই প্রভৃতি গ্রাম। চুয়াড় বিদ্রোহ সম্পর্কে জে. সি. প্রাইসের লেখায় জাহানপুরের নাম বেশ কয়েকবার উল্লিখিত হতে দেখা যায়।

৪. জাহানপুর-মীরগোদা-কাঁথি-হিজলী :

জাহানপুর থেকে আর একটি রাস্তা দেখা যাচ্ছে দীপা হয়ে দক্ষিণ-পুবে দলকা (Dalcah) থেকে দাঁতনের (Dantoun) উপর দিয়ে দাঁতন থানারকড়িহা (Coureah), মোহনপুর থানার তড়ুয়া (Tenneah) এবং নাড়বন (Narbon) হয়ে মীরগোদায় (Meergooda) প্রসারিত। সেখান থেকে রাস্তাটি আবার পুবে বাঁক নিয়ে বারাঙ্গা (Bargong), দেপাল (Depall), বেলবনি (Balebunny)

গ্রামের উপর দিয়ে আধারবনি (Abudarbunny creek) নামের সামুদ্রিক খাঁড়ি পেরিয়ে Thonrunaul (সনাক্ত হয়নি) হয়ে কাঁথি (Cuntai) এবং পরে পুবে আদাবেড়্যা (Addaburya) হয়ে হিজলীতে (Injelle) শেষ হয়েছে। খেজুরী তখন বন্দর হিসেবে গড়ে ওঠেনি, তাই সেখানের সঙ্গে কোন রাস্তার সংযোগ দেখা যাচ্ছে না।

৫. মেদিনীপুর-নারায়ণগড়-মীরগোদা-কাঁথি :

মেদিনীপুর থেকে নারায়ণগড় পর্যন্ত রাস্তার উল্লেখ ১নং রাস্তার আলোচনায় দেওয়া হয়েছে। দেখা যাচ্ছে নারায়ণগড় থেকে কাঁথি যেতে হলে দুটো ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে যাওয়া যেত ; তার মধ্যে একটি হ'ল নারায়ণগড়-মীরগোদা হয়ে কাঁথি, এবং অন্যটি হ'ল নারায়ণগড়, সাবড়া ও সাউরি হয়ে বাসুদেবপুরের উপর দিয়ে কাঁথি। এর মধ্যে প্রথম রাস্তাটি প্রসারিত হয়েছে নারায়ণগড় থানার দক্ষিণে নরসিংবাড়ির (Nursingbarry) উপর দিয়ে কেলেঘাই (Cullyaghi) ও পরে তার শাখা নদ পেরিয়ে মাকড়্যা (Mackoorya) গ্রামের উপর দিয়ে দাঁতন থানা এলাকায় সাবড়া (Syburra) হয়ে নানজোড়া (Nanjoorah)। তারপর আরও দক্ষিণে মোরাদাবাদের (Moradabad) উপর দিয়ে এগরা থানা এলাকার আলংগিরি (যদিও মানচিত্রে বলা হয়েছে Lungrye) পেরিয়ে পাণ্ডুয়া (Pandooah) হয়ে মীরগোদা (Meergooda) এবং সেখান থেকে কাঁথি পর্যন্ত যাবার রাস্তাটি সম্পর্কে ইতিপূর্বেই ৪ নং রাস্তার বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য এ রাস্তাটি অবশ্য ইতিহাসের দিক থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ সড়কটি ধরেই নানজোড়ার প্রায় ৫ কি.মি. পশ্চিমে তুর্কার কাছে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বাদশার আমলে সংঘটিত হয়েছিল মোগল-পাঠান যুদ্ধ, যা ইতিহাসে তুকারোইয়ের যুদ্ধ নামে খ্যাত। পটাশপুর থেকে আর একটি পথ সাবড়া ও নানজোড়ার মাঝামাঝি দক্ষিণ-পশ্চিমে সাউরির (Source) উপর দিয়ে তুর্কা (১১নং পথের বর্ণনা দ্রষ্টব্য) হয়ে জলেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। স্যার যদুনাথ সরকার তাঁর 'মিলিটারী হিষ্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে 'আকবরনামা' অনুসরণে সে যুদ্ধের রণকৌশল ও জয়পরাজয় নিয়ে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে জানা যায়, এই তুর্কার বর্তমান নাম তুর্কাকসবা এবং এই গ্রামের কাছাকাছি ছিল সে লড়াইয়ের ময়দান, যেখানে মোগল সেনাপতি মুনিম খাঁ ও টোডরমলের সঙ্গে পাঠান নৃপতি দাউদের ঘোরতর যুদ্ধে

দাউদের পরাজয় ঘটেছিল এবং যুদ্ধশেষে বন্দী পাঠান সেনাদের শিরচ্ছেদ করে তাদের মুণ্ড দিয়ে আটটি স্তম্ভ বানানো হয়েছিল।

৬. নারায়ণগড়-সাউরি-কাঁথি :

নারায়ণগড় থেকে কাঁথি যাবার আর যে একটি পথ ছিল সেটি দাঁতন থানার সাবড়া থেকে পুবমুখী হয়ে সাউরির (Souree) উপর দিয়ে পটাশপুর থানার খড়ুই (Carrai) হয়ে দক্ষিণ-পুবে এগরা থানার খেজুরদা (Cojurdee) ও পরে বাসুদেবপুর (Bazdebpour) পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। এরপর বাসুদেবপুর থেকে একটি রাস্তা দক্ষিণ-পুবে রায়পুর (Roypour) হয়ে কাঁথি এবং এখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে আর একটি রাস্তা বিশ্বনাথপুর (Bisnatpour) এসে দুভাগ হয়ে একটি দক্ষিণ-পশ্চিমে দেপালে এবং অন্যটি দক্ষিণ-পুবে বেলবনিতে পৌঁছেছে, যার বর্ণনা ৪নং রাস্তায় উল্লিখিত হয়েছে।

৭. নারায়ণগড়-প্রতাপপুর :

নারায়ণগড় থেকে একটি রাস্তা দেখা যাচ্ছে উত্তর-পুবে নারায়ণগড় থানার ভদ্রকালী (Bidercally), খড়্গপুর থানার বংশীচক (Bansychuck) হয়ে পিংলা থানার সুতছড়ার (Sootcherra) কাছে ৮নং রাস্তায় (যা একদা নন্দকাপাসিয়ার বাঁধ নামে পরিচিত ছিল) সংযোগ হয়েছে এবং ডেবরা থানার কেদারে (Kedaar) চৌমাথা পেরিয়ে উত্তর-পুবে দোগাছা (Dogutchya) হয়ে দুটি স্থানে পরপর কাঁসাই পেরিয়ে পাঁশকুড়া থানার প্রতাপপুরে (Purtabpour) এসে মিলেছে। আর এখান থেকে উত্তরে ১নং রাজপথের পাঁচবেড়ে অথবা ৯নং রাস্তায় মেদিনীপুর বা তমলুক যাওয়া যেতে পারতো।

৮. কাপাসটিকরি-পটাশপুর-কাঁথি :

পূর্ববর্ণিত ১নং রাজপথটিতে যে কাপাসটিকরির উল্লেখ পেয়েছি, সেখান থেকে একটি পথ কাঁসাইয়ের মূল নদীটি পেরিয়ে দক্ষিণে ডেবরা থানার শ্যামপুর (Shampour) হয়ে ডেবরার প্রায় ৫ কিমি. পশ্চিম দিয়ে বনলাম গ্রামের (Banlcam নামের এ গ্রামটি সনাক্ত করা যায়নি) উপর দিয়ে এসেছে কেদার, যেখানে দেখা যায় সেটি দুটি রাস্তার সংযোগস্থল। এর মধ্যে দক্ষিণের রাস্তাটি দক্ষিণ-পশ্চিমে সামান্য বাঁক নিয়ে সুতছড়া হয়ে সোজা চলে এসেছে পটাশপুর (Pataspour)। তারপর রাস্তাটি সেখান থেকে দক্ষিণে পটাশপুর থানার খড়ুই (Carrai) হয়ে এগরা থানার খেজুরদা (Cojurdee) ও বাসুদেব-

পুরের উপর দিয়ে গেছে কাঁথি,- যে রাস্তার বর্ণনা ৬নং রাস্তায় দেওয়া হয়েছে। কাপ্রাসটিকরি থেকে পটাশপুর পর্যন্ত এই রাস্তাটি মনে হয় সেই বিখ্যাত নন্দ কাপ্রাসিয়ার বাঁধ, যা সেখান থেকে সাউঁরি হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল।

৯. তমলুক-প্রতাপপুর-ডেবরা-মেদিনীপুর :

তমলুক থেকে মেদিনীপুর যেতে হলে তখন দুটি পথ অবলম্বন করে যাওয়া যেতে পারতো। প্রথমতঃ তমলুক থেকে প্রায় ৫ কি.মি. উত্তরে আসতে হবে তমলুক থানার গঙ্গাখালি (Gongacally); তারপর সেখান থেকে সোজা পশ্চিমে টুল্যা (Toollah) হয়ে উত্তর-পশ্চিমে পাঁশকুড়া থানার প্রতাপপুর (Purtabpour)। এবার প্রতাপপুর থেকে একটি রাস্তা উত্তরে চরছকড়ি (Courchuckree—এই গ্রামটি সনাক্ত করতে পারিনি) হয়ে পাঁচবেড়েতে যোগ হয়েছে ১নং রাজপথে, যেখান দিয়ে পশ্চিমে মেদিনীপুরে আসা যেত। মেদিনীপুর যাওয়ার অন্য সড়কটি প্রসারিত ছিল প্রতাপপুর থেকে সোজা পশ্চিমে কাঁসাই পেরিয়ে পাঁশকুড়ো (Panchcoora) হয়ে ডেবরা (Debra) ও কুশিয়া (Coossea); তারপর কাঁসাই পেরিয়ে সামান্য উত্তর-পশ্চিমে পাথরা হয়ে মেদিনীপুর পর্যন্ত। পাঁশকুড়ো থেকে আর একটি রাস্তার যোগ দেখা যাচ্ছে ৮নং রাস্তায় বর্ণিত শ্যামপুরের সঙ্গে, যা উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত হয়েছে ডেবরা থানার মুড়াস্থি (Moonasttee) হয়ে। এছাড়া শ্যামপুর থেকে আর একটি রাস্তা দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিমে কাঁসাই পার হয়ে উলানগর (Olanagur) দিয়ে পাথরায় (Pattera) এসে যোগ হয়েছে।

১০. মেদিনীপুর-ট্যাংরাখালি ঘাট-গেঁওখালি :

মানচিত্রে এ রাস্তাটি দেখানো হয়েছে মেদিনীপুর থেকে পুবে পাথরা হয়ে কাঁসাই পেরিয়ে সোজা দক্ষিণ-পুবে কেদারের উপর দিয়ে সবঙ্গ থানার পুবপ্রান্তে অবস্থিত ডুবরাজপুর গ্রাম (Dooradgepour) থেকে পুবে ময়না থানার শ্যামপুর (Sampour) পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে এই দীর্ঘ পথটির মধ্যে কোন গ্রাম দেখানো হয়নি। পরে সেখান থেকে রাস্তাটি কেলেঘাই (Cullyaghi N.) পার হয়ে দক্ষিণ-পুবে নন্দীগ্রাম থানার ট্যাংরাখালি ঘাট পর্যন্ত গিয়ে আবার হলদী নদী পার হয়ে সোজা প্রায় পুবদিকে চলে এসেছে রঙ্গিবসান (ম্যাপে নামটি যদিও দেওয়া হয়েছে Nangabussan), অর্থাৎ যা মহিষাদল শহর

এলাকার অন্তর্ভূক্ত। এবার উত্তর-পুবে রাস্তাটি বাঁক নিয়ে চলে গেছে রূপনারায়ণ তীরবর্তী বর্তমান গেঁওখালি পর্যন্ত, যদিও সে স্থানটির নাম মানচিত্রে উল্লিখিত হয়নি। দেখা যাচ্ছে সবঙ্গ থানার প্রান্তবর্তী ডুবরাজপুর গ্রামটি এখন নিতান্ত অখ্যাত হলেও, বর্তমানে এখানে দু' একটি প্রাচীন পোড়ামাটির ফলকযুক্ত মন্দিরের অস্তিত্ব থাকায় অনুমান যে, একসময়ে সড়কপথের যোগাযোগের জন্য সেটি বেশ উন্নত গ্রাম হিসেবে পরিগণিত ছিল।

১১. তমলুক-পটাশপুর-জলেশ্বর :

তমলুক থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে এই রাস্তাটি নিকাসী (Necassee) হয়ে কাঁসাই পেরিয়ে এসেছে ময়নাগড় (Mynahgur) ; সেখান থেকে দক্ষিণে বিচালিঘাটকে (Bicollygaut) পুবে রেখে পূর্ববর্ণিত ১০নং রাস্তার ময়না থানার শ্যামপুর যোগ হয়েছে ; এবার সে রাস্তাটি শ্যামপুর অতিক্রম করে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখী হয়ে আকুন্তলা গ্রাম (Aukentalla, স্থানটি সনাক্ত করা যায়নি ; তবে ভগবানপুর থানার আমড়াতলা হ'তে পারে) পেরিয়ে ভগবানপুর থানার শিউলিপুর (Solleepour) ও পটাশপুর থানার অমর্ষি (Ammersee) হয়ে এসেছে পটাশপুর। এরপর পটাশপুরে পূর্বে উল্লিখিত ৮নং রাস্তাটি অতিক্রম করে দক্ষিণ-পশ্চিমে ৬নং রাস্তায় বর্ণিত সাউরির উপর দিয়ে ৫নং রাস্তা অতিক্রম করে তুর্কা (Turkeah) হয়ে ৪নং রাস্তায় বর্ণিত দাঁতন থানার কড়িহার (Coureah) উপর দিয়ে জলেশ্বর পর্যন্ত প্রসারিত বলে দেখানো হয়েছে।

১২. ডুবরাজপুর-শোলপুর-বাসুদেবপুর-কাঁথি :

ইতিপূর্বে বর্ণিত ১০নং রাস্তার বিবরণে যে রাস্তাটি মেদিনীপুর থেকে পাথরা, কেদার ও ডুবরাজপুর হয়ে শ্যামপুরের দিকে চলে গেছে সেই রাস্তায় ডুবরাজপুর থেকে দক্ষিণে একটি রাস্তা বের হয়ে ১১নং রাস্তায় বর্ণিত শিউলিপুর অতিক্রম করে ঝাড়া দক্ষিণে ভুঁঞামুঠা (Booamotah), ভগবানপুর থানার ডুবাই (Dubbi) গ্রাম পেরিয়ে রাণীগঞ্জে (Rannigange) এসে পুনরায় দক্ষিণ-পশ্চিমে বেঁকে পটাশপুর থানার মথুরা (Motooria) পৌঁছেছে। এবার রাস্তাটি দক্ষিণে প্রসারিত হয়ে পটাশপুর থানার ব্রজবল্লভপুর (Burzeebullabpour) ও পরে এগরা থানার চৌমুখ (Chambuk) ও পাহাড়পুরের (Paharpour, উপর দিয়ে ঐ থানার দাউদপুরে (Doudpour) মিলিত হয়ে দক্ষিণে ৮নং সড়কের সঙ্গে বাসুদেবপুর হয়ে কাঁথি পৌঁছেছে।

১৩ মেদিনীপুর-জাহানপুর-বলরামপুর :

মেদিনীপুর থেকে বীনপুর থানার বলরামপুর যাবার যে দুটি পথ ছিল, তারমধ্যে একটি গোপীবল্লভপুর থানার জাহানপুর হয়ে এবং অন্যটি কেশপুর থানার আনন্দপুর ও শালবনি হয়ে। প্রথম রাস্তাটি দেখা যাচ্ছে, মেদিনীপুর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে কাঁসাই নদী পেরিয়ে খড়্গপুর থানার বসন্তপুর (Bassen-pour) হয়ে ঝাড়গ্রাম থানার মদিপুর (Mohdypour) এবং চড়দার Char-dah) কাছে কেলেঘাই নালা (Cullyaghi N.) পার হয়ে ঐ থানার শ্যাম-নগর (Saumnagur) এসেছে। তারপর সেখান থেকে রাস্তাটি দক্ষিণ-পশ্চিমে গোপীবল্লভপুর থানার বাঁশদা (Bansah) গ্রামের উপর দিয়ে ঐ থানার চিয়াড়া (Chearah-স্থানটি সনাক্ত করা যায় নি) হয়ে গোপীবল্লভপুর থানার জাহানপুর (Janpour) এসে পৌঁছেছে। প্রকাশ থাকে যে, জাহানপুরের অপর পারে পশ্চিমে সুবর্ণরেখা তীরবর্তী বর্তমানের গোপীবল্লভপুর।

এবার জাহানপুর থেকে রাস্তাটি সোজা উত্তরমুখী হয়ে গোপীবল্লভপুর থানার তেঘরি (Tagree), ডুমুরনির (Domorny ; সনাক্ত করা যায়নি) উপর দিয়ে জামবনি Jambunny) ; তারপর জামবনি থানার আলমপুর (Allumpour), বীনপুর (Buapour), বেলারবনি (Bellarbunny) গ্রাম পেরিয়ে এসে পৌঁছেছে বীনপুর থানার বলরামপুর (Bulrampour)। বলরামপুর একসময়ে বেশ বর্ধিষ্ণু স্থান বলে খ্যাত ছিল। চুয়াড় বিদ্রোহের পটভূমিকায় এ স্থানটি সেসময় বেশ উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছিল।

১৪. মেদিনীপুর-আনন্দপুর-শালবনি-বলরামপুর :

মেদিনীপুর থেকে বলরামপুর যাবার আর যে পথটি ছিল সেটি মানচিত্রে দেখা যায়, উত্তর-পুবে শালবনি থানার কর্ণগড় (Currangur) ও কেশপুর থানার আনন্দপুরের (Ananpour) উপর দিয়ে উত্তর-পশ্চিমে কেশপুর থানার কোন্টাই (Cotty), শালবনি (Salbunny) হয়ে শালবনি থানার জাতড়া (Jattrah) পর্যন্ত বিস্তৃত। এবার জাতড়া থেকে একটি রাস্তা সোজা উত্তরে চলে গেছে গড়বেতা থানার নয়াবসান (Niabussan ; বর্তমান নাম নয়াবসত) হয়ে কৃষ্ণনগর (Kistnagur, দ্রঃ ১৭নং রাস্তা) এবং এখান থেকে অন্য আর একটি রাস্তা পশ্চিমাভিমুখী হয়ে এসেছে গড়বেতা থানার রায়গড় (Roygur, তারপর সেখান থেকে আবার উত্তর-পশ্চিমে গড়বেতা থানার

কড়াশাই (Corserra) হয়ে সোজা পশ্চিমে কাদাশোল (Cudashore), বীনপুর থানার রামগড় (Ramgur) হয়ে বলরামপুর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে সে সময় বীনপুর থানার এই বলরামপুরের উপর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে বেশ কয়েকটি রাস্তা অতিক্রম করেছে।

১৫. মেদিনীপুর-পাত্রপুর-বলরামপুর ঃ

মেদিনীপুর থেকে বলরামপুর যাবার দুটি ভিন্ন ভিন্ন রাস্তার বর্ণনা ১৩ ও ১৪নং পথের আলোচনায় ব্যক্ত হয়েছে। এছাড়া বলরামপুর যাবার আর যে রাস্তাটি ছিল তা পাত্রপুর (Pertapour, স্থানটি সনাক্ত করা যায় নি) অথবা জামবনি থানার সরাকাটা (Soolaccota) হয়ে বীনপুরের উপর দিয়ে বলরামপুর। পাত্রপুর যাবার রাস্তাটি মানচিত্রে দেখানো হয়েছে মেদিনীপুর থেকে উত্তর-পশ্চিমে জামনা (Jamnah), পাটচাপুড়ার (Patchpurra) ও চিনসুরিয়ার (Chinsurear-পূর্বোক্ত তিনটি স্থানই সনাক্ত করা যায়নি) উপর দিয়ে শালবনি থানার সাতপাটি (Sidepathy) ও মইলদা (Mouldah) হয়ে পশ্চিমে পাত্রপুর। তারপর সেখান থেকে উত্তরে বীনপুর থানার ডাইনটিকরি (Dintichicky), সিজুয়া (Sejuar) হয়ে কাঁসাই পেরিয়ে বলরামপুর। বর্তমানে ডাইনটিকরি দুর্গম স্থান হলেও, এক সময়ে যোগাযোগ-হেতু স্থানটি যে বেশ বর্ধিষ্ণু ছিল, তার প্রমাণ হল এখানে প্রতিষ্ঠিত একটি পাথরের পীঢ়া-দেউল। অতীতে আরও কয়েকটি মন্দির ছিল বলে শোনা গেছে, কিন্তু তা সবই বর্তমানে কাঁসাই গর্ভে বিলীন।

পাত্রপুর থেকে বলরামপুর যাবার অন্য আর একটি পথ সোজা দক্ষিণ-পশ্চিমে চলে এসেছে কাঁসাই পেরিয়ে জামবনি থানার সরাকাটা; তারপর সেখান থেকে সোজা উত্তরে ১৩নং রাস্তায় বীনপুর হয়ে বলরামপুর।

১৬. বলরামপুর-ঝাড়গ্রাম ঃ

বলরামপুর থেকে ঝাড়গ্রাম যাবার যে রাস্তাটি দেখা যাচ্ছে, তা বলরামপুর হয়ে ১৫নং রাস্তা মোতাবেক পাত্রপুর থেকে দক্ষিণে পলাশীর (Palassy) পর, কাঁসাই পেরিয়ে বীনপুর থানার বৈতা (Boitaw) হয়ে ঝাড়গ্রাম (Jargong) এবং সেখান থেকে উত্তর-পূবে আর একটি রাস্তা বাঁধগোড়া (Bongonra) হয়ে কাঁসাই পেরিয়ে মেদিনীপুর থানার ধেড়ুয়া (Dunwah); তারপর সেখান থেকে দক্ষিণ-পূবে ডারমা (Dermah; সনাক্ত করা যায়নি)

হয়ে দক্ষিণে মেদিনীপুর থানার মনিদহ (Maundar) হয়ে কাঁসাই পেরিয়ে ১৩নং রাস্তায় ঝাড়গ্রাম থানার মদিপুরে যোগ হয়েছে।

১৭. বিষ্ণুপুর-কৃষ্ণনগর-বেতা-রাজবলহাট :

হাওড়ার শালকিয়া থেকে স্থরু হয়ে সোজা পশ্চিমে হুগলী জেলার রাজবল-হাট ও দেওয়ানগঞ্জের উপর দিয়ে পুব-পশ্চিমে বিস্তৃত যে পথটি মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে, সেটি পশ্চিমে মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা থানার মাধবপুর (Maddapour), রামজীবনপুর (Ramjavenpour) ও লাহিরগঞ্জ (Larigunge) হয়ে শিলাই নদী পেরিয়ে মঙ্গলাপোতার (Mongulputta) উপর দিয়ে বেতায় (Betah) পৌঁছেছে। দু'শো বছর আগে আজকের গড়বেতা যে বেতা নামে পরিচিত ছিল তা জানা যায়। বেতা থেকে কামারবেড়িয়ার (Comarberya) উপর দিয়ে কৃষ্ণনগর (Kistnagur) হয়ে রাস্তাটি উত্তর মুখে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে পৌঁচেছে।

১৮. মেদিনীপুর-ক্ষীরপাই-মাধবপুর :

এ রাস্তাটি আসলে প্রাচীন পথ এবং একদা এটিই ছিল বাদশাহী সড়ক নামে বিখ্যাত, যা বর্ধমান থেকে মেদিনীপুর জেলার উপর দিয়ে ওড়িশা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ রাস্তার দক্ষিণ অংশটির বিবরণ ইতিপূর্বেই ১নং রাস্তা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তী আলোচ্য উত্তরের অংশটি মানচিত্রে যা দেখা যাচ্ছে, তা বর্তমানে কেশপুর থেকে তলকুঁয়াই যাবার পথ। মেদিনীপুর থেকে এ পথটি উত্তর-পুবে অলিগঞ্জ হয়ে মেদিনীপুর থানার বনপুরা ও কেশপুর থানার আওরঙ্গাবাদের মধ্যবর্তী ত্রিমোহানী নালা (Thrmonee N.) নামে এক নদী (বর্তমানে যা পারাং নদী নামে খ্যাত) পার হয়ে ঈশ্বরপুরের (Issarapour) উপর দিয়ে কুবাই (Cooby) নদী পেরিয়ে নেড়াদেউল (Naradoinl) হয়ে পিঙলাস (Pinglas) পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সে পুরাতন পথটি আজও রয়েছে। পিঙলাস থেকে রাস্তাটি দু'ভাগ হয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে সোজা চন্দ্রকোণা অভিমুখে এবং অন্যটি উত্তর-পুবে ক্ষীরপাই অভিমুখে। এই রাস্তায় পিঙলাস থেকে সামান্য এগিয়ে গেলেই একটি নদী পার হতে হয়। রেনেলের মানচিত্রে যদিও এ নদীর কোন নাম উল্লিখিত হয়নি, তাহলেও এটি যে বর্তমানের যোনাই নদ তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। এই সোনাইয়ের উপর একটি প্রাচীন সেতুর উল্লেখ করে তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একসময়ে 'মেদিনীপুরের

ইতিহাস' গ্রন্থ প্রণেতা যোগেশচন্দ্র বসু লিখেছিলেন যে "দনাই নদীর উপরে বর্ধমান রাস্তায় 'পিঙ্‌লাসের সাঁকো' নামে একটি প্রস্তর নির্মিত পুরাতন পোল ছিল। এই পিঙ্‌লাসের সাঁকো পূর্বে 'কাতলা ফেলার' জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও ঐ স্থান সম্পূর্ণ নিরাপদ হয় নাই।" চন্দ্রকোণা থানার পিঙ্‌লাস থেকে আরও উত্তর-পুবে আলোচ্য এ রাস্তাটি দেখা যাচ্ছে ঝাঁকরা (Jacrah) অতিক্রম করে পুনরায় শিলাই নদী পেরিয়ে প্রায় তিন কিমি. পুবে ক্ষীরপাইকে (Keerpoy) ডাইনে রেখে ১৭নং রাস্তায় মাধবপুরে (Maddapour) এসে মিলিত হয়েছে। বর্ণিত ঝাঁকরা গ্রামটিও বেশ প্রাচীন; 'চৈতন্যচরিতামৃতে'ও এ গ্রামটির উল্লেখ আছে (ঝাঁকরার পুরাকীর্তি সম্পর্কে 'পশ্চিমবঙ্গের পুরাসম্পদ : উত্তর মেদিনীপুর গ্রন্থ' দ্রষ্টব্য)। সরজমিন অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন সে বাদশাহী সড়কটি মেদিনীপুর থেকে ঝাঁকরা অবধি মোটামুটি ঠিকই আছে, কিন্তু এরপর বর্তমান গোয়ালসিনি পর্যন্ত পুরাতন সে সড়কটির বহুস্থানে কোন চিহ্ন নেই এবং বেশ পরিবর্তনও হয়েছে।

১৯. মেদিনীপুর-চন্দ্রকোণা-বিষ্ণুপুর :

মেদিনীপুর থেকে বিষ্ণুপুর যাবার বর্তমান যে সড়কপথটি আমরা দেখি, দু'শো বছর আগে কিন্তু এ রাস্তাটির অস্তিত্ব ছিল না। তখন মেদিনীপুর থেকে বিষ্ণুপুর যাওয়ার যেসব রাস্তা ছিল তার মধ্যে একটি হল ১৮নং রাস্তায় বর্ণিত মেদিনীপুর থেকে পিঙ্‌লাস হয়ে উত্তরে চন্দ্রকোণা (Chandercoona) অতিক্রম করে তারও উত্তরে ছত্রগঞ্জ (Chuttergunge) পৌঁছুতে হত। এরপর বেশ কিছুদূর গিয়ে শিলাই পেরিয়ে ১৭নং রাস্তায় লাহিরগঞ্জ (Larigunge) হয়ে উত্তরে হুগলী জেলার বদনগঞ্জ এবং পরে বাঁকুড়া জেলায় বৈতল হয়ে উত্তর-পশ্চিমে প্রসারিত রাস্তা ধরেই বিষ্ণুপুর যাওয়া যেত।

২০. মেদিনীপুর-রসকুণ্ড-বিষ্ণুপুর :

বিষ্ণুপুর যাবার অন্য এ রাস্তাটি পূর্বোক্ত ১৪নং রাস্তায় উল্লিখিত আনন্দপুর হয়ে উত্তর-পুবে কুবাই পেরিয়ে শীর্ষা পর্যন্ত প্রসারিত; তারপর সেখান থেকে রাস্তাটি উত্তরপশ্চিমে কেশপুর থানার আমনপুরে (Aminpour) এসে দু'ভাগ হয়ে একটি পশ্চিমে চলে গেছে নয়াবসান ও কৃষ্ণনগর হয়ে বিষ্ণুপুর এবং অন্যটি শীর্ষা থেকে উত্তর-পশ্চিমে চলে এসেছে রসকুণ্ড (Ruscoond); এখান থেকে আবার বিষ্ণুপুর যাবার যে দুটি পথ দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে সোজা পথটি হল,

উত্তর-পশ্চিমে মঙ্গলাপোতার উপর দিয়ে ফুলবেড়িয়া (Foolbareah) ও পরে বগড়িদিহি (Buccardee) হয়ে উত্তরে বিষ্ণুপুর এবং অন্য ঘুর পথটি হল, রসকুণ্ড থেকে বেতা হয়ে ১৭নং রাস্তা ধরে কৃষ্ণনগরের উপর দিয়ে বিষ্ণুপুর।

২১ গোলগ্রাম-ঘাটাল-ক্ষীরপাই :

১নং সড়কে উল্লিখিত গোলগ্রাম থেকে এ রাস্তাটি সুরু হয়ে উত্তর-পুবে প্রসারিত হয়েছে ডেবরা থানার কুল্যা (Calliah), জগন্নাথবাটী (Jaganabatta) হয়ে কাঁসাই পেরিয়ে সোজা দাসপুর থানার বাসুদেবপুর; সেখান থেকে উত্তরমুখী হয়ে কোটালপুর (Catalpur) গ্রামকে ডাইনে রেখে শিলাই পেরিয়ে সোজা এসেছে ঘাটাল (Gottaul)। ঘাটালে এসে তিনদিকে তিনটি রাস্তা চলে গেছে। সোজা উত্তরের রাস্তাটি হল ঘোষপুর হয়ে দেওয়ানগঞ্জ থেকে আরামবাগের কাছাকাছি ১৮নং সড়কে বর্ণিত বাদশাহী সড়কে যোগ হয়েছে। এ রাস্তাটির অবশেষ এখনও অবশ্য দেখা যায়। শুধু তাই নয়, একসময় পাঠান সর্দার দায়ুদ খাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে এই রাস্তা ধরেই মোগল সেনানী ৮নং রাস্তা বরাবর 'তুকারোই' এসে পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, যার বিবরণ ৫নং রাস্তার আলোচনায় দেওয়া হয়েছে। ঘাটাল থেকে প্রসারিত পুবমুখী রাস্তাটি শিলাই পার হয়ে রাজগড় (Rajgur; সম্ভবতঃ দাসপুর থানার জোতকানুরামগড়) এসে রূপনারায়ণ পার হয়ে হুগলী জেলার উপর দিয়ে সোজা দক্ষিণ-পুবে হাওড়া জেলার আমতা চলে গেছে। ঘাটালে প্রধান সড়কটি উত্তর-পশ্চিমে বরদা (Bardah), রাধানগর (Radanagur) ও ক্ষীরপাই হয়ে ১৮নং রাস্তায় যোগ হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী

ও'ম্যালী, এল. এস. এস.—বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, মিড্‌নাপোর, ১৯১১

গিরি, সতীশ—তারকেশ্বর শিবতত্ত্ব, ১৯২১

ঘটক, অধরচন্দ্র—নন্দীগ্রাম ইতিবৃত্ত, ১৯৬৪,

ঘটক, শম্ভুনাথ—'গড়বেতার তাম্রযুগের নিদর্শন' (প্রবন্ধ), স্বাধীনবার্তা, ১৭.৩.৭৭.

ঘোষ, বিনয়—পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ১৯৫৭

—সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১৮৪০-১৯০৫), ১৯৬৬

ঘোষ, ভাস্কর অ্যাণ্ড বসু, সনৎ (সম্পাদিত)—ওয়েষ্টবেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট রেকর্ডস্—হিজলী সল্ট ডিভিসন, ১৯৭১

ঘোষ, যামিনীমোহন—মগ রেডার্স ইন বেঙ্গল, ১৯৬০

চক্রবর্তী, ব্যোমকেশ—'বাংলার কীর্তন সংস্কৃতির আলোকে দাসপুরের একটি আঞ্চলিক সমীক্ষা' (প্রবন্ধ), বাসুদেবপুর বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ পত্রিকা, ১৯৭৬

চন্দ্র, ব্রজনাথ—শোলাঙ্কি বা শুক্লিজাতির আদি বৃত্তান্ত, ১৩১৪

চৌধুরী, সোমেশ্বর প্রসাদ—নীলকর বিদ্রোহ, ১৯৭২

চ্যাটার্জি, বেণীমাধব—এ শর্ট স্কেচ অভ্‌ মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুর অ্যাণ্ড হিজ্‌ ফ্যামিলি, ১৯২৯

দত্ত, অক্ষয়কুমার—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১ম ও ২য়), ১৩৭৬

দাশগুপ্ত, পরেশচন্দ্র—'প্রত্নতত্ত্বের আলোকে তাম্রলিপ্ত' (প্রবন্ধ), নিখিলভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন স্মরণিকা, ১৯৭৪

দাস, দীপকরঞ্জন—'বালিহাটির জৈন মন্দির' (প্রবন্ধ), 'কৌশিকী', ১০ সংখ্যা, ১৯৭৬

দে, সুধীন—'লালজলের প্রত্ন নিদর্শন' (প্রবন্ধ), অন্বেষা, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৮৩

পণ্ডিতশর্মা, রাধানাথ—কেশিয়াড়ি, ১৩২৩

পাল, ত্রৈলক্যনাথ—মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১৮৯৬

ফিসার, এবারহার্ড অ্যাণ্ড শা, হাকু—রুরাল ক্রাফটসম্যান অ্যাণ্ড দেয়ার ওয়ার্ক, ১৯৭০

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার—ছড়ায় স্থান বিবরণ, ১৯৮৬

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত)—সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১৩৪৪

বসু, অযোধ্যানাথ—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিতীর্থ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী, ১৩৬৬

বসু, ত্রিপুরা—বিস্মৃত কবি ও কাব্য, ১৯৮৭

বসু, যোগেশচন্দ্র—মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১৯৩৬

বেইলী, এইচ. ভি.—মেমর্যাণ্ডা অভ্‌ মিড্‌নাপোর, ১৯০২

ব্যানার্জি, জিতেন্দ্রনাথ—ডেভল্যাপমেন্ট অভ্‌ হিন্দু আইকোনোগ্রাফি, ১৯৫৬

ভট্টশালী, নলিনীকান্ত—আইকোনোগ্রাফি অভ্ বুদ্ধিষ্ট অ্যাণ্ড ব্রামনিক্যাল স্কাল্পচার ইন্ ঢাকা মিউজিয়ম, ১৯২৯

ভৌমিক, প্রবোধকুমার—মেদিনীপুর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, ১৯৮৪

মিত্র, অশোক (সম্পাদিত)—অ্যান অ্যাকাউণ্ট অভ্ ল্যাণ্ড ম্যানেজমেণ্ট ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল (১৮৭০-১৯৫০), ১৯৫৩

মুখোপাধ্যায়, তারাশিস—তমলুকের বিরিঞ্চিনারায়ণ, পরিবর্তন, ১৬, ৪, ৭৯

মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার—বাঙ্গালীর রাগ সংগীত চর্চা, ১৯৭৬

মুখোপাধ্যায়, প্রভাত—হিষ্ট্রি অভ্ দি জগন্নাথ টেম্পল ইন দি নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি, ১৯৭৭

মুখোপাধ্যায়, সরোজ—ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ও আমরা, ১৯৮১

রসুল, আবদুল্লাহ্—কৃষকসভার ইতিহাস, ১৯৬৯

রায়, নীহাররঞ্জন—বাঙ্গালীর ইতিহাস, ১৩৫৯

রায়, যোগেশচন্দ্র—'মেদিনীপুরের ইতিহাস' (প্রবন্ধ), প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬

রায়, রাসবিহারী ও বসু সত্যেন্দ্রনাথ—রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার শতবার্ষিক জয়ন্তী, ১৯৫২

সরকার, যদুনাথ—মিলিটারী হিষ্ট্রি অভ্ ইণ্ডিয়া, ১৯৭০

সাঁতরা, তারাপদ—পশ্চিমবঙ্গের পুরাসম্পদ : উত্তর মেদিনীপুর, ১৯৮৭

—পুরাকীর্তি সমীক্ষা : মেদিনীপুর, ১৯৮৭

—'ন্যাশানাল গভর্মেণ্টস্ ইন দি সাব-ডিভিশন অভ্ কণ্টাই অ্যাণ্ড তমলুক, দি ফোক্যাল পয়েণ্টস্ অভ্ দি ফাইন্যাল ফ্রেজ অভ্ দি ন্যাশানাল ম্যুভমেণ্ট ইন দি মিডনাপোর ডিষ্ট্রিক্ট' (প্রবন্ধ), 'দি কোয়াটারলি রিভিউ অভ্ হিস্টরিক্যাল স্টাডিজ', অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৮৪

—'আর্কিটেক্ট অ্যাণ্ড বিল্ডার্স' (প্রবন্ধ), 'ব্রিক টেম্পলস্ অভ্ বেঙ্গল : ফ্রম দি আর্কাইভস্ অভ্ ডেভিড্ ম্যাককাচ্চন', ১৯৮৩

—'পঙ্খের অলংকরণ' (প্রবন্ধ), 'পট' ৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৫

সান্যাল, হিতেশরঞ্জন—'দক্ষিণপশ্চিম বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন' (প্রবন্ধ) চতুরঙ্গ, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৮৪

সামন্ত, বিশ্বনাথ—লালজলের প্রত্নসম্পদ (প্রবন্ধ), কৌশিকী, শারদীয়, ১৩৯১

সিংহ, রাধারমণ—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অমিয় কাহিনী, ১৩৯২

হরিমোহন—চেরো : অ্যা স্টাডি ইন্ এ্যাকাল্চারেশন, ১৯৭৩

অনুক্রমণিকা

আলোকচিত্র

[পরবর্তী আলোকচিত্রগুলি শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (৮নং), পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের শ্রীরণজিৎকুমার সেন (১৪ নং), ওড়িশা স্টেট মিউজিয়াম, ভুবনেশ্বর (১৫নং) এবং অবশিষ্ট ১২টি লেখক কর্তৃক গৃহীত এবং সেগুলির সর্বস্বত্ব যথাক্রমে তাঁদের দ্বারা সংরক্ষিত।]

১. রেবন্ত মূর্তি ঃ কাঁকড়াজিৎ (পৃ: ১৭৬-১৭৭)

২. পারুলিয়া গ্রামের ঝর্ণাধারা (পৃ: ২৪-২৮)।

৩. প্রস্রবণ-কুণ্ডের উপর পাথরের স্থাপত্য ঃ কেদার (পৃ: ৩০-৩১)।

৪. নাগা সন্ন্যাসীদের প্রতিষ্ঠিত মন্দির ঃ চন্দ্রকোণা (পৃ: ১৪৪)

৫. গগনেশ্বর গ্রামের প্রস্তর স্থাপত্য (পৃ: ১৫১-১৫৮)।

৬. আগুনখাগীর মাড়ো ঃ হরিনারায়ণপুর (পৃ: ১০৪)।

৭. প্রাচীন সেতু ঃ পোস্তাপোল (পৃ: ৫৯-৬২)।

৮. 'বিরিঞ্চি'-র প্রতীক ঃ বাড়উত্তবাহিংলী (পৃ: ১৩৭)।

৯. ঝুড়ি ও টুলী সহ খড়িয়াল শিল্পী (পৃ: ১৩৪-১৩৬)

১০. বাড়ুয়া গ্রামের স্মারকস্তম্ভ (পৃ: ৮২-৮৫)।

১১. কিয়ারচাঁদের নিবেদন মন্দির (পৃ: ৮৫-৮৭)

১২. রেবন্ত মূর্তি ঃ দোলগ্রাম (পৃ: ১৭৭)।   ১৩. সূর্য বিগ্রহ ঃ রানীপুর (পৃ: ১৭৫)।

১৪. তামার কুঠার ঃ আগুইবনি (পৃ: ১০)।

১৫. জগন্নাথ রাস্তার উৎসর্গলিপি (পৃ: ৪২-৪৩)।